ভ্রমণগদ্য

ভ্রমণসাহিত্যের কাগজ

বর্ষ ৮ । সংখ্যা ১৮ । ফেব্রুয়ারি ২০২৫

অমর একুশে বইমেলা সংখ্যা ২০২৫

ভ্রমণগদ্য

ভ্রমণসাহিত্যের কাগজ

বর্ষ ৮ সংখ্যা ১৮ • ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সম্পাদক

মাহমুদ হাফিজ

ভ্রমণগদ্য

ভ্রমণসাহিত্যের কাগজ

বর্ষ ৮ সংখ্যা ১৮ • ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সম্পাদক
মাহমুদ হাফিজ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
জুলেখা ফেরদৌসী

প্রচ্ছদ
আল নোমান

কর্মাধ্যক্ষ
হোসেন সোহরাব

অক্ষর বিন্যাস
আশিক হোসেন

মুদ্রণ
খাজা এন্টারপ্রাইজ
২২১/এ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য
৩০০ টাকা

যোগাযোগ
প্রযত্নে- লিটল ম্যাগাজিন প্রাঙ্গণ
৭৯ আজিজ মার্কেট (দোতলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

Bhromongoddya
A Travelogue Magazine
Year 8 Issue18 || February 2025
Editor|| **Mahmud Hafiz**
Managing Editor|| **Zulekha Ferdousi**
Cover || **Al Noman**
Illustration || **Ashik Hossain**
Manager|| **Hossain Sohrab**

Printing: **Khaza Enterprize**
221/A Fakirapool, Dhaka-1000
Price: **BDT 300 IR 200 USD 10**

Contact
C/O: Little Magazine Prangyan, 79 Aziz Market (1st Floor) Shahbag, Dhaka-1000
Email: bhromongoddya@gmail.com
FB: Facebook.com/bhromongoddya

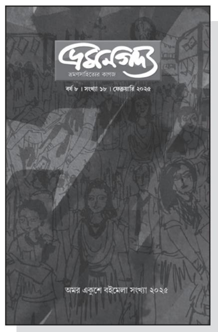

সূচিপত্র

ইফতেখারুল ইসলাম	৭	বহু যুগের ওপার হতে অস্ট্রেলিয়া
কামরুল হাসান	১৮	এডিনবরার দিনরাত্রি
ক্ষমা মাহমুদ	৩৪	নিবো পর্বতের চূড়ায়
গোলাম শফিক	৪৮	কাশ্মীর ॥ অবিস্মৃত পরিভ্রমণ
জালাল আহমেদ	৭১	সাজেক ॥ শুধু ভ্রমণ নয়
ডি.এম. ফিরোজ শাহ্	৮১	দ্বীপ কুতুবদিয়া
নাহিদা চৌধুরী	৯১	মিজোরাম ॥ সাত সহোদরার রাজ্য
ফকির আকতারুল আলম	১০২	মক্কা মদিনার পথে
ফরিদুর রহমান	১১৩	ঈদের দিনে দ্বীপের দেশে
বিশ্বজিত বড়ুয়া	১২৫	নিপ্পন ॥ মামার দেশে যাই
মঈনুস সুলতান	১৫৭	নেচার ওয়াক, শাইনিং সামবিম ও ধর্মযাত্রা
মাসরুর-উর-রহমান আবীর	১৭৭	চীনের নিষিদ্ধ নগরী
সেলিম সোলায়মান	১৮৫	বাল্টিক প্রিন্সেসে টাইটানিক যাত্রা
সোহেল আমিন বাবু	১৯২	দিঘাপতিয়ার রাজকুমারী ইন্দুপ্রভা
হাসিবুর রহমান সৌরভ	১৯৮	আগরতলা-কলকাতা ॥ একযাত্রায় দুই শহর

মাহমুদ হাবিব
সম্পাদক,
ভ্রমণগদ্য
Email : bhramangadya@gmail.com

আপনার পত্রিকা আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনার উত্তরোত্তর সংখ্যা অপূর্ব। আমি কি কি সংখ্যা আপনার আছে জানতে ইচ্ছুক। পারলে আমার পছন্দের গুলো সংগ্রহ করতে চাই। আমার মোবাইল নং ০১৭১৮ ......। অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত
আফসার আলী
৮৪ পশ্চিম বারান্দী রোড,
(কদমতলা মোড়)
যশোর।

১

উজবেকিস্তান সংখ্যা প্রকাশের পর 'ভ্রমণগদ্য' পরিবারের কাছে একটি পত্র এলো। হাতে লেখা। প্রযুক্তিযুগে হাতে লেখা চিঠি কল্পনাতীত! পত্রপ্রেরক আফসার আলী যশোরের পশ্চিম বারান্দী থেকে লিখেছেন *'আপনার পত্রিকার আমার খুব ভাল লেগেছে। অন্য কি কি সংখ্যা আপনার আছে জানতে ইচ্ছুক। পারলে আমার পছন্দের গুলো সংগ্রহ করতে চাই। আমার মোবাইল নম্বর.....। অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'*

পরে ভ্রমণগদ্য'র সঙ্গে জনাব আফসার আলী'র দূরালাপনী যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রথম আলাপে জানা গেল- তাঁর বয়স ৯৭ বছর। তিনি নিতান্ত একজন পাঠক। ইতিহাস, মানবসভ্যতা, ভ্রমণ ও দর্শন পাঠে তাঁর আগ্রহ। আলাপের সূত্রে খনন হলো, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ষাটের দশকের গোড়ায় উচ্চ ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। পেশাগতজীবনে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। বরেণ্য বর্ষীয়ান জনাব আফসার আলী'র পূর্ণ পরিচয় অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে আলাপচারিতার মাধ্যমে ক্রমশ বেরিয়ে এলো। জানা গেল-তিনি যশোর এমএম কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, 'ভ্রমণগদ্য' এর শুভানুধ্যায়ীদের কারও সরাসরি শিক্ষক, কারও আত্মীয়। এমনকি ভ্রমণগদ্য সম্পাদকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয় শিক্ষকেরও শিক্ষক। দূরালাপনীর আলাপের সময় ধর্ম, সভ্যতা, ইতিহাস, ভ্রমণ বিষয়ে বরেণ্যের অগাধ জ্ঞান ও পান্ডিত্যের আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে। বয়সের ভারে তাঁর চোখের আলো অনেকটা ছেড়ে গেছে তাঁকে, কিন্তু তিনি জ্ঞানের আলোর পিছু ছাড়েননি! আমরা তাঁর নিবেদিত পাঠ আগ্রহের প্রতি গভীর সম্মান জানাই।

২

'ভ্রমণগদ্য' সম্পাদকের সোস্যাল মিডিয়া প্রোফাইলের ইনবক্সে একদিন একটা ছবি এলো। বইয়ের তাকে সজ্জিত 'ভ্রমণগদ্য'র সবগুলো সংখ্যার ছবি। বার্তা প্রেরক লিখেছেন, কাগজটির সব সংখ্যার একাধিক কপি তাঁর সংরক্ষণে আছে। ছবি প্রেরকের নাম সৈয়দ জাফর।

৩

'ভ্রমণগদ্য'র সোস্যাল মিডিয়া গ্রুপের ইনবক্সে এক সরকারি কর্মকর্তার কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত বার্তা এলো- ১২তম'র পরের সংখ্যাগুলো প্রয়োজন, আগের সংখ্যাগুলো সংগৃহীত। তার মানে কাগজের সব কয়টি সংখ্যা সংগ্রহে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ স্পষ্ট!

৪

'ভ্রমণগদ্য' কাগজে যেসব লেখা প্রকাশিত হয়, মাঝে মাঝে এর চেয়ে বেশি লেখা হাতে আসে। 'ভ্রমণগদ্য'র প্রত্যাশিত জনরা'য় সঙ্গতি সম্পন্ন না হওয়ায় কোন কোন লেখা প্রকাশ করা যায় না। কোন কোন লিখিয়ে সৃজনশীলতার চেয়ে উইকির চর্বিত ইতিহাসকে লেখায় তুলে দেন। যাহোক, এসব লেখার আগমনে নতুন লিখিয়েদের আন্তরিক আগ্রহটি বেশ আঁচ করা যায়।

ঘটনাপুঞ্জ থেকে বাছাই করা উপর্যুক্ত তিনটি ঘটনা সন্নিবেশিত হলো- যা আমাদের জন্য 'ছোটি ছোটি খুশিয়া'। এসব আনন্দ ভ্রমণ লেখাকে পূর্ণ সাহিত্যিক মর্যাদা এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের আড্ডা-আলাপ-ভ্রমণআন্দোলন জারি রাখতে উস্কে দেয়। এই ইতিবাচক উস্কানি ভালো কিছু'র প্রণোদনা বটে!

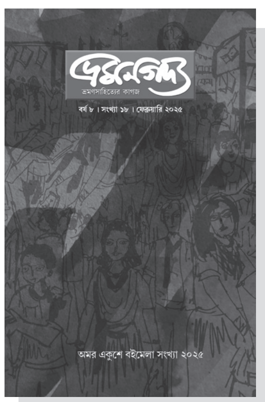

লেখা পাঠানোর নিয়ম

অভিজ্ঞতাময় ভ্রমণগদ্য পাঠানো সবার জন্য উন্মুক্ত

প্রথিতযশা ভ্রমণলেখকের পাশাপাশি নবীন ভ্রামণিক ও ভ্রমণলেখকদের লেখা সাদরে গৃহীত হয়

ইউনিকোড সমর্থিত ফন্টে ই-মেইলে সংযুক্ত করে লেখা পাঠাতে হয়

লেখার সঙ্গে ছবিতে ক্যাপশন সেভ করে ছবি পাঠাতে হবে

যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা দিতে হবে যাতে লেখককে
সৌজন্য সংখ্যা পাঠানো যায়

ব্যক্তিগত যোগাযোগ অপ্রয়োজনীয়

প্রয়োজনে ভ্রমণগদ্যের পক্ষ থেকেই যোগাযোগ করা হয়

যোগাযোগ

E mail: bhromongoddya@gmail.com
https://www.facebook.com/Bhromongoddya

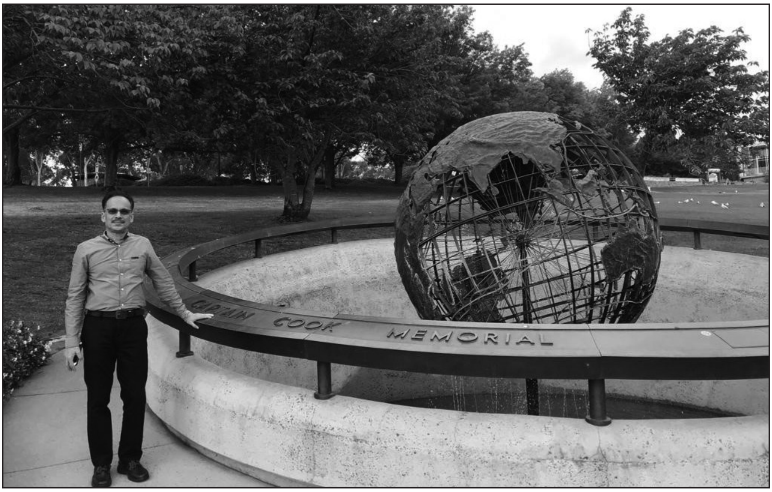

বহু যুগের ওপার হতে অস্ট্রেলিয়া

ইফতেখারুল ইসলাম

এক

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় আমাকে আব্বা একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু ফিল্ম কেনা ও ছবি প্রিন্ট করার খরচ বিবেচনা করে প্রথম জীবনে বেড়াতে যাওয়ার সময় অনেকবারই আমি সেই ক্যামেরা সঙ্গে নিইনি। বেশিরভাগ ভ্রমণের স্মৃতি আর ছবি জমা রেখেছি মনের ভেতরে।

ছাত্রজীবনে দেশের ভেতরে নানা জায়গাতে বেড়ানো হয়েছে। প্রথম বিদেশ ভ্রমণও ছাত্রজীবনেই। আমার ভাই ডক্টর রিজওয়ানুল ইসলাম ব্যাংককে আইএলও অফিসে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর ভাই-ভাবির আমন্ত্রণে আমি সেখানে যাই। তাঁরা আমাকে টিকিট পাঠালেন। সেটাকে বলে পিটিএ-- প্রিপেইড টিকিট এডভাইস। বিমান অফিসে গিয়ে টিকিট নিয়ে আসি। কার্জন হলে ফার্মেসি বিভাগের করিডরে আর হলে

আমার আশেপাশের রুমের বন্ধুদের কয়েক পৃষ্ঠা রঙিন পাতার সেই টিকিট দেখাই। টিকিট থাকলে কী হবে সঙ্গে নেওয়ার মতো যথেষ্ট টাকা তো নেই। আছে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে লেখক সম্মানী পাওয়া সামান্য টাকা। নতুন পাসপোর্টের শেষ পৃষ্ঠায় সাতাশ ডলার এনডোর্স করে নিই। বন্ধুদের বিস্মিত, মুগ্ধ ও ঈর্ষান্বিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে আমি রিক্সা নিয়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছাই। বিমানের ফ্লাইটে ব্যাংকক পৌঁছে সেখানেই নিতে হয় অন-এরাইভাল ভিসা। আমার আব্বা তখন ব্যাংককে। ভাই-ভাবি ও তাঁদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে স্বপ্নের মতো কাটে কয়েকটা সপ্তাহ।

ব্যাংককে ও তার আশেপাশে বেশ কিছু জায়গা ঘুরে দেখেছি। শায়িত বুদ্ধ, এমারেল্ড বুদ্ধ আর ছোটো বড়ো নানান মন্দির। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল মুয়ান বুরাং বা প্রাচীন নগরী নামের একটা জায়গা। আর বেশ খানিকটা দূরে ব্রিজ অন দ্য রিভার কাওয়াই। কিছুদিন আনন্দে কাটিয়ে ফিরে আসি ঢাকায়। সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট স্টোর থেকে কেনা শার্ট আর প্রাতুনামের দোকান থেকে কেনা নীল কর্ড্রয় প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াই। আবার কবে বিদেশে যাওয়া হবে কে জানে।

দুই

এর মধ্যে এম ফার্ম পরীক্ষা শেষ করে দুবছর চাকরি করি ফাইসন্সে। বিয়ে করি। তারপর যোগ দিই আইসিডিডিআরবি-তে। নতুন একটা প্রজেক্ট। সেখানকার চাকরির বড় আকর্ষণ বিদেশে ট্রেইনিং। কাজে যোগ দেওয়ার অল্প কদিন পরেই কাজের সূত্রে প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। ভ্রমণের আগে স্পনসরের সঙ্গে যোগাযোগ, নানারকম প্রস্তুতি, টেলেক্স ও পত্রবিনিময় ছিল খুবই নতুন অভিজ্ঞতা। প্রস্তুতি শেষ হলে পরে দীর্ঘ দুমাসের জন্যে অস্ট্রেলিয়া যাত্রা। স্ত্রী ও মেয়েকে রেখে একা যেতে হবে এত দূর।

এবার টিকিট আসে আমাদের প্রকল্পের স্পনসর প্রতিষ্ঠান থেকে। টিকিট-বইয়ে অনেকগুলো পৃষ্ঠা বা কুপন। কিছুটা পথ যেতে হবে থাই এয়ারওয়েজে আর তারপর কোয়ানটাস। ক্যানবেরা তো আসলে খুব বেশি দূরে নয়। ভেঙে ভেঙে যেতে হয় বলে গন্তব্যটা দূরের বলে মনে হয়। অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পথে প্রথমে ব্যাংককে যাত্রাবিরতি। তারপর সিঙ্গাপুরে থাকতে হয় তিনদিন। সেখানে দাতা সংস্থা আইডিআরসি-র অফিসে দুদিন মিটিং। প্রথম দিনেই ওদের কাছ থেকে টাকা বুঝে নিই। আর বাকি সময় অরেঞ্জ গ্রোভ রোড থেকে অরচার্ড স্ট্রিট ও অন্যান্য রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। ১৯৮৩ সাল। ছোট্ট দেশ সিঙ্গাপুর তখন সবে আধুনিক নগরী হিসেবে গড়ে উঠছে। রিজিওনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ সেন্টার একটা বিশাল ভবন। তাতে হোটেলের মতো রুম আছে। সেখান থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে বড়ো রাস্তায় আসি। তখনও লাকি প্লাজাতে ছোটো ছোটো দোকান। আর সেসব দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কর্মচারীরা ক্রেতাদের ডাকাডাকি করেন। টুরিস্ট গাইড বই দেখে জানতে

পার্লামেন্ট ভবন দেখার উৎসাহ ভারতীয় ও বাংলাদেশিদের মধ্যেই বেশি

পারি এখানকার দোকানে জিনিসপত্র নিয়ে দামাদামি চলে। আশেপাশে গড়ে উঠেছে দুতিনটি বড়ো ডিপার্টমেন্ট স্টোর।

তিন

সিঙ্গাপুর থেকে রাতের ফ্লাইটে সিডনি যাত্রা। আমার মতো নবীন বিমানযাত্রীর কাছে সেটা একটা দীর্ঘ ফ্লাইট বলে মনে হয়। ভোরে সিডনি পৌঁছে ইমিগ্রেশন সেরে বের হই। ক্যানবেরা যাওয়ার ফ্লাইট ছাড়বে ডোমেস্টিক টার্মিনাল থেকে। কীভাবে নির্দিষ্ট শাটল বাসে ইন্টারন্যাশনাল থেকে ডোমেস্টিক টার্মিনালে যেতে হবে সে ব্যাপারে আমার কাছে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে। আমার ক্যানবেরা ফ্লাইট এনসেট এয়ারলাইন্সে। বাইরে বেরিয়ে দেখি একটা শাটল বাস দাঁড়িয়ে আছে। ইউনিফর্ম পরা একজন কর্মীকে জিগ্যেস করি আমি সেটাতে উঠব কি না। সে আমার টিকিট দেখতে চায়। তারপর বলে, এই বাস হচ্ছে টিআইআই-এর। আমার টিকিট এনসেট-এর। তাই আমাকে 'ওয়াইট' করতে হবে। পরের বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এই কথাটুকুই শুধু স্পষ্ট বুঝলাম। সামনের বাসের গায়ে বড়ো করে লেখা ট্রান্স অস্ট্রেলিয়ান এয়ারলাইন্স। টিআইআই অর্থ যে টিএএ সেটা বুঝতে পারার মধ্য দিয়ে আমার অস্ট্রেলিয়ান ইংরেজির সঙ্গে পরিচয় ঘটল। এরপর দুই মাস ধরে বাসে,

অফিসে, দোকানে ও ছাত্রাবাসে ওদের একসেন্ট বোঝার চেষ্টা করেছি। আর ইউ গোয়িং টু-ডাইড এ কথাটায় আমার মৃত্যুর আশংকা ব্যক্ত হচ্ছে না। আমি আজ যাব কি না সেটাই জানতে চাইছেন প্রশ্নকর্তা।

ডোমেস্টিক টার্মিনালে এনসেট ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করতে করতে দুপুর গড়িয়ে গেল। সেখানে টমাস কুকের দোকান থেকে আমার ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে কিছু অস্ট্রেলিয়ান ডলার সংগ্রহ করি। ট্রাভেলার্স চেক জিনিসটা কী তা আমাদের প্রজন্মের কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। এখনকার প্রজন্মকে হয়তো এটা গুগল করে জানতে হবে। আমার স্পনসর এ-যাত্রায় ক্যানবেরাতে থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তার বাইরে চায়ের সরঞ্জাম, বই খাতা, ও অন্যান্য প্রাথমিক বা এককালীন খরচের জন্যে টাকা দিয়েছে। আর দিয়েছে প্রতিদিনের যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্যে দৈনিক হারে নির্দিষ্ট টাকা। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। বেশ খিদে পেয়েছে। এই টার্মিনালে কয়েকটা খাবারের দোকান আছে, কিন্তু সেখানে কারোর সহজ ইংরেজি কথাও আমি বুঝতে পারি না। খাবারের ছবির সঙ্গে বড়ো করে দাম লেখা আছে ফাস্ট ফুডের দোকানে। দেড় ডলার দিয়ে ম্যাকডোনাল্ডস-এর বার্গার কিনে খাই। হ্যামবার্গারে হ্যাম থাকে না– এ কথাটা কিছুদিন আগেই শুনেছি। এটা জানার পরেও খেতে ভালো লাগছে না কেন কে জানে। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে খেতে আমি হিসেব করে দেখি হাত খরচের জন্য দৈনিক কত ডলার দিয়েছে। প্রতিদিন কত টাকা খরচ করতে পারব। কোনো খাওয়া ভালো না লাগলেও সেটাই খেতে হবে? না কি অন্য উপায় আছে?

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে উরসুলা হল

চার

ক্যানবেরা এয়ারপোর্টে নেমেই একজন বন্ধু পেয়ে গেলাম। তারপর থেকেই আমার জীবন আনন্দময় হয়ে উঠল। আমাকে নিতে এসেছে পল হজসন। সে এখানকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব অস্ট্রেলিয়ার লাইফ সাইন্স বিভাগের প্রিন্সিপ্যাল লাইব্রেরিয়ান। সে নিজেই আমার স্যুটকেস টেনে নিয়ে গাড়িতে তুলল। কথায়, গল্পে, হাসিতে আমাকে আপন করে নিতে ওর দশ মিনিটও লাগল না। গাড়ি চালাতে চালাতে সে আমাকে বলে দেয়, আমি যেন আমার টাকা খরচ করে কিছুই না কিনি। আগেই সে আমাকে চিঠি লিখে দিয়েছিল, এখানে অনেকটা সময় একা একা থাকতে হবে। আমি যেন আমার পছন্দের গানের অডিও ক্যাসেট নিয়ে আসি। দুমাসের জন্যে সে আমাকে তার ক্যাসেট প্লেয়ার ধার দেবে। সেটা ও নিয়েই এসেছে। আর এনেছে চায়ের পানি গরম করার ইলেকট্রিক কেটল ও এরকম আরো কিছু সরঞ্জাম।

আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একটা ছাত্রাবাসে। উরসুলা কলেজ তার নাম। তিনতলা ভবনে অনেকগুলো রুম। ছাত্রাবাসের মতোই প্রতি ফ্লোরে বেশ কিছু বাথরুম আছে। নারী ও পুরুষের জন্যে আলাদা করা। নিচ তলায় বড় একটা খাওয়ার ঘর। সেখানে আমি সকালের নাশতা খাব। লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে। আগের দিন একটা বড় খামে যদি লিখে দিই পরদিন কী লাঞ্চ চাই তাহলে ব্রেকফাস্টের সময় ঐ খামটিতেই সেই স্যান্ডুইচ ও আপেল অথবা কলা ভরে আমার জন্যে রাখা থাকবে। সকালে নাশতা খেয়ে ওটা নিয়ে আমি বাসে করে ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব অস্ট্রেলিয়া-র অফিসে চলে যাব। সন্ধ্যায় ডিনার খেতে হবে ছটার মধ্যে। অর্থাৎ পাঁচটায় অফিস থেকে বের হয়ে সোজা এখানে খেতে আসতে হবে। একটু দেরি হলেই সে রাতটি কাটাতে হবে উপবাসে। কাছাকাছি আর কোনো দোকানপাট নেই। প্রথমদিন বিকেলে পল আর আমি এইসব জেনে নিতে নিতে এক কাপ চা খাই। তারপর পলকে বিদায় দিয়ে নিজের রুমে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘুম যখন ভাঙে তখনও সন্ধ্যা হয়নি, কিন্তু ডিনারের সময় শেষ। ডাইনিং রুম বন্ধ। মাঝখানের উঠোন জুড়ে পাতা চেয়ার টেবিলে কয়েকজন ছেলেমেয়ে গল্প করছে। তারা আমাকে দেখে হাই বলে। আমি হাত তুলে হাই বলি। কিন্তু ওদের সঙ্গে কী কথা বলব তা ভেবে পাই না। কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে একটা ভেন্ডিং মেশিন পেলাম। তাতে নানা রকম স্ন্যাকস ও সফ্‌ট ড্রিঙ্কস আছে। পয়সা ফেলে বোতাম টিপে চেষ্টা করতেই এক প্যাকেট চিপস বেরিয়ে এলো। রুমে ফিরে গিয়ে সেটা দিয়ে ডিনার সেরে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

পাঁচ

পরের দিনটা ছিল ছুটির দিন। সকালে নাশতার পর দেশে চিঠি লিখি। চিঠি পোস্ট করার জন্যে স্ট্যাম্প আর ডাকঘর কোথায় পাবো? একজন বলল, ক্যাম্পাসের মধ্যেই

পাহাড় ঘেরা জাতীয় উদ্যানের পথে

আছে পোস্ট অফিস, তবে ১৫-২০ মিনিট হাঁটতে হবে। ক্রিক পেরিয়ে মাঠ ও জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে প্রশাসনিক ভবনের দিকে।

একটু পরেই পল এসে হাজির। আমাকে দোকানে নিয়ে যাবে বলে ও জানতে চায়, আমার কী কী কিনতে হবে। আমার একটা বড়ো পানির পাত্রের প্রয়োজন। সেটার ইংরেজি নাম জানি না। আমি বললাম আমার একট বড়ো মগ চাই। পল বলে, তোমাকে আমি দুটো কফির মগ দিয়েছি। লাগলে আরো দুটো দেবো। তুমি ওসব কিনে পয়সা নষ্ট কোরো না। তবু আমি ওর সঙ্গে দোকানে যাই। আমার বড়ো মগ লাগবে, আর অন্য কয়েকটা জিনিস। উলোয়ার্থস নামের একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোর এবং একটা সুপারমার্কেট ঘুরে দেখেও আমার দরকারমতো জলপাত্র পাই না। একটা এক লিটারের অরেঞ্জ জুস কিনে ফেলি। কিন্তু ওটা খালি হতে দুদিন লেগে যাবে। জরুরি কেনাকাটা সেরে উরসুলা কলেজে ফিরে আসি।

ছুটির দিনে এখানে দেওয়া হয় কোল্ড লাঞ্চ। বেশির ভাগই সালাদ ও রুটি। নিচের উঠোনে একটা টেবল ঘিরে কিছু ছেলে মেয়ে গল্প করছে। আজ আমি ওদের সঙ্গে পরিচিত হই। ব্রায়ান, জন, পল ওরা সবাই এ দেশের মানুষ, এখানকার ছাত্র। আমি এত দূর থেকে এসে এখানে কীভাবে রুম পেলাম, এই খাবার খেয়ে কীভাবে থাকব সেসব ভেবে ওরা বেশ চিন্তিত। ওদের হাতে বিয়ারের বোতল। বোতলের আকার ও আকৃতি দেখে মনে হয় এটাই তো আমার দরকার। একটা খালি বোতল আমার লাগবে বলে চেয়ে নিই। রুমে চলে আসি।

কিছুদিন পর একদিন ঐ ছেলেদের একজন আমাকে ডেকে ওদের সঙ্গে বসতে বলল। ব্রায়ান আমাকে এগিয়ে দিল বিয়ারের বোতল। আমি খাব না বলতেই ও অবাক। বলে, ইফটেক, তুমি তো আমার চেয়েও বেশি ড্রিংক কর। তোমাকে প্রায়ই করিডরে বোতল হাতে হাঁটতে দেখি। ওয়াশরুমে যাওয়ার সময়ও দেখি বোতল হাতে। শাওয়ারে যাওয়ার সময়ও খাও? আমি বিয়ার বা অন্য কোনো মদ খাই না– এটা ইংরেজিতে বলা কঠিন নয়। কিন্তু খালি বোতল নিয়ে কেন হাঁটি সেটা ওকে ইংরেজিতে কীভাবে বুঝিয়ে বলব তা মনে মনে গুছিয়ে এবং ইংরেজি অনুবাদ করে উঠতে পারি না।

ছয়

আমার ইংরেজি বলার অস্বাচ্ছন্দ্য দেখে ট্রেইনার পল অবাক হয়। আমি যে কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সারাংশ লিখে পাঠিয়েছি সেগুলো ওর বেশ পছন্দ হয়েছে। ওরকম নির্ভুল ইংরেজি যে লিখতে পারে সে কেন ফ্লুয়েন্ট ইংরেজি বলতে পারে না? পল আরো আশ্চর্য হয় যখন সে শোনে আমার অন্যতম শখ হলো শব্দের খেলা। স্ক্র্যাবল আর বগল দুটোই আমার খুব প্রিয়। পরদিনই পল অফিসে বগল খেলার সরঞ্জাম নিয়ে আসে। দুপুরে লাঞ্চের বিরতির সময় দ্রুত খাওয়া শেষ করে আমরা খেলতে বসি। কয়েকটা গেমে আমার সঙ্গে হেরে যাওয়ার পর পল আমাদের ঐ বিভাগের সহকর্মীদের ডেকে নিয়ে বলে, দেখো-- এই যুবক বাংলাদেশ থেকে ট্রেইনিং-এ এসেছে। ইংরেজি ওর মাতৃভাষা নয়, তবু ভালো লিখতে পারে। ঠিকমতো বলতে পারে না। কিন্তু সে স্ক্র্যাবল আর বগল খেলে। খেলায় আমাকে কয়েকবার হারিয়ে দিয়েছে। অন্য সবাইকে পল আমার সঙ্গে খেলতে ডাকে।

এর পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় পল আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওর বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গে বগল আর স্ক্র্যাবল। সবাইকে দেখাতে চায় আমি কেমন আশ্চর্যভাবে ওদের খেলায় ওদের হারিয়ে দিই। অন্যরা অবাক হওয়ার ভাব দেখায়। কেউ কেউ আমার সঙ্গে খেলে এবং খেলা শেষে সত্যিই অবাক হয়।

পলের সঙ্গে কোথাও গেলে সেদিন ছাত্রাবাসের ডিনার মিস করি। ওর সঙ্গে খেয়ে নিতে হয়। আমি খেতে চাই না। স্বভাবতই সবকিছুতে প্রথমে না না বলি। সেসময় অস্ট্রেলিয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিদেশীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলছে ওদেশে। তার নাম ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপ। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত খেলা। পল আমাকে প্রথম যেদিন টিভিতে খেলা দেখার আমন্ত্রণ জানাল সেদিনই প্রথম ওর বাসায় যাওয়া। ওর বউ কাজ থেকে ফিরবে আরো পরে। আমরা ওর বাসায় গিয়ে টিভি চালিয়ে খেলা দেখতে বসি। পল কফি বানাতে শুরু করে আমাকে জিগ্যেস করে, কফি চাও? নাহ, চাই না। কফি তৈরি হবার পর চিপসের প্যাকেট খুলে ও আমাকে জিগ্যেস করে, চিপস চাও? আমি জোর দিয়ে বলি, না না, কিছু লাগবে না। পল আয়েশ করে

সোফায় বসে কফি খেতে খেতে খেলা দেখে। চিপস খায়। আমি আড় চোখে সেটা দেখি, আর খেলায় মন বসাতে চেষ্টা করি।

কিছুক্ষণ পর ওর বউ আসে। পল আমার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়। সিলিয়া প্রথমেই বলে এ কী পল, তুমি একা একা কফি খাচ্ছ, ইফটেক-কে কিছু অফার করনি? পল টিভির দিকে চোখ রেখে বলে, অফার করেছি তো, ও কিছু চায় না। সিলিয়া এবার নিজের জন্যে চা বানাতে বানাতে আমাকে জিগ্যেস করে, তুমি চা চাও? হাঁ, চাই। চিপস বা নাটস চাও? হাঁ, অল্প একটু দিতে পারো। এবার খেলা ছেড়ে পল আমার দিকে অবাক হয়ে তাকায়। --তাহলে তুমি আগে বললে না কেন, কী আশ্চর্য, সো স্যরি, আমি একা একা কফি আর চিপস খাচ্ছি, তোমাকে জিগ্যেস করলাম, তুমি বললে, চাও না...। আমি অনেক কষ্ট করে ওদের বোঝাই, কেউ কিছু খেতে বললে আমরা প্রথমেই না বলি। কী দরকার ছিল... লাগবে না... এগুলো বলা আমাদের সংস্কৃতি। পল অবাক হয়ে শোনে।

পলের বস ছিলেন নারী। জ্যোতির্ময়ী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না। তিনি আমাদের বিভাগে এসে একদিন আমাকে লাঞ্চে দাওয়াত করলেন। পলকে জিগ্যেস করলেন কোন রেস্তোরাঁতে যাওয়া যায়। কিন্তু দাওয়াত করলেন শুধু আমাকে। আমাকে খাওয়ানোর জন্যে সবাই তাজমহল নামের একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁ বেছে নেন। পলের সঙ্গে খেতে গিয়ে সেখানকার খাবার আমার বেশ ভালো লেগেছিল। ওদের বিফ ভিন্দালু ছিল দারুণ সুস্বাদু। পল আমাকে সতর্ক করে দেয় যে আমি যেন সংকোচ না করে নিজের পছন্দের খাবারের অর্ডার দিই। আর এখানে কেউ কাউকে দাওয়াত করা মানেই কিন্তু এই নয় যে সে বিল দিয়ে দেবে। সুতরাং আমি যেন আমার বিল দেওয়ার জন্যে তৈরি থাকি। ততদিনে আমি ওদের সঙ্গে একটু একটু গল্প করতে শিখেছি। উচ্চপদস্থ ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ গল্প করতে ভালোই লেগেছিল। আর খাবারের বিল উনিই দিয়েছিলেন। আমি টাকা দিতে চাইলেও তিনি তা দিতে দেননি।

সাত

প্রতিদিন নির্দিষ্ট বাসে করে লেক বার্লি গ্রিফিন পার হয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরির লাইফ সাইন্সেজ বিভাগে পৌঁছাই আমি। এই অপরূপ লেক, তার মাঝখানে কুক ফাউন্টেন নামের ফোয়ারা আর লেকের ওপারে ন্যাশনাল গ্যালারি ও ন্যাশনাল লাইব্রেরির বিশাল ভবনগুলো অতি চেনা হয়ে যায়। সেখানে ছবি তোলার কথা মনেই পড়ে না। দুমাস প্রায় প্রত্যেকদিন পলের সঙ্গে কাজ করেছি। আর বগল ও স্ক্র্যাবল খেলেছি। ওর ধারণা ছিল খেলতে খেলতে এক সময় ও আমাকে হারাতে শুরু করবে। দুমাস পর ও যেদিন আমাকে ক্যানবেরা এয়ারপোর্টে বিদায় জানাতে আসে সেদিনও সঙ্গে করে বগল সেট আর কাগজ কলম নিয়ে আসে। বোর্ডিং-এর আগে পর্যন্ত খেলি আমরা। পলের খুব ইচ্ছে ছিল আমি কোনো একটা কাজ নিয়ে ওদেশে স্থায়ীভাবে চলে যাই।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব অস্ট্রেলিয়া

সেটা সম্ভব নয়। সেদিন খেলা শেষ করে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁপে কেঁপে ওঠে পল হজসন। আমরা দুই বয়স্ক বালক একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিই। কিন্তু ওর সঙ্গে আমার কোনো ছবি নেই।

দুবছর পর পল দুসপ্তাহের জন্যে ঢাকায় আসে আইসিডিডিআরবি-র ঐ প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়নের জন্যে। দাতা সংস্থা আইডিআরসি ওকেই নিয়োগ দিয়েছে ওই কাজে। ততদিনে আমি প্রকল্প ছেড়ে আমার নিজের জগৎ– ওষুধ কোম্পানির চাকরিতে ফিরে গিয়েছি। তবু ঢাকায় পল যতদিন ছিল প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় আমরা একত্রিত হয়ে বগল ও স্ক্র্যাবল খেলেছি। এক পর্যায়ে আমার সম্মতি নিয়ে ও সোনারগাঁও হোটেল ছেড়ে আমাদের বাসায় এসে থাকতে শুরু করে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়াতে অভিবাসী হওয়া এই শ্বেতাঙ্গ বিদেশি ছোট্ট ফ্ল্যাটে আমাদের সঙ্গে থাকে। গরমের মধ্যে ফ্যান চালিয়ে, মশারি টানিয়ে ঘুমায়। ডাল ভাত খায়, গল্প করে এবং খেলে। শুধু আমার সঙ্গেই খেলে না, আমার ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গেও খেলে। ওর জন্যে সাইকেল কিনে আনে। এসব দেখে আমাদের বাড়ির কাজের মেয়েরা হাসে। পল খুব সরলভাবে জানতে চায় ওরা হাসছে কেন।

এরপর আমাদের কাজের জগত একেবারেই আলাদা হয়ে যায়। আমি পর্যায়ক্রমে আইসিআই, রোন পুল্যান্‌ক রোরার, এভেন্টিস ও সানোফিতে কাজ করি। কখনো কাজের সূত্রে, কখনো শুধুই বেড়ানোর জন্যে আরো কয়েকবার অস্ট্রেলিয়া গিয়েছি। সিডনি, কফস হারবার, কেয়ার্নস, গ্রেট ব্যারিয়ার রীফ এরকম বেশ কিছু জায়গাতে

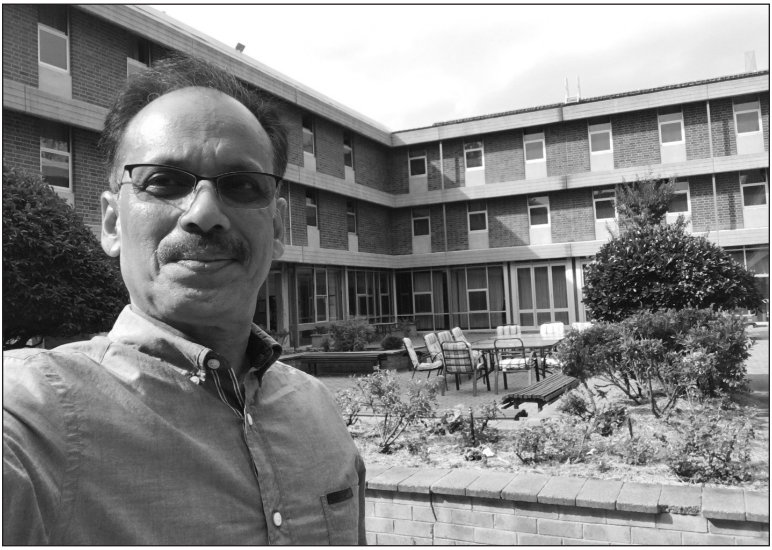

উরসুলা হলের মাঝখানে গল্পের উঠোন

বেড়াতে যাওয়া হয়। ক্যানবেরা আর যাওয়া হয় না। আমার ক্যানবেরার স্মৃতি মানেই পল হজসনের স্মৃতি। অথচ ওর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। পুরানো দিনের কায়দায় ও মাঝে মাঝে চিঠি লিখত। উৎসব উপলক্ষ্যে কার্ড পাঠাত। তারপর যোগাযোগ ক্ষীণ হতে হতে এক সময় ছিন্ন হয়ে যায়। ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমের যুগে পুরানো বন্ধু খুঁজে পাওয়া তো খুব কঠিন হবার কথা নয়। ফেসবুকে লিঙ্কড ইনে কত পল হজসন আছেন। কিন্তু কোথাও আমার প্রিয় বন্ধুকে খুঁজে পাই না।

আট

ওষুধ শিল্পের ব্যবস্থাপনার জগতে প্রায় পুরো জীবন কেটে যায় আমার। অবসরের নির্দিষ্ট সময় হওয়ার আগেই সানোফির কাজ থেকে বিদায় নিয়েছি। প্রিয় সহকর্মী মাহবুব ভাইয়ের অকালমৃত্যুতে মন খুব খারাপ হয়েছিল। তাঁর মেয়ে বৃষ্টি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করতে ক্যানবেরা যাওয়ার সময় আমার সঙ্গে কথা বলে। খুব আন্তরিকভাবে ও আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখে। বারবার যেতে বলে আমার কলেজ জীবনের বন্ধু গল্পকার অনুবাদক মৃত্তিকাবিজ্ঞানী ফজল হাসান। শেষ পর্যন্ত ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে আবার আমি ক্যানবেরা যাই।

সিডনি থেকে ক্যানবেরা যাওয়ার পথে দেখি দাবানলে পুড়ে যাওয়া অরণ্যের ধোঁয়া ও ছাই উড়ছে সর্বত্র। এ এক অন্যরকম অস্ট্রেলিয়া। সূর্য ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বাতাসে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অসংখ্য বন্য প্রাণী, বিশেষ করে শত শত কোয়ালার মৃত্যুর কথা শুনি।

ক্যানবেরা পৌঁছে প্রথমেই বৃষ্টিকে দেখতে যাই ওর সুন্দর এপার্টমেন্টে। তারপর ফজল হাসানের বাড়িতে ওদের আতিথেয়তায় চমৎকার সময় কাটে। কয়েকটা দিন ওর সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। পল হজসনের কথা মনে করে সজল হয়ে ওঠে চোখ। ফজল হাসান যত্ন করে আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখায় ক্যানবেরার আশেপাশের সব দর্শনীয় জায়গা। কটার ড্যাম দেখা শেষ করে সেখানকার ডিসকভারি ট্রেইল ধরে হাঁটি আমরা।

ছত্রিশ বছরে এ অঞ্চলে অনেক কিছুই নতুন হয়েছে। এখন আরো কত কী দেখার আছে। বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে ক্যানবেরা স্পেস সেন্টার। ওদের বিশাল কমিউনিকেশন সেন্টার-- ছবি তোলার মতো অনেক কিছু আছে। কিন্তু আমার দেখতে ইচ্ছে করে অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপিটাল টেরিটরির প্রকৃতি, পাহাড় ঘেরা টিডবিনবিল্লা জাতীয় উদ্যান, সেখানে ঘুরে বেড়ানো ক্যাঙ্গারু। আর ক্যানবেরা শহরের ভেতরের চেনা জায়গাগুলো।

ছত্রিশ বছরে কত বদলে যায় একটা শহর। জনসংখ্যা বেড়েছে, আবাসিক এলাকা প্রসারিত হয়েছে, বেড়েছে বাড়িঘরের সংখ্যা। ফজল হাসানের গাড়িতে করে ঘুরে দেখি সেই বার্লি গ্রিফিন লেক, সেই ক্যাপ্টেন কুক ফাউন্টেন একই রকম আছে আজও। লেকের এক পাশে ক্যাপ্টেন কুক মেমোরিয়াল আর অন্য পারে ন্যাশনাল লাইব্রেরি সব আগের মতো আছে। আগের মতোই আছে এএনইউ ক্যাম্পাস। উরসুলা কলেজের নাম হয়েছে উরসুলা হল। কিন্তু সেই তিনতলা ভবন ঠিক আগের মতো আছে। শুধু বহু যুগ আগে বাংলাদেশ থেকে আসা তরুণটি এখন অনেক বদলে গিয়েছে। তার কাছে এখানকার রুমের চাবি নেই। আগের কোনো ছবি নেই। এবার ছবি তুলে রাখি।

এডিনবরার দিনরাত্রি

কামরুল হাসান

এডিনবরা বিমানবন্দরটিকে শান্ত আর ঘরোয়া মনে হলো। তেমন জৌলুস বা কোলাহল নেই, আছে নিয়মবদ্ধ শৃঙ্খলা যেখানে যাত্রীদের বিভাজন ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর নন-ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘিরে মীমাংসিত। যথারীতি নন-ইউরোপীয় যাত্রীদের লাইনটি দীর্ঘ। ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা অনেক কাগজপত্র পরীক্ষা করে, আমি যে আল-কায়েদার সদস্য নই, তাতে আশ্বস্ত হয়ে, প্রবেশের সীল বসালেন। ইস্তানম্বুল বিমানবন্দরের জমজমাট পরিবেশের তুলনায় অনেক নির্জন এ পরিবেশ।

ঢাকা থেকে এডিনবরা পর্যন্ত একত্রে আসা দলটি কেমন যেন দ্রুত ভেঙে গেলো, যেন দ্রুত পৌঁছাতে হবে কোনো জমজমাট গানের আসর কিংবা খেলার মাঠে যেখানে আসনসংখ্যা সীমিত আর গান বা খেলা ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। তারা চলে গেলে একাকী

ও বিষণ্ন হয়ে আমি বাস১০০ ধরলাম। টার্মিনাল থেকে বেরিয়েই স্কটিশ শীতের তীব্র ঝাঁঝ টের পেলাম। কাল রাতে তুষারপাত হয়েছে, বাস শহরের পথ ধরতেই তুষারাবৃত পর্বতসারি দেখলাম। পরে জেনেছি এর নাম Pentland Hills (ভাগ্যিস, Penthouse Hills হয়নি)। আমার চোখে বরফঢাকা পাহাড় এক অভিনব দৃশ্য!

দোতলা বাসটির দোতলার একেবারে সমুখে গিয়ে বসি, যাতে দৃশ্যের পুরোটা চোখের সমুখে পাই। পাথর বা পাথরসদৃশ্য ইটনির্মিত বাড়িগুলো আকারে ছোট। একসময় হয়তো আবাসন ছিল, এখন বিমানবন্দরের নিকটে হওয়ায় বেশিরভাগই রেস্ট হাউস বা রেস্তোরাঁয় রূপান্তরিত। শৈশবে বাড়ি আঁকতে বললে যে ধরণের বাড়ি আঁকতাম, দু'পাশে খাড়া চাল, মধ্যিখানে দরোজা আর দু'পাশে দু'টি জানালা, বাড়িগুলোর চেহারা অনেকটা তদ্রুপ। পথে মানুষ নেই কোনো, সব গৃহবন্দী। কেবল বাসস্টপে দু-একজন যাত্রী ওঠে, নামে। আমার পরিচিত শহর দৃশ্যের কত বিপরীত এ ছবি–তাই ভাবি। চারিদিকে ফুটে উঠছে নির্মল পরিচ্ছন্নতা। শীতের প্রকোপে বেশিরভাগ বৃক্ষ পত্রপল্লবহীন, কিন্তু সবকিছু এমন নিখুঁত সাজানো যে না দেখলে বিশ্বাস হয় না ওই বৃক্ষসারি ঈশ্বর নির্দেশিত।

বাস নামিয়ে দেয় রুট ১০০র শেষ স্টপেজ ওয়েভারলি স্ট্যান্ডে। SYHA (Scottish Youth Hostel Association) যে নির্দেশনা দিয়েছিল, তা মেনে সমুখের T-junction-এর প্রশস্ত সড়কটিই প্রিন্সেস স্ট্রিট হওয়ার কথা। হলোও তাই। হাঁটব কি, আমি মুগ্ধবিস্ময়ে দেখতে থাকি এডিনবরার সবচেয়ে দৃশ্যমান, এর ল্যান্ডমার্ক Castleটি। ২২ বছর আগে যেখানে দেখে গিয়েছিলাম ঠিক সেখানেই আছে, মহাজাগতিক টানে অন্যত্র সরে যায়নি। মনে পড়ে গেল আমার লেখা একটি কবিতার কিছু চরণ:

'প্রভাতে দেখি অবিকল আশ্চর্য দূরত্বে আছে নীনাদের বাড়ি

মহাজাগতিক টানে চলে যায় নি, পুরনো পথগুলো

এলোমেলো সম্পর্ক খুব ধরে রাখে জলপারাপার করে দেবে বলে'

প্রিন্সেস স্ট্রিট ধরে ডানদিকে গেলেই সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চত্বর, সেখান থেকে কেবলই ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া লীথ ওয়াকের দিকে। যতটা কাছে ভেবেছিলাম, সিহা যেমন লিখেছিল, 'we are just round the corner', সেই corner টি খুঁজে পেতে সময় লাগল। দু'টি ভারি সুটকেস টেনে নিয়ে যেতে পরিশ্রমই হলো, যদিও তাদের নিচে চাকা লাগানো তবুও, কেননা পেভমেন্ট সর্বত্র সমতল বা মসৃণ নয়। পথে মিজান নামের একজন বাঙালি ভদ্রলোকের সাথে দেখা হলো, আমার রং ও চেহারা দেখে যিনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন আমি তার স্বদেশীয় কেউ হবো।

এডিনবরা ইয়ুথ হোস্টেল

সিহা পৌঁছে পরিচয় দিতে আমাকে চিনতে পারল Corin নামের সাদা চুলে লাল রঙ লাগানো বার্বি পুতুলের মতো দেখতে মেয়েটি, কেননা এর সাথে সীট বুকিং করতে গিয়ে পত্রবিনিময় (স্রেফ দাপ্তরিক) হয়েছিল। করিন আমাকে বল্ল, সমুখের লাউঞ্জে অপেক্ষা করতে, কেননা চেক-ইনের সময় হয়নি। পরমুহূর্তেই সে বল্ল, তোমার তো গতকালই আসার কথা, তাই না? রুম রেডি, তুমি সরাসরি রুমে চলে যেতে পারো।

রুমে গিয়ে দেখি একটি কক্ষে তিনটি সিঁড়িযুক্ত Bank খাট, অর্থাৎ ৬ জনের থাকার (শোয়া বলাই ভালো) ব্যবস্থা। অন্যান্য facilities মন্দ নয়, ওই lower ground লেভেলেই self-catering kitchen (হায়, আমার রান্না শেখা হয়নি), লন্ড্রি, ডাইনিং ও লিভিং স্পেস আছে। উপরে রয়েছে রেস্তোরাঁ ও লবি। ওই গাদাগাদি করে থাকা ছাড়া অন্য সবকিছুই গ্রহণযোগ্য। এই দামি বিদেশে দৈনিক ১৬ পাউন্ডে এর চেয়ে বেশি কী আর আশা করা যায়? যাক, প্রাথমিক ঠিকানা তো হলো এই ভিন্নজগতে!

সিহা হোস্টেলের কাফেটেরিয়ায় স্যুপ ও স্যান্ডউইচ খেয়ে বের হই। বাইরের আর ভেতরের তাপমাত্রায় দুস্তর ব্যবধান টের পাই। বহুস্তর শীতবস্ত্র, টুপি, গ্লাভস, ওভারকোটে আমাকে কিম্ভূতকিমাকার দেখায়। শহর দর্শনের লোভে তবু বের হই আর মনে মনে বলি, 'কী শীত রে বাবা, একেবারে হাড় কাঁপিয়ে দিলো' (উষ্ণ অঞ্চলের মানুষ আমি, দেখিনি এমন)!

লীথ ওয়াক থেকে, তেমন খাড়া নয় ঢাল বেয়ে, ক্রমশ উপরে উঠে প্রিন্সেস স্ট্রিটে পৌঁছাই। প্রিন্সেস স্ট্রিটকে এডিনবরা শহরের শিরদাঁড়া বলা যেতে পারে। এর পশ্চিমে অর্থাৎ মাঝের খাদটির ওপারে পুরাতন শহর, আর এপারে অর্থাৎ পুবে নতুন Georgian স্থাপত্যের শহর। প্রিন্সেস স্ট্রিটের সমান্তরাল নতুন শহরে আরও দু'টি সড়ক আছে, যার একটির নাম কুইন্স স্ট্রিট। ব্রিটেনের প্রতীকবাহী রাজতন্ত্রের চিহ্ন সর্বত্রই ছড়ানো।

এডিনবরা শহরটির ইতিহাস বেশ পুরানো। খ্রিস্টের জন্মের একশ বছর পরে এ অঞ্চলে প্রথম আসে রোমানরা, এসে বসতি স্থাপন করে। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই নগরীর রূপ পেতে থাকে আজকের এডিনবরা, স্থানীয়রা যাকে 'এডিনা' বলে ডাকে। এর আরও দু'টি নাম আছে- Auld Reekie এবং Athens of the North। নর্থ সীর একটি প্রণালী Firth of Forth-এর দক্ষিণ তীরে Pentland Hills, Arthur Seat Hill এবং আরও কিছু পাহাড় ঘেরা (Lothian Hills) এডিনবরা শহরটি অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্যমণ্ডিত! সপ্তদশ শতকের প্রথম থেকেই এডিনবরা স্কটল্যান্ডের রাজধানী, তবে এটিই প্রথম রাজধানী নয়, বরং চতুর্থ, এবং জনসংখ্যায়ও প্রথম নয়, গ্লাসগোর পরে দ্বিতীয়।

প্রিন্সেস স্ট্রিট ধরে হাঁটি আর খুব দ্রুত দিনটির পরমায়ু ফুরিয়ে যাওয়া দেখি। তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটা, কিন্তু নেমে এসেছে সন্ধ্যার প্রায়ান্ধ অন্ধকার। আঁধারের পর্দা পুরোপুরি নেমে আসার আগে এডিনবরা দুর্গ ও নেলসন টাওয়ারের ছবি তুলি। পর্যটকদের পদচারণায় চঞ্চল প্রিন্সেস স্ট্রিট আলোয় ঝলমল করছে। দেখি Sale আর ৫০% off-এর বিষন্ন পোস্টার ঝুলিয়ে ক্রেতা টানার চেষ্টা করছে ক্রিসমাস উত্তীর্ণ দোকানগুলো। কমমূল্যে কেনাকাটার জন্য বছরের এ সময়টা উত্তম।

এডিনবরা শহরটি পাথরে নির্মিত পাথুরে গাম্ভীর্য টাঙানো এক শহর যার টানে প্রচুর পর্যটক এখানে আসে। লন্ডনের পরেই সবচেয়ে বেশি পর্যটক টানে এডিনবরা, বছরে এক লক্ষেরও বেশি। দোকানপাটের মাঝে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ল পানশালা (যাকে 'পাব' বলা হয়) ও রেস্তোরাঁ। তবে খদ্দের খুব একটা নেই। থাকবে কী করে? শহরটির জনসংখ্যা মাত্র পাচ লাখ, আর গোটা স্কটল্যান্ডের জনসংখ্যা পঞ্চান্ন লক্ষ। আয়তনে বাংলাদেশের অর্ধেক হবে স্কটল্যান্ড, অথচ লোকসংখ্যা ঢাকা শহরের তিনভাগের একভাগও নয়।

আরও হাঁটার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু শীত আমাকে কাবু করে ফেলে। এক পরাজিত সৈনিকের মতো হোস্টেলে ফিরে আসি।

২

মধ্যরাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়, ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে বুঝতে পারি বাংলাদেশে তখন সকাল, ঠিক যে সময়ে আমি প্রত্যহ ভোরে জেগে উঠি, সেই সময়। দেহঘড়ি জেটল্যাগে ভুগছে বুঝতে পারি। যখন ঘুমিয়েছিলাম যৌথভাগাভাগির কক্ষটিতে আমিই ছিলাম একমাত্র ভাড়াটে, ঘুম ভেঙে দেখি আরও তিনজন কখন রাতের নিঝুম প্রহরে চুপিচুপি এসে নিঃশব্দে ঘুমুচ্ছে।

আমার প্রতিবেশীদের ঘুম যেন না ভাঙে তাই বেড়ালপায়ে বেরিয়ে আসি। করিডরে পা ফেলামাত্রই বাতি জ্বলে ওঠে। আমি যেখানে থাকি সেই লোয়ার গ্রাউন্ড লেভেলে একটি চমৎকার ডাইনিং ভার্সাস লিভিং রুম আছে, সেখানে বসে রোজনামচা লিখি। সেখানেও বাতি নিভে যায়, নড়েচড়ে উঠলে ফের বাতি জ্বলে উঠে। বিদ্যুৎশক্তির অপচয় রোধেই এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। রোজনামচা লিখতে লিখতে আমার অনিবার্য মনে পড়ে যায় প্রিয় সন্তানদের কথা, তখন কেবল বিষন্নতা নয়, বিপন্নতাবোধ গ্রাস করে আমায়।

প্রাতঃরাশ টেবিলেই তাকে প্রথম দেখি, শ্মশ্রুমণ্ডিত বয়স্ক মানুষটি ল্যাপটপে কী যেন টাইপ করছেন। পাশেই কাগজ, তাতে প্রুফ রিডিংয়ের অজস্র চিহ্ন, বুঝতে পারি পাতায় চিহ্নিত ভুলগুলো কম্পিউটারে সংশোধন করে নিচ্ছেন। আমার কৌতূহল দেখে তিনিও আগ্রহী হলেন, পরিচয় হলো আমাদের। ইনি ড. অলিভার গোদিচে, ফ্রান্সের নাগরিক, বহু বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, বিচিত্র তাঁর জীবন। এডিনবরার নির্জনতায় বসে দীর্ঘদিন ধরে লেখা একটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গোছাচ্ছেন। কীসের বই? আমার কৌতূহলের উত্তরে জানান তাত্ত্বিক জ্ঞানকে কী করে প্রায়গিক জ্ঞানে রূপান্তরিত করা যায় তাই নিয়ে বইটি (তাঁর ভাষায় ‘A book on Methods’)। বিপুল গ্রন্থ, ইতোমধ্যে লিখে ফেলেছেন সাড়ে আটশ পাতা!

আজকের দিনটির আচরণ রমণীর মতো রহস্যময়। কখনো হাসিমুখ, পরক্ষণেই বেজার। হোস্টেলে লিফলেট দেখেছিলাম এডিনবরা দুর্গ থেকে হলিরুড প্রাসাদ পর্যন্ত প্রসারিত যে এক মাইল পথ, যাকে এরা Royal Mile বলে, যার দু’পাশ ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষী, সেখানে বেলা এগারটায় ফ্রি গাইডেড ট্যুর শুরু হবে। দ্রুত হেঁটেও ট্যুরটি ধরতে পারি না, পথে পথে আমাকে থামিয়ে দেয় বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপত্যের দৃষ্টিনন্দিত রূপ আর আমার ছবি তোলার বাসনা।

তখন একা একাই রয়েল মাইল ধরে হাঁটি। ইতিহাসখ্যাত সেন্ট জাইলের গির্জাটির চারপাশে বিখ্যাত সব মানুষদের larger than life স্ট্যাচু দেখি। এরা হলেন ধ্রুপদী অর্থনীতি শাস্ত্রের জনক অ্যাডাম স্মীথ, দার্শনিক হিউম প্রমুখ। হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই এডিনবরা দুর্গচত্বরে। রয়েল মাইল যেন পাহাড়ের শিরদাঁড়া, আর তার মস্তকে বসানো রয়েছে দুর্গটি। দৃষ্টিনন্দন দুর্গটি পর্যটকদের জন্য মস্ত এক আর্কর্ষণ, যার বড় পাথুরে

এডিনবরা ক্যাথিড্রাল

প্রাঙ্গণ থেকেই নেমে গেছে রয়েল মাইল নামক একমাইল-দীর্ঘ ঐতিহাসিক সড়কটি। সেটি যেখানে সমতলে গিয়ে মিশেছে, সেখানে হলিরুড প্যালেস। ইংল্যান্ডের যেমন বাকিংহাম প্যালেস, স্কটল্যান্ডের তেমনি হলিরুড প্যালেস। রাজপ্রাসাদের একেবারে সমুখে নির্মিত হয়েছে স্কটিশ পার্লামেন্ট ভবন, প্রাসাদের ভিক্টোরিয়ান স্থাপত্যরীতির বিপরীতে যা তীব্র আধুনিক। পুরনো এডিনবরার মধ্য দিয়ে যাওয়া এই রাজকীয় পথটির কিছুটা ঢালুতে Cowgate ও Grass Market। নাম থেকেই অতীতের স্কটল্যান্ডের অর্থনীতিতে গবাদিপশুর গুরুত্বের ইঙ্গিত মেলে। কাউগেটের কাছে স্কটিশ জাতীয় জাদুঘর ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়। এই দুর্গ আর ওই প্রাসাদ ঘিরে প্রাচীন এডিনবরার প্রাণকেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল সপ্তদশ শতকে, যা উনবিংশ শতাব্দীতে নবরূপ লাভ করে। পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত রয়েল মাইলে বেশ কিছু সড়ক এসে মিশেছে, এদের মাঝে সবচেয়ে প্রশস্ত 'হাই স্ট্রিট'। ১৮২৪ সালে এ সড়কের বিরাট অংশ The Great Fire of Edinburgh-এ পুড়ে গেলে এর দু'পাশ ১৮২৮ সালে পুনর্নির্মিত করা হয়। এখন আমরা, পর্যটকরা, যে ভবনগুলো দেখি সেগুলো সেসময়েই নির্মিত। এছাড়া কয়েকটি পাথুরে সিঁড়িখচিত সরু রাস্তা নেমে গেছে নিচে, যার একটি হলো Canongate, এ পথে এডিনবরা দুর্গের কামানসমূহ ওঠানো হতো। রয়েল মাইলের পাশেই এডিনবরার রেলওয়ে স্টেশন ওয়েভারলি। প্রিন্সেস স্ট্রিট আর রয়েল মাইলের মাঝে সংযোগ তৈরি করেছে নর্থ ব্রিজ, ভূমি থেকে যা অনেকটা উঁচুতে ঝুলে আছে।

এডিনবরার একটি শপিং মল

এডিনবরা দুর্গ থেকে এক মাইলের এক-তৃতীয়াংশ পথ নামলেই সেন্ট জাইল গির্জা চত্বর। রাজমুকুটের আদলে নির্মিত এর চূড়ো এডিনবরার আকাশসীমার একটি দর্শনীয় চিহ্ন। গির্জাটির অন্য নাম High Kirk of Edinburgh, যা চার্চ অব স্কটল্যান্ডের প্রধান প্রার্থনাগৃহ এবং প্রায় ৯০০ বছর ধরে স্কটল্যান্ডের প্রধান ধর্মীয়কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এর দক্ষিণ পাশেই পার্লামেন্ট চত্বর যেখানে স্কটল্যান্ডের পুরনো পার্লামেন্ট ভবন রয়েছে। এডিনবরার প্রধান বিচারালয়টিও এই ভবনের ভেতরেই ছিল। সে চত্বরে কয়েকজন মানুষের সাথে দেখা হয়, এরা খ্রিস্টধর্মের প্রচারে নিয়োজিত। 'How Life Began' নামক যে পুস্তিকাটি তারা আমার হাতে গুঁজে দেন, তাতে বাইবেলের আলোকে 'বিগ ব্যাং তত্ত্ব'কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা রয়েছে। ধর্মপ্রচারকদের ব্যবহার খাটি বিনয়মিশ্রিত, তারা বিশ্বাসী হলেও বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করেন না। প্রাচীন হয়ে পড়া ধর্মকে কী করে বর্তমান যুগের সাথে মেলানো যায়, গির্জাবিমুখ মানুষকে ফেরানো যায় গির্জায়, সেই প্রচেষ্টা তাদের।

কনকনে ঠাণ্ডার সাথে যা আরও শীতল করে ফেলে দেহ তা হলো হিমেল হাওয়া। মাঝে মাঝে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি তাতে যোগ করল দুর্ভোগ। দেহ তো বহুস্তরে ঢাকাই, তার সাথে টুপি, মাফলার, গ্লাভস মিলে ভজঘট অবস্থা। এডিনবরা দুর্গের চত্বরে গ্লাভস হারিয়ে ফেলি, হাতে কোনো বোধশক্তি নেই, কখন যে পড়ে গেছে টেরই পাইনি।

আমার সাথে দেখা করতে এলেন তরুণ কবি ও লিটলম্যাগ সম্পাদক তানভীর রাতুল। রাতুল লিভারপুলে থাকেন, পড়াতে আসেন এডিনবরা। বাইরের বাতাস ও

বৃষ্টি থেকে বাঁচতে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম প্রিন্সেস স্ট্রিট সংলগ্ন প্রিন্সেস শপিংমলে। রাতুল যখন এলো আমি ভড়কে গেলাম, বিলেত প্রবাসী মাইকেল মধুসূদন দত্তই যেন এগিয়ে এলেন। রাতুল বহুযত্নে বর্ধিত করছে তার মাইকেলীয় গোঁফজোড়, পোশাক-আশাকেও মাইকেলীয় ফ্যাশন। সে আমাকে নিয়ে যায় প্রিন্সেস মলের কেএফসি শপে। বিলেতে সাহিত্যচর্চা নিয়ে আমাদের বাকবিনিময় হতে থাকে। বার্মিংহাম থেকে সে মুহূর্তে আমাকে ফোন করেন কবি মুজিব ইরম। সে জানতে চায় আমি কবে বার্মিংহামে তার কাছে যেতে পারব। আমাদের সমুখের টেবিলে চারটি কিশোরী মেয়েকে দেখি, যারা অনুপম লাবণ্যময়। বয়স তাদের আরও কান্তিময়, আরও নমনীয় করে তুলেছে। এ বয়সের কিশোরীদের যা হয়, কথায়-কথায় হেসে গড়িয়ে পড়া, এ-ওর সাথে খুনশুটি করা, এরাও তার ব্যত্যয় নয়। ফ্রাইড চিকেন আর আলু ভাজা খেতে খেতে রাতুলের সাথে গল্প করি আর নয়নভরে দেখি ওই স্বর্গঅপ্সরীদের।

আমার ক্লাস শুরু হবে আগামী সপ্তাহে। এ সপ্তাহে তেমন কিছু করার নেই। ঘুরে-ফিরে এডিনবরা শহরটি দেখার ইচ্ছে, সে ইচ্ছে ততটা পাখা মেলে না তীব্র শীতের কারণে। তাপমাত্রা শূন্যের আশেপাশে ঘুরছে, কখনো নেমে যায় মাইনাসের ঘরে। শীতের কারণেই পোশাক-আশাক এস্কিমোদের মতো, তাতে স্বস্তি নেই তীব্র গরমে হালকা পাতলুন গায়ে চাপিয়ে বেড়ানো বাঙালির। আমি আর রাতুল কিছুক্ষণ প্রিন্সেস স্ট্রিট ধরে হাঁটি। পরে রাতুল ঢুকে পড়ে একটি বড় বিপণিবিতানে আর আমি বিদায় নিয়ে সিহা হোস্টেলে ফিরে আসি। রাতুল আজই লিভারপুলে তার গৃহে ফিরে যাবে। এডিনবরাতে সে আসে এখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে সাহিত্য পড়াতে।

আমার বিলেতপ্রবাসী বন্ধুরা আমাকে ফোন করে কুশলাদি জিজ্ঞেস করে, বিশেষ করে আবাসন সঙ্কট থেকে উদ্ধার আর তীব্র শীত থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে আমার বন্ধুরা চিন্তিত। আমার এই বন্ধুরা সকলেই চিকিৎসক। যেহেতু তারা গ্রেট ব্রিটেনের বাসিন্দা আর আমি সেখানকার অতিথি, তাই আমি হয়ে উঠি প্রত্যেকের অতিথি। বন্ধুদের হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়ে আমি শীতকে পরাস্ত রাখি, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপাড়ে যে বিলেত, সেখানে তাদের হৃদয়-আবাসে উষ্ণ আশ্রয় পাই!

৩

স্কটিশ ইয়ুথ হোস্টেলে উঠেছি বিলেতে প্রবাস জীবনের প্রথম দিনসমূহের ঝক্কি, অনিশ্চয়তা ও অজানাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য। এটা সাময়িক ব্যবস্থা, আমাকে থ াকতে হবে মার্চের শেষ সময় পর্যন্ত, সুতরাং আবাসন প্রয়োজন। এ ব্যাপারে নিরন্তর চেষ্টা করে গেছে আমার ঢাকা মেডিকেল কলেজ জীবনের বন্ধু ডা. মেজবাহ রহমান। সুদূর ওয়েলশের সোয়ানসিতে বসে স্কটল্যান্ডের এডিনবরায় আমার জন্য ঠাঁই খুঁজে

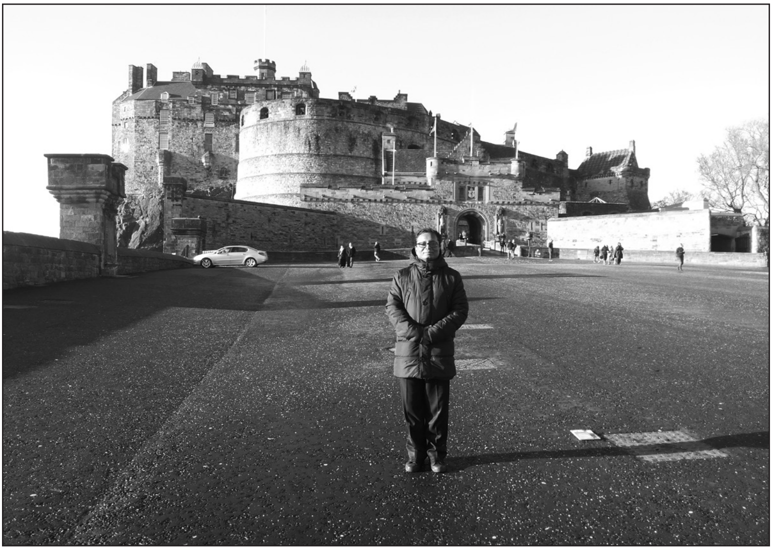

এডিনবরা দুর্গের সামনে লেখক

বেরিয়েছে। প্রথমে এডিনবরায় মাসিক ৩০০ পাউন্ড, পরে পার্শ্ববর্তী গ্লাসগো শহরে ২৫০ পাউন্ডে দু'টো বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকার ব্যবস্থা করে। এতদিন আড়ালে থেকে হঠাৎই সক্রিয় হয়ে ওঠে মেডিকেল জীবনের আরেক বন্ধু ডা. ফরিদ। ওর পরিচিত এক বাঙালির চল্লিশ কক্ষবিশিষ্ট প্রায় প্রাসাদোপম বাড়ি, যার অর্ধেকটাই খালি থাকে, সে বাড়ির আশ্বাস শোনায়। নিরাশ্রিত কবির বিনাখরচে মাথাগোঁজার ঠাঁই মিলে যেতেও পারে। জাহিদ যে সম্ভাবনার কথা বলেছিল, 'Kamrul's living cost is moving towards zero', তাই যেন সত্যি হতে চলেছে।

এডিনবরা শহরে অনেক যুগ আগে থেকেই ট্রাম সার্ভিস চালু রয়েছে। এখনকার কোচগুলো ঝকঝকে, তকতকে আর শহরের সর্বত্রই দেখা যায় লাল রঙের Lothian বাসগুলো। ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত লোথিয়ান বাস কোম্পানি কেবল এডিনবরার নয়, যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় মিউনিসিপাল বাস কোম্পানি। এই সুবৃহৎ বাস কোম্পানির রয়েছে ৭২১টি বাস, যেগুলো ৭০টি রুটে চলাচল করে; কেবল এ শহরেই নয়, এ অঞ্চলের সর্বত্র। বাসগুলো ঝকঝকে, দীপ্তময়; কোনোটি একতলা, কোনোটি দোতলা। একবার চড়লে দেড় পাউন্ড, সারাদিন চড়লে সাড়ে তিন পাউন্ড। শহরটি চষে বেড়ানোর জন্য সাড়ে তিন পাউন্ড দিয়ে সারাদিনের টিকিট কাটি। কোন বাস কোন রুটে চলে, কোনদিকে ধায়, আমি তার কিছুই জানি না। অজ্ঞানতা এখানে পাপ নয়, কারণ আমার উদ্দেশ্য ঘুরে বেড়ানো। যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে যাক বাস,

আমি এ জনপদের চিত্রই পাবো। প্রথমে যে বাসটি বাসস্টপে আসে আমি সেটিতেই চড়ি, এর নম্বর ৪৯। এসব বাসে কোনো কন্ডাক্টর নেই, ড্রাইভার থেকে টিকিট কিনে বাসটির দোতলায় সমুখে গিয়ে বসি।

এডিনবরা শহরের সবচেয়ে imposing স্থাপনা হচ্ছে এডিনবরা দুর্গ। শহরের কেন্দ্র ছাড়িয়ে শহরতলির দিকে যেতেই 'Pentland Hills' চোখে পড়ে, কোথাও বরফে আচ্ছাদিত, কোথাও কালো রঙের খালি পিঠ। আর চোখে পড়ে মানুষের সাধ্যমতো ঘরবাড়ি। বিভিন্ন নকশার বাড়িগুলো উঁচু নয়, বেশিরভাগই দোতলা, কেবল কাউন্সিল হাউসগুলো বেশিতলার, তাও সুউচ্চ নয় একটিও। এডিনবরা তার রূপে এতটাই পুরনোগন্ধী যে এ শহরে একটিও স্কাইস্ক্র্যাপার নেই।

বাস গিয়ে থামে Harriot-Watt University-র শান্ত, নির্জন ক্যাম্পাসে। এখানেও ভবনগুলো উঁচু নয়। বাসে এত কম যাত্রী চলাচল করে যে অবাক হই না দেখে বাস থেকে নামা শেষ ও একমাত্র যাত্রী আমি। নেমেই বাস্পীয় ইঞ্জিনের আবিস্কারক জেমস ওয়াটের স্ট্যাচু দেখি। ইনি স্কটল্যান্ডের কৃতীসন্তানদের অন্যতম। এই বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম শুনেছি বেশ কয়েক বছর আগেই, বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান এর outreach campus ঢাকায় এনেছিল, কিন্তু সততা ও যোগ্যতার অভাবে চালাতে পারেনি। একই বাসে ফিরি, বিশ্ববিদ্যালয়টির একজন আমেরিকান ছাত্রীর সাথে আলাপ হয়। একহারা গঠনের দীর্ঘদেহী সোনালি চুলের মেয়েটি দেখতে যেমন আকর্ষণীয়, আলাপচারিতায় তেমনি বিনয়ী ও ভণিতাহীন। আমেরিকা থেকে স্কটল্যান্ডে পড়তে এসেছে শুনে আমি একটু অবাকই হই, কিন্তু ঐতিহ্যগত টানেই অনেক আমেরিকান গ্রেট ব্রিটেনকে তাদের পিতৃপুরুষের আবাসভূমি বলে মনে করে, ভাষা ও কৃষ্টির মিল সে ভাবনাকে সহজ করে দিয়েছে। আমেরিকায় যেমন প্রচুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে পাওয়া যায়, ইংল্যান্ড বা স্কটল্যান্ডে তা পাওয়া যায় না, এখানে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম শ্রেণির, ভালো মানের। এখানে পড়তে আসার সেটাও একটি কারণ।

৪৯ নম্বর বাসে করে শহরের কেন্দ্র প্রিন্সেস স্ট্রিটে এসে নামি। এরপরে চড়ি ৩৪ নম্বর বাসে, সেটি ছাড়ে সড়কের অপর পার্শ্ব থেকে। এখানে ট্রামলাইন চলে গেছে। রাস্তা পার হতে গিয়ে দেখি একপাশে গাড়ি থমকে আছে, আমাকে পার হবার ফুরসত করে দিচ্ছে। পথচারীকে তারা এতটাই প্রাধান্য দেয়। আমার মনে পড়ে গেল ২২ বছর আগে ব্রাডফোর্ডের নিকটস্থ ইলক্‌লে শহরে আমি একবার ভুলক্রমে জেব্রা ক্রসিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে অপর পার্শ্বের দোকানপাট দেখছিলাম, রাস্তা পার হওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু ওই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি জেব্রা ক্রসিংয়ের উপর, দু'পাশে গাড়ি এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমাকে দ্রুত পার হবার জন্য হর্নও বাজাচ্ছিল

না কেউ। এমনই ভব্য এদের আচরণ। লজ্জিত হয়ে আমি তড়িঘড়ি সড়কটি পার হয়ে গিয়েছিলাম। আরেকবার লন্ডনের এক গ্রোসারি স্টলের ভেতর একইরূপ ঘটনা ঘটেছিল। বিলেতে অনেক গ্রোসারি স্টলের ভেতর পোস্টাপিস রয়েছে। এমনি একটি পোস্টাপিসের কাউন্টারের সমুখে অমনোযোগে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, দাঁড়িয়ে কাউন্টারের ডিসপ্লেতে রাখা শুভেচ্ছা কার্ড দেখছিলাম। খেয়াল করিনি, একসারি মানুষ, বেশিরভাগই প্রৌঢ়, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন আমার অপেক্ষায়, আমি সরে গেলে তবে তারা কাউন্টারে চিঠি পোস্ট বা টিকিট ক্রয় করতে এগুবেন। আমি আদৌ কিনব কিনা তা কিন্তু একবারও আমাকে জিজ্ঞেস করেননি। লজ্জিত হয়ে আমি যখন তাদের এগিয়ে যেতে বলি এই বলে যে, 'আমি কিছু কিনছি না', তখন আমাকে ডিঙিয়ে এগুতে দ্বিধাগ্রস্ত সমুখের প্রৌঢ় মানুষটি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'Are you sure?' কী অপার বিনয়! নিজের দেশের অনেক মানুষের আচরণের কথা ভাবি আর অধোবদন হই। ঢাকার সড়কে কে কাকে পাশে ঠেলে, দরকার হলে গুঁতো মেরে সমুখে এগিয়ে যাবে তার প্রতিযোগিতা চলে। আমরা কেউ কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে নারাজ, আর এদের কাছে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়াই হলো রীতি, ভব্যতা।

৩৪ নম্বর বাস অন্য রুট ধরে দূর দূর আবাসিক এলাকায় চলে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় আমাকে। এডিনবরায় শহরের মাঝেই অনেকগুলো পার্ক আছে। আমরা বলি বাংলাদেশ সবুজ, তাতে সন্দেহ নেই কোনো, কিন্তু প্রকৃতিদত্ত সে সবুজকে কতখানি যত্ন করে রাখি আমরা? এরা কিন্তু যত্ন করে রাখে, পরিকল্পিতভাবে সবুজের সমারোহ তৈরি করে, যেখানে যা মানায় তাই রোপন করে, প্রাচীন বৃক্ষসমূহ রক্ষা করে অতিযত্নে। ৩৪ নম্বর বাস থেকে নেমে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করি, সন্ধেনাগাদ ১০ নম্বর বাসে চড়ি। ১০ নম্বর বাসরুটটি বেশ দীর্ঘ, এডিনবরার একপ্রান্ত ওয়েস্টার্ন হারবার থেকে অন্যপ্রান্ত বোনালি পর্যন্ত সম্প্রসারিত। আমি অবশ্য অতদূর যাইনি, পথে নেমে পড়ি। প্রথমে ভেবেছিলাম আরও অনেক রুটে ঘুরে বেড়াব, কিন্তু শীতের প্রকোপে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। ঠাণ্ডা কোনোভাবেই লাগানো যাবে না এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে। তাই হোস্টেলে ফিরে আসি। রাত্রি তখনো যুবতী।

ড. অলিভার গোদিচের সাথে কাল আলাপ হয়েছে। জ্ঞানী মানুষটির শৈশব কেটেছে ফ্রান্সের প্রাক্তন উপনিবেশ মরক্কোয়। সেখানকার খাবার কুসকুস তার প্রিয়। চাইলেন আমি যেন তাঁর অতিথি হই। লীথ ওয়াকের কিছুটা ঢালে Casablanca নামের রেস্তোরাঁয় কুসকুস খাই। মরক্কোর স্টাইলে সাজানো ছোট রেস্তোরাঁটিতে খদ্দের গুটিকয়, নরোম আলোয় মনোরম পরিবেশে কুসকুস খাই। কুসকুস হলো ভেড়ার মাংসের সাথে চিকন চালের সমাহার, সঙ্গে বাটিভর্তি ঝোল। বাংলা খাবারের সাথে তার যথেষ্ট মিল। খেতে খেতে তিনি তার নতুন বই ও মরক্কোয় কাটানো শৈশব নিয়ে

এডিনবরার একটি ল্যান্ডমার্ক

কথা বলেন। বহুবিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ, যে বইটি লিখছেন তাতে জীববিজ্ঞান থেকে শুরু করে মহাকাশবিদ্যা পর্যন্ত সবই আছে। মানুষটি কথাপ্রিয় আর জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলতেই তিনি পছন্দ করেন। রাত্রি দশটা নাগাদ আমরা যখন হোস্টেলে ফিরে আসি; লীথ ওয়াক প্রায়নির্জন, কেবল কিছু গাড়ি এদিক-ওদিক যাচ্ছে। প্রায় যাত্রীহীন বড় বড় লোথিয়ান বাসগুলো তখনো তাদের রুট মেনে চলাচল করছে, মধ্যরাত পর্যন্ত তারা ক্লান্তিহীন চলবে, কোনো কোনোটি চলবে সারারাত।

৪.

আজকের দিনটি সূর্যের বদান্যতায় স্বর্ণমোড়ানো, রৌপ্যঝলমলে। এডিনবরা দুর্গের চত্বর থেকে আলোয় উদ্ভাসিত প্রিন্সেস স্ট্রিট, নেলসন স্তম্ভ, সেন্ট জাইলস গির্জার চূড়া প্রভৃতি দেখি। রৌদ্রের সোনালি ঝিলিক থাকলে কী হবে, কনকনে শীতে জমে যায় হাত, আঙুল, কান, মুখমণ্ডল। কাল হারিয়েছিলাম গ্লাভস, আজ হারাই মাথার টুপি।

এভাবে হারাতে হারাতে আমি প্রায় শীতবস্ত্রহীন (না, পুরোটা নয়)। আমি যেখানে থাকি সেই লীথ ওয়াক থেকে এডিনবরা দুর্গের দূরত্ব হবে দু'মাইল। এই পুরো পথটাই চড়াই, ধীরে উঠতে হয় যেন পাহাড়ের পাদদেশ থেকে তার চূড়ায় চড়ছি। সর্বশেষ লৌহযুগের অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্মের দ্বিতীয় শতক থেকেই এই পাহাড়চূড়ায়, যার নাম ক্যাসেল রক, (Castle Rock) মনুষ্যবসতির সন্ধান পেয়েছেন পুরাতত্ত্ববিদগণ। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত দুর্গটি ছিল স্কটিশ রাজপরিবারের প্রধান নিবাস, পরে অবশ্য এটি ব্যবহৃত হতে থাকে রাজকীয় সেনাবাহিনীর ব্যারাক হিসেবে। একটি পুরো গ্যারিসনই এখানে থাকতো। পঞ্চদশ শতকে স্কটিশ স্বাধীনতার যুদ্ধ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্যাকোবাইট বিদ্রোহের কেন্দ্রে ছিল এ দুর্গ, যা এখন স্কটল্যান্ডের জাতীয় ইতিহাসেরই এক বিরাট প্রতীক ও চিহ্ন। ১১০০ বছরের প্রাচীন ইতিহাসে দুর্গটি মোট ২৬ বার শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছে; যে কারণে এটিকে ব্রিটেনের সবচেয়ে বেশি অবরুদ্ধ স্থাপনা বলে গণ্য করা হয়। শত্রু দ্বারা এতবার আক্রান্ত হওয়া সামরিক স্থাপনা গোটা দুনিয়াতেই খুব কম আছে। এখন যে দুর্গটি আমরা দেখি তা আড়াই শত বছরের পুরনো। এত কাল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গটি এখন আমার সমুখে শিরোন্নত ভঙ্গীমায় দীপ্ত দাঁড়িয়ে, প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া পর্যটকদের আনন্দ ও বিস্ময়ের প্রধান বিষয়। আজ থেকে ২২ বছর আগে আমি যখন এ চত্বরে প্রথম দাঁড়িয়েছিলাম সেসময়কার অনুভূতি আবছা মনে আসে, তখন অভিভূত হয়েছিলাম আরও বেশি।

হোস্টেলে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেই, চা ও স্যান্ডউইচ খাই। এক পাউন্ড দিয়ে এক ঘণ্টার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমার সন্তানদের সাথে যোগাযোগ করি, ঢাকায় তখন বিকেল। তারা ভালো আছে জেনে স্বস্তি নিয়ে রেরুই। উদ্দেশ্য লন্ডন যাওয়ার বাসের টিকিট কেনা। এডিনবরার সেন্ট্রাল বাস স্টেশনটি সিহা হোস্টেল থেকে খুব দূরে নয়। এখানে এমন পথের মোড়, পার্ক বা মাঠ পাওয়া যাবে না যেখানে অতীতের রাজা কিংবা যুদ্ধবাজ সেনানায়কদের স্মৃতিস্তম্ভ নেই। এছাড়া রয়েছে প্রতিভাবান মানুষদের মূর্তি। আজ পেলাম শার্লক হোমসের জনক স্যার আর্থার কোনিয়ান ডোয়েলের পূর্ণদৈর্ঘ্য স্ট্যাচু। মাথায় হ্যাট, হাতে চুরুট, ঝুঁকে থাকা মূর্তিটি যেন তাঁরই সৃষ্ট ভুবনখ্যাত গোয়েন্দাটির মতো। এই অমিত প্রতিভাবান লেখক জন্মেছিলেন এই জায়গাটির সন্নিকটেই–জেনে কেঁপে উঠি অন্তরে। এর কিছু পরেই তরিৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বের জনক জেমস ম্যাক্সওয়েলের স্ট্যাচু দেখি। তখনও একটা তড়িৎধারা বয়ে যায় চুম্বকীয় শরীরে।

দুপুর নাগাদ শাহজালাল মসজিদে চলে যাই। মসজিদটি সিহা হোস্টেলের প্রায় পেছনেই, বাঁক ঘুরলেই তার দেখা পাওয়ার কথা, কিন্তু আমার বেশ কিছুটা সময় চলে গেলো তা খুঁজে পেতে, কেননা মসজিদের যে পরিচিত চেহারা তা নেই শাহজালাল

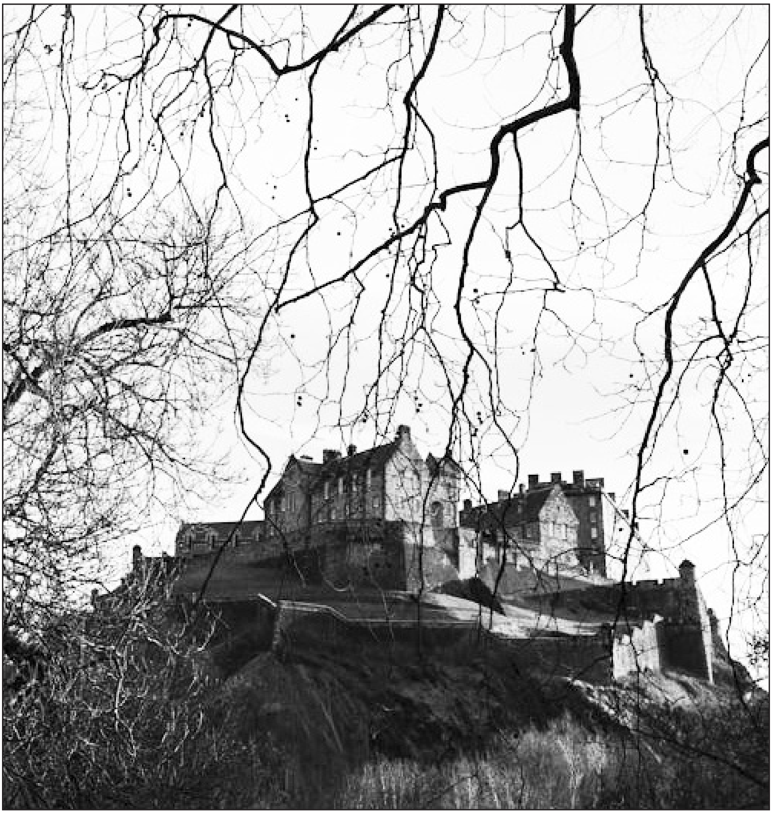

এডিনবরা ক্যাসেল

মসজিদের। একটি সাদামাটা দোতলা দালানের উপরতলায় মসজিদটি। চারপাশে শান্ত ও সুশোভিত একটি আবাসিক এলাকা, এতটাই মনোলোভা যে সেখানে বাড়ি কিনে থাকতে ইচ্ছে করল। উপরে উঠে ইমামের সিলেটি টানে উচ্চারণ করা বাংলা বয়ান শুনে বুঝি এটি বাঙালিদের মসজিদ, যদিও প্রার্থনাসারিতে ভিনভাষী কিছু মুসলমান দেখলাম। কাছেই আরেকটি মসজিদ আছে, যেটা পাকিস্তানিদের। এখানেই ড. ওয়ালি তছর উদ্দিনের সাথে দেখা হয়। মানুষটি সজ্জন ও বন্ধুত্বপূর্ণ। আমাকে শনাক্ত করে আমার পাশে এসে জায়নামাজের উপর বসলেন আর করমর্দনের জন্য হাতখানি বাড়িয়ে ধরলেন। নামাজ শেষে তার ভাগ্নে ফয়সাল চৌধুরীর গাড়িতে চড়িয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন তার রেস্তোরাঁ Britannia Spice-এ। সেখানেই দুপুরের আহার। বেশ ক'টি দিনের বিরতিতে মাছ-ভাত খেয়ে বাঙালি রসনা তৃপ্ত হলো।

বাঙালিভোজের পর আমি হাঁটতে যাই কাছের Ocean Terminal নামক এক অত্যাধুনিক শপিংমলে। নর্থ-সীর একটি প্রণালী Firth of Forth-এর তীরে জায়গাটি নৈসর্গিক–জাহাজ, সমুদ্র, আকাশ মিলে দৃষ্টিনন্দন! সেখানেই ভিড়ে আছে Royal Britannia জাহাজটি, যাকে ঘিরে ওসেনিয়া টার্মিনাল শপিংমলের সুদৃশ্য কফি হাউস ও রেস্তোরাঁগুলো তাদের টেবিল পেতেছে (a view of the sea and the ship with food and drink)। ড. ওয়ালির রেস্তোরাঁর নামের উৎপত্তিও সে জাহাজ।

রয়েল ব্রিটানিয়া জাহাজটিকে পুরোদস্তুর জাহাজ না বলে ইয়ট বলাই ভালো, তবে এটি খুব বিখ্যাত এ কারণে যে, সুদীর্ঘ ৪৪ বছর ব্রিটেনের রাজপরিবার এ ইয়টে চড়ে সমুদ্রে বেড়িয়েছেন। সমুদ্রে এটি পাড়ি দিয়েছে দশ লক্ষ মাইলেরও বেশি পথ। কেবল সমুদ্রভ্রমণ নয়, ইয়টটিকে এমনভাবে বানানো হয়েছে যে এটিকে একটি ভাসমান হাসপাতালে রূপ দেওয়া যায়। ব্রিটেনের রানী এ যানটিকে জলের উপর তাঁর ভাসমান আবাস ও দূরবর্তী যাত্রার বাহন–দু'ভাবেই ব্যবহার করেছেন। এটি হয়ে উঠেছে রাণী ও কমনওয়েলথের এক মর্যাদাবাহী প্রতীক। আশ্চর্য নয় যে, রয়েল ব্রিটানিয়া ইয়ট স্কটল্যান্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় পর্যটক আকর্ষণের অন্যতম। এটি যেখানে নোঙর করা তার নাম আলবার্ট ডক বেসিন। ফার্থ অব ফোর্থের একটি জলজ অংশ দু'পাশের ভূমিবেষ্টিত, সেই সরু চ্যানেলটির নাম আর্থার ডক বেসিন যার মুখটায় একটি চতুস্কোণ দীঘির মতো জলাধারে রয়েছে ইয়টটি। এডিনবরার কেন্দ্র হতে শহরের উত্তরপ্রান্তে এ স্থানে অনেকগুলো লোথিয়ান বাস (রুট ১১, ২২, ৩৪, ৩৫ ও ৩৬) আসে ।

ওসেন টার্মিনালটি যে স্থানে নির্মিত সেখানে আগে ছিল হেনরি রব (Henry Robb) নামের একটি জাহাজ নির্মাণশালা। ১৯৮৩ সালে শিপইয়ার্ডটি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলে এস্থানে একটি অত্যাধুনিক শপিংমল নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় এডিনবরা কাউন্সিল। এ স্থানটি মূলত পূর্বের কাছাকাছি কিন্তু আলাদা দু'টি বন্দর নিউহ্যাভেন ও লীথের মধ্যকার সীমান্তে অবস্থিত। ৮৫টি দোকান, যার ভেতর বিশ্বখ্যাত ব্রান্ড বিএইচএস (Bhs) ও ডেবেনহ্যামস (Debenhams) রয়েছে, ৬টি রেস্তোরাঁ, ৩টি কফিশপ এবং আরও কিছু স্থাপনা নিয়ে জমজমাট এই অত্যন্ত আকর্ষণীয় শপিংমলটি ২০০১ সালে চালু হয়। এর নকশা তৈরি করেছেন বিখ্যাত স্থপতি স্যার টেরেন্স কনরান (Sir Terence Conran)। দোকানপাটের বাইরে রয়েছে ব্রিটেনের সর্বত্র যে সিনেমা কমপ্লেক্সটি ছড়ানো, সেই ভ্যু (Vue)। এছাড়া রয়েছে একটি স্পা ও শরীরচর্চা কেন্দ্র। আমি কিছু কিনি না (জিনিসপত্র, এমনকি এককাপ কফিও চড়া দামের) কিন্তু ঘুরে ঘুরে দোকানপাট ও শপিংমলটির জৌলুস দেখি। একটি বড় কফিশপের কাচের বাইরে রয়েল ব্রিটানিয়া ইয়টটি চমৎকার চোখে পড়ে। এদের চাকচিক্য চোখে না

দেখলে বিশ্বাস হবে না, একটি ক্ষুধাপীড়িত, অভাবী গ্রহের কোনো ছায়া সেখানে নেই, পৃথিবীর ভেতরে এ যেন আরেক পৃথিবী!

পুরো বিকেলটি রয়েল ব্রিটানিয়া জাহাজ, আরও কিছু সমুদ্রপোত, ফার্থ অব ফোর্থ প্রণালী, আর্থার ডক বেসিন, ওসেন টার্মিনাল শপিংমল, সেখানকার দেবদূতীদের রূপ দেখে দেখে কাটাই। ব্রিটানিয়া স্পাইস রেস্তোরাঁয় যখন ফিরি, তখন গরম চায়ের আমন্ত্রণ নিয়ে হাস্যোৎফুল্ল দাঁড়িয়ে আছেন আর কেউ নয়, স্বয়ং ড. ওয়ালি তছর উদ্দিন। কীভাবে এই সহৃদয়তার প্রতিদান দেই? কনকনে ঠাণ্ডার ভেতর চা-পান চাঙ্গা করে তোলে দেহ-মন। ড. ওয়ালি যার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি জনাব হুমায়ুন কবির, চ্যানেল আইয়ের এডিনবরা প্রতিনিধি। তিনি এ রেস্তোরাঁতেই কাজ করেন। ড. ওয়ালির অনুরোধে তিনি রাজি হলেন আমাকে তার বাড়িতে অতিথি হিসেবে রাখতে। ঠিক হলো পুরো ফেব্রুয়ারি ও মার্চের অর্ধেকটা অর্থাৎ দেড় মাস থাকার জন্য আমার খরচ হবে ৩০০ পাউন্ড, অর্থাৎ ধারণার চেয়ে ঢের কম।

সন্ধ্যেনাগাদ আমার দু'জন সহকর্মী আশিফ ও মিসকাত আশ্রয়সন্ধানে সেখানে উপস্থিত। ঢাকায় এরা যে ধারণা দিয়েছিল তাতে মনে হয়েছিল, উত্তরের এই আত্মীয়বিরল দেশেই তাদের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় বা বন্ধুটির বাস, এখন দেখছি তাদেরও আশ্রয় নেই। ড. ওয়ালি এদেরও থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তৃতীয় সহকর্মী সাজ্জাদ ড. ওয়ালির আত্মীয়, তার আবাস আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন তিনি। সুতরাং মুরগীর চিলভীত ছানাদের মতো সকলেই একে একে ড. ওয়ালি তছর উদ্দিনের ডানার নিচে ঠাঁই নিতে থাকলেন। এডিনবরায় তিনিই আমাদের mentor, তাঁর ডানাদ্বয়ও বেশ প্রসারিত, উষ্ণ! Occum faceatiorum is consed quiae nobita aut landipsant, sequam experes tiundi doloreh enderio rerumquia suntend ucienim usanditiis cum nos moditis nosam rentiberi conserum nis quam nem hitam autendi vent ilic to to que nim eseque magnis magnis pro doluptae sequunt iuntus intia dunt ommolorest, que ra eum vent ipsa qui id exernatemos eos eum hicabor eperehe ntiurendae volorep elitio berae quatium conestiatem aut ellenias autatiat.

Ferfere nonsed ut haritat esciis adit ulparci ut voluptat ut esed estet repratus quod ut lautem et ariam verume voluptam consenem.

নিবো পর্বতের চূড়ায়

ক্ষমা মাহমুদ

তারকাদ্যুতির পয়গম্বর

আমার মা ছিলেন গল্পের বই পড়ার পোকা। নিজে পড়ার পাশাপাশি তার নেশা ছিল ছোটবেলায় আমাদের ভাইবোনদের জন্যেও বিভিন্ন রকমের বই কিনে দেওয়া। মূল উদ্দেশ্য, আমরা যেন বই এর মধ্যে ডুবে থাকি, বাইরের অসৎ সংসর্গে বখে না যাই। ঠাকুর মা, ঠাকুর দা'র ঝুলির পাশাপাশি আরো কত ঝুলির গল্প যে আমরা ভাইবোনেরা ঐটুকু বয়সে পড়ে ফেলেছিলাম, তার ইয়ত্তা নেই। ঈশপ, বীরবল, হোজ্জার পাশাপাশি, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, যিশুখ্রিস্ট আর ইসলাম ধর্মের নবী-পয়গম্বরদের জীবনকাহিনী সবই ছিল সেসব ঝুলির মধ্যে। এখন ভাবি, মায়ের কল্যাণে ভাগ্যিস ছোটতেই এসব বহু কিছু পড়া ও জানা হয়ে গিয়েছিল; নাহলে এখন হাজারো পড়ার ভিড়ে সেসবের জন্যে কি আর সময়

হতো! আর কে না জানে, ছোটবেলার অনেক কিছুই স্মৃতিতে একেবারে মণিমুক্তোর মতো ঝকমক করে বহুকাল ধরে।

ধর্মীয় গল্পগুলো যখন পড়তাম তার মধ্যে নবীদের গল্প, বিশেষ করে মুসা ও ঈসা নবী ছিলেন তারকা নবী, মানে তাঁদের অলৌকিক গল্পগুলোর প্রতি আকর্ষণ ছিল খুব বেশি। নদীতে ভেসে ভেসে ছোট মুসার ফেরাউনের ঘরেই বড় হয়ে ওঠার গল্প, তুর পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সাথে কথা বলা কিংবা লাঠি দিয়ে নীলনদের পানি দুভাগ করে সেখান দিয়ে অনুসারীদের নিয়ে চলে যাওয়ার গল্প পড়ে ভালোর জয় হয়েছে ভেবে মন আনন্দে ভরে যেত আর সেই একই পানিতে ফেরাউন নবী মুসাকে তাড়া করে নেমে সেই ভাগ হয়ে যাওয়া পানি আবার মিলে গিয়ে ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারার গল্পে শয়তানের পরাজয়ের খুশিতে মেতে উঠতাম! এইসব গল্পের আকর্ষণ ছিল আমার কাছে চুম্বকের মতো, রূপকথার মতো করে পড়েছি তাদের জীবনের এসব ঘটনাবহুল কাহিনী আর আমার ছোট মনে সেসব গল্পের রেশ রয়ে গেছে আজীবন। গল্পে পড়া সেই মুসা নবী, ঐতিহাসিকভাবে সত্য যেসব জায়গায় তার অনুসারীদের নিয়ে হেঁটে চলে বেড়িয়েছেন দীর্ঘকাল ধরে, আজ আমি এসে দাঁড়িয়েছি তেমন এক জায়গায়, নাম তার, মাউন্ট নিবো, ভাবা যায়!

জাবালে মুসা বা প্রাচীন পাহাড় নিবো

জর্ডানের রাজধানী আম্মান থেকে ৫০ কিমি দূরে এবং মাদাবা থেকে নয় কিমি পশ্চিমে কিংস হাইওয়ে ধরে এগোলেই জর্ডান ভ্যালির উপকূলে, দুহাজার ফুট উঁচুতে সর্বোচ্চ

মাউন্ট নিবোর প্রবেশমুখে পাথরের ফলক

শৃঙ্গ মাউন্ট নিবো, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭০০ মিটার উপরে, আবারিম পর্বতমালার অংশ। জাবালে মুসা বা মাউন্ট নিবোকে বাইবেলে সেই স্থান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে মোজেস বা মুসা নবী দাঁড়িয়েছিলেন ঈশ্বর প্রদত্ত তার প্রতিশ্রুত ভূমি দেখে নিতে।

হিব্রু বাইবেলে আছে, পরমেশ্বর মোজেস বা মোশিকে বলছেন, 'আমি তোমার চতুঃসীমানা লোহিত সাগর থেকে ফিলিস্তিনিদের সমুদ্র পর্যন্ত এবং মরুপ্রান্তর থেকে মহানদী পর্যন্ত স্থির করব; কেননা আমি সেই দেশগুলোর অধিবাসীদের তোমার হাতে তুলে দেব, এবং তুমি তোমার সামনে থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেবে।' এই পর্বতে দাঁড়িয়েই মুসা নবী তার জন্যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি দেওয়া সেই ভূমি দেখতে পেয়েছিলেন যদিও দুধ ও মধুপ্রবাহী সেই দেশে তার অনুসারীদের নিয়ে যেতে পারেননি। জর্ডান নদীর তীরে ইহুদি বা ইসরায়েলিদের নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু নদী পার হয়ে কানান বা ফিলিস্তিনিদের সেই দেশে পা রাখতে পারেননি, তার আগেই তার মৃত্যু হয়। হাজার হাজার বছর আগের বনি ইসরায়েলিদের সাথে এই জায়গার ইতিহাস মিশে আছে। এই জায়গার কথা তোরাহ্, বাইবেল, কোরান– সব ধর্মীয় গ্রন্থে লেখা রয়েছে মোটামুটি এই একই বর্ণনায়। মুসা নবী তাঁর বিশ্বস্ত সহচরদের নিয়ে জীবনের শেষ ৬০ বছর এই পর্বতে কাটিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। তাঁর সমাধিও এখানে কোথাও রয়েছে বলে ধারণা করা হলেও সঠিক অবস্থানটি কখনও চিহ্নিত করা যায়নি। তবে ইহুদিরা বিশ্বাস করে জেরুজালেমের ওয়েলিং ওয়ালের নিচেই রয়েছে মোজেস বা মুসা নবীর কবর, যার দখল নেওয়াকে কেন্দ্র করে আজো রক্তাক্ত হয়ে চলেছে পৃথিবীর এই ভূখণ্ডের প্রতিটি সকাল!

সিয়াগা - দ্য মেমোরিয়াল টাউন অব মোজেস

বাস থেকে নেমে দুপাশে লাল পাথুরে মাটি ছড়ানো চওড়া পথ ধরে ধরে আমরা, একটি নারী দলের বারো জন মেয়ে মাউন্ট নিবোতে হাঁটতে থাকি, নিচে থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে মনে হলো যেন মেঘের রাজ্যে ঢুকে যাচ্ছি। সুন্দর, সবুজ চত্বরে ঘেরা, পরিপাটি পাথুরে হাঁটার রাস্তা করে রাখা হয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮০০ মিটার উঁচু এই জায়গায়। শীতের বাতাস সব জায়গাতেই আমাদের হাঁটাচলা মনোরম করে তুলেছে, সেই সাথে পাখির কিচিরমিচির শুনতে পাচ্ছি অবিরত। আশপাশে অনেক টুরিস্ট বাস, পর্যটকের অভাব নেই আবার হৈ হুল্লাও নেই। বেশ শান্ত একটা পরিবেশ হলেও টুরিস্টদের হালকা কথাবার্তা, গাইডদের নানারকম বর্ণনা কানে ভেসে আসছে। আস্তে ধীরে সবাই চলছে, দেখছে, জায়গাটার শান্ত ভাবটা বজায় রাখছে সকলে, আমরাও চলেছি আমাদের গাইড ওয়ালিদ ভাইয়ের সাথে, জর্ডান দেশটি ঘুরে দেখার জন্যে আমাদের সাথে আছে সে সর্বক্ষণ এবং এরমধ্যেই ভেতরে ঢোকার টিকিটের ব্যবস্থা করে ফেলেছে সবার জন্যে। টিকিট ঘর, ঢোকার ব্যবস্থাপনা সবকিছু নিখুঁত।

পুরো পাথুরে এলাকায় বড় বড় সব প্রাচীন পাথরের সন্নিবেশ ঘটিয়েই স্থাপনাগুলো তৈরি করে এর প্রাচীনত্বটা শতভাগ বজায় রাখা হয়েছে, চারপাশে ছড়িয়ে আছে শত শত নয়, হাজার হাজার বছরের পুরানো সব চিহ্ন।

প্রতি মুহূর্তে এই জায়গার প্রাচীনত্বে আমি অভিভূত হতে হতে ভাবছিলাম যে, আজও এইসব ধর্মগুলোর নামেই ভূ-রাজনৈতিক শাসন চলছে। পৃথিবী নামক এই গ্রহ আর এর অধিবাসীদের জীবন ও বাকি সবকিছুই এই ধর্মগুলোর হাতের ক্রীড়নক হয়ে আছে। আশপাশে লাল বা কালো রঙের কেফিয়েহ পরা আরব মানুষদের দেখা মিলল যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গাইড হিসেবে কাজ করার জন্যে অপেক্ষা করছে। যেসব টুরিস্ট গাইড নিয়ে আসেনি তারা চাইলেই অর্থের বিনিময়ে তাদের সাথে রফা করে গাইড হিসেবে তাদের নিয়ে ঘুরতে পারে। গেট পার হতেই চোখে পড়ে সামনে একটা বড় পাথরের

হযরত মুসা (সা.) এর স্মৃতিপর্বত

ফলকে আরবি ও ইংরেজিতে লেখা - Memorial of Moses, Christian Holy Place. প্রতিদিন এ জায়গা সবার জন্যে উন্মুক্ত সেটাও উল্লেখ করা আছে। আরো একটু এগোলো চোখে পড়ে রক অব মোজেস বা মুসার পাথর, দ্য আবু বাদো- একটা বিশাল রোলিং স্টোন, বাইজান্টাইন সময়ের দরোজা যা মনেস্ট্রিতে ঢোকার জন্যে ব্যবহার করা হতো। ব্যাসিলিকায় যাওয়ার পথের পাথরগুলো হাজার বছর আগের বিভিন্ন সময়ে বাড়িঘরে ব্যবহার করা পাথর যা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে।

বেশ লম্বা পাথুরে রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছি, দুপাশে বড় বড় গাছপালা। সবুজ এতটুকুই, বাকিটা পাথুরে। পুরো জায়গাটা ঘিরে রাখা। নিবো পর্বত এলাকায় অনেকগুলো পিক বা শৃঙ্গ আছে তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো হলো মুখাইয়াত বা নিবো শহর আর একটা সিয়াগা বা দ্য মেমোরিয়াল টাউন অব মোজেস– যেখানে আমরা এসেছি। ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন হলে ব্রিটিশরা এই পুরো অঞ্চলের দখল নিয়ে নেয়। দীর্ঘকাল হেলাফেলায় পড়ে থাকার পর ১৯৩২ সালে ব্রাদার জেরোমে মেহায়া, এই দুটো জায়গা স্থানীয় বেদুঈনদের কাছ থেকে কিনে নেন। তখন থেকে জর্ডানের আরো অনেক খিস্টীয় জায়গার মতো মাউন্ট নিবো ফ্রান্সিসকান কাস্টডির আন্ডারে চলে আসে। মোজেসের সমাধি দেখার পুণ্য অর্জন করতে হাজার হাজার খিস্টধর্মী সারা বছর এখানে আসেন। পৃথিবীর সব খ্রিস্টানদের কাছেই জর্ডান একটি অতি পবিত্র স্থান, প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থী এখানে আসেন। মুসলমান প্রধান দেশ হলেও জর্ডানে প্রায় ৫% খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী এবং তাদের বেশিরভাগের বসবাস এই মাদাবা অঞ্চলে। এই জায়গা মুসলিমদের জন্যেও পবিত্র ধর্মীয় স্থান। ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম এই তিন প্রধান ধর্মের তিন নবীর জন্ম এই অঞ্চলে। তাই তিন ধর্মের জন্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দেশ। তিন ধর্মের মিলনস্থলও বলা যায় জর্ডানকে, যদিও যুদ্ধবিগ্রহও তাদের মধ্যে কম হয়নি।

বাইজেন্টাইন গির্জার মনোহর মোজাইক

হেঁটে হেঁটে আরো উপরে যেতেই চোখে পড়ে নিবো পাহাড়ের একদম চূড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইজেন্টাইন আমলের সেই ঐতিহাসিক গির্জা তবে পুরাতন গির্জা ভেঙে ইউনেস্কো এই নতুন গির্জা তৈরি করেছে। বলা যায়, পুরানো প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসগুলো ও মোজাইকগুলো রক্ষা করার জন্যেই নতুন করে গির্জা তৈরি করা হয়েছে। পুরানো গির্জার মোজাইকসহ যা কিছু পাওয়া গেছে সবই সংরক্ষণ করা হয়েছে নতুনটায়। মাদাবার আরেক দ্রষ্টব্য হলো এখানকার এই মোজাইকের কাজ।

সিরামিকের তৈরি অপূর্ব সব ঘর সাজানোর দ্রব্যও এখান থেকে সারা বিশ্বে সরবরাহ হয়। গির্জায় সংরক্ষিত মোজাইক জর্ডানের অন্যতম সুন্দর আর্ট পিস যা ক্রুসের আকারে

মাদাবার অপূর্ব মোজাইকের কাজ

বানানো হয়েছিল। যে ব্যাসিলিকাতে আমরা ঢুকলাম সেটি ৫৩১ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল। পটভূমিতে রয়েছে ডিটেইল রেস্টোরেশন কাজ। খুব সুন্দরভাবে জাদুঘরের মতো করে গির্জার ভেতরটা সাজানো। চতুর্থ শতকে প্রথমদিকের খ্রিস্টানরা বেশ কিছু চার্চ ও মনেস্ট্রি মাউন্ট নিবোতে তৈরি করে যা ষষ্ঠ শতকে আরো বাড়ানো হয়।

গির্জাটি তৈরির পর মেঝেতে নকশাগুলো করা হয়েছিল। ঘুরে ঘুরে মোজাইকগুলো দেখতে দেখতে আবারো মানুষের শৈল্পিক ক্ষমতার প্রতি আমার মাথা নত হয়ে আসে । গাছের নিচে বসা মানুষ, প্রকৃতি এবং অন্য প্রাণীদের সম্পর্কের বুনন পুরো মোজাইক জুড়ে। এগুলো বুঝে বুঝে দেখার জন্যে হয়তো গোটা একটা দিন লাগে, আমরা পেলাম মোটে ঘণ্টাখানেক! তবু তো দেখা হলো, সেটাই কি কম পাওয়া! গির্জা ভাঙার পর এখানে তিনটি খালি কবরও পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু সেগুলো কাদের কবর ছিল তা আর কখনও জানা যায়নি। সেই অজানা তথ্য জানা হলে কি দারুণ হতো ভেবে আমার মন কেমন আকুলিবিকুলি করে ওঠে।

সার্পেন্টাইন ক্রস

গির্জার ঠিক বিপরীত পাশে রয়েছে ব্রোঞ্জের তৈরি বিশাল এক সার্পেন্টাইন ক্রস, যেখানে সবচেয়ে বেশি মানুষের ভিড়। খ্রিস্টীয় ক্রসের সাথে বিরাট বিষধর এক সাপ পেঁচিয়ে আছে এবং মেষ বা ভেড়ার শিং এর মতো এর দুপাশে দুটো শিং বেরিয়ে রয়েছে। মোজেসের লাঠির একটা নমুনা হিসেবে এখানে এটা বানানো হয়েছে বলা হয়, যে লাঠি দিয়ে তিনি ভর দিতেন, গাছের পাতা পেড়ে মেষকে খাওয়াতেন এবং আরো নানা কাজে ব্যবহার করতেন। আসলে এটা তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। বইপত্র পড়ে আগেই জেনেছি, ইটালিয়ান ভাস্কর গিওভান্নি ফেনটনি অষ্টাদশ শতকে এটা তৈরি করেন, যা এখন সমগ্র বিশ্বে চিকিৎসকদের পরিচিত চিহ্ন তবে বিভিন্ন দেশ ক্রসের উপরের দিকে তাদের মতো করে কিছু পরিবর্তন করে থাকে।

গীর্জার অভ্যন্তরে

গাইড ওয়ালিদ ভাই সবাইকে ডেকে জায়গাটা সম্পর্কে তার গল্পগুলো বলা শুরু করেছেন। আমরা বারোটা মেয়ে অবশ্য এক জায়গায় হলেই বেশ শোরগোল হচ্ছে। বারো জনের কিচিরমিচির আর ছবি তোলার তালে। সেসব বয়সজনিত চপলতা মনে করে ওয়ালিদ ভাই ঠাণ্ডা মাথায় তার গল্প বলতেই থাকেন। কেউ কেউ মনোযোগ দিয়ে সেসব কথা শুনতে থাকলেও কেউ কেউ নিজের মতো দেখা বা ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। ছবি তোলার জন্যে একপাশে বেশ উঁচু একটা জায়গা আছে, যেখানে গিয়ে দাঁড়ালে পেছনে বিস্তৃত পাহাড়ি ভূমি আর আকাশের মেলবন্ধনের সাথে সাথে পুরো এলাকাটার একটা সুন্দর ভিউ পাওয়া যায়। আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখার ফাঁকে তার কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছি, বয়সের কারণে কখনও তার কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যদিও জানি পরে এসব গল্প সবই যাচাই করতে পারব বইপত্র ঘেঁটে তবুও একজন জর্ডানি আরবের মুখ থেকে তাদের ভূমির গল্প শোনার হিসেবটা তো একটু অন্যরকমই, অন্তত আমার কাছে, তাই মন দিয়ে শুনতে থাকি।

ওয়ালিদ ভাইয়ের মুখ থেকে যা শুনেছি আর পরে নানান তথ্য ঘেঁটে পাওয়া হাজার বছরের পুরানো সেই গল্পটা হচ্ছে, মোজেসের অনুসারী ইহুদি বনি ইসরায়েলরা মাঝে মধ্যেই নবীর অবাধ্য হলে ঈশ্বর তাদের জন্যে নানা ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন। কোনো একবার তাদের অবাধ্যতার শাস্তি হিসেবে আকাশ থেকে সর্পবৃষ্টি শুরু হয় এবং অবাধ্যদের সাপে কামড়াতে শুরু করে। মুসা নবী এই লাঠি অবাধ্যদের দিকে নিক্ষেপ করার সাথে সাথে এটি প্রকাণ্ড একটি আজদাহা অজগর হয়ে তাদের কামড় দিত বলেও কোরআনে উল্লেখ আছে। আল্লাহ হজরত মুসাকে আদেশ দেন, যারা অনুতপ্ত হবে, তাদের জন্য মুসার সাপের মতো ব্রোঞ্জের লাঠিটি দিয়ে ক্ষতস্থান স্পর্শ করলে বিষ নেমে যাবে ও ভালো হয়ে যাবে। এই ঘটনা এখানেই ঘটেছিল বলে বিশ্বাস করা হয়, এবং সেকারণেই এই ক্রস এখানে তৈরি করা হয়েছে। তিন হাজার বছর আগের পুরানো ঘটনাটা যেন সিনেমার মতো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তোরাহ্, বাইবেল ও কোরান সব ধর্মেই এই ঘটনার অভিন্ন বর্ণনা রয়েছে জেনে বিস্মিত হতে হয়।

আমার সাধ না মিটিল

গির্জা থেকে বের হয়ে পেছন দিক দিয়ে হেঁটে গেলে বিস্তীর্ণ বিশাল সবুজ প্রান্তরের দেখা মেলে, পুরো জর্ডান ভ্যালির প্যানারোমিক এক অর্পূব দৃশ্য! দূরে তাকিয়ে দেখি অসংখ্য রাস্তা কিলবিল করে চলে গেছে নানান দিকে, একেবেঁকে যাওয়া এসব রাস্তা কোথা থেকে যে কোথায় চলে গিয়েছে, ভাবলেও কেমন শিহরণ লাগে! কত হাজার বছরের পুরানো জায়গায় যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, নিজের কাছেও মাঝে মাঝে সেটা অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে! জর্ডানের বর্ডার পার হয়ে ওপাশে গেলে প্যালেস্টাইন বা ইসরায়েল। একটা রৌদ্র করোজ্জ্বল দিনে নাকি জেরুজালেম শহর এখান থেকে দেখা যায়।

আমাদের আজকের দিনটি শীতকালের কিছুটা রোদ কিছুটা কুয়াশার মতো অবস্থা, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও ভালো করে বুঝতে পারলাম না এই বিশাল সীমানার কোথায় জর্ডানের শেষ আর কোথায় বা ইসরায়েলের শুরু আর কোথায় বা সেই বিখ্যাত জেরুজালেম শহর। এখান থেকে ডেড সি দেখা যায়, যার একেবারে কাছেই মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যে কোথাও রয়েছে বেথলেহেম, যিশু খ্রিস্টের জন্মস্থান। সেখানে যাওয়া সম্ভব কিন্তু আমাদের ভ্রমণসূচিতে তা নেই। এসব জায়গা সম্পর্কে খুবই অভিজ্ঞ, এমন মানুষের সাথে এখানে এসে নিজের মতো করে সব ভালো করে বুঝতে পারলে সেই দেখা সার্থক হতো। সাধারণ দর্শনার্থীরা যা দেখে তাতেই হয়তো খুশি কিন্তু আমার মতো ইতিহাসপাগল মানুষের কিছুতেই এত অল্পে মন ভরছে না, আবার গাইডকে দলের বাইরে আলাদা করে পাওয়াও কঠিন। আমার মনের অতৃপ্তি নিয়েই আমি কিছুটা বুঝে কিছুটা না বুঝে দেখতে থাকি, মনে মনে ভাবি আবার যদি কখনও একেবারে ম্যাপ দাগিয়ে এসব জায়গা ঘুরে যেতে পারি তবেই আমার অতৃপ্ত মনের শান্তি হবে। মনকে সান্ত্বনা দিই এই বলে যে, পরে বই বা উইকিপিডিয়া ঘেঁটেঘুটে এসব যাচাই করে নেবো, দেখে তো গেলাম!

প্রমিজড ল্যান্ড

নিবো পর্বতে দাঁড়িয়ে কোন সে ভূমির প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর আসলে দিয়েছিলেন মোশি বা মোজেস বা নবী মুসাকে? গল্পটা তাহলে বলি! সে অনেক অনেকদিন আগের কথা, হজরত মুসা তাঁর স্বজাতি বনি ইসরায়েল বা ইহুদিদের মিশরের ফারাওদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে উট আর গাধার পিঠে চড়ে বা কোথাও পায়ে হেঁটে অনেক ঝড়ঝাপটা পার হয়ে জর্ডানের এই ভূমিতে এসে পৌঁছেছিলেন এবং ঠিক যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, সেইখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে, সামনের বহুদূর বিস্তৃত জর্ডান নদীর দুই পাশের বিস্তীর্ণ এলাকা, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও লেবানন এই অঞ্চলকেই ইহুদিদের জন্যে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ভূমি বা প্রমিসড ল্যান্ড বলে দেখিয়েছিলেন। এই চার দেশকে প্রাচীনকালে একসাথে সিয়াম দেশও বলা হতো।

প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার প্রধান যুক্তিই ছিল এই যে, ঈশ্বর স্বয়ং বাইবেলে ইহুদিদের নবী মোশির অনুসারীদের কানানদের দেশ (প্যালেস্টাইন) ইসরায়েলিদের বাসভূমি হিসেবে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এটাই সেই প্রমিজড ল্যান্ড। এই অভিন্ন বিবরণ বা একই গল্প তোরাহ্, বাইবেল আর কোরআনে পাওয়া যায়। বাইবেলে খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর আগের এই ভূমিকে কানানদের ভূমি বলে বর্ণনা করা হয়েছে; জর্ডান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল যা সাধারণভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্র, প্যালেস্টাইন ভূমি, লেবানন এবং উপকূলীয় সিরিয়া এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

সার্পেন্টাইল ক্রস

কানানীয়দের কোনো এক পাপের কারণে ঈশ্বর তাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে তাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত করে আব্রাহামের বংশধর ইসরায়েলিদের কানান দেশ উপহার দেন। ঈশ্বর এই ভূমিই মোশিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এটাই তোমাদের পূর্বপুরুষের ভূমি, তোমরা এখানে বসবাস করো, এখানকার অসভ্য জাতিদের হটিয়ে তোমরা তোমাদের হক বুঝে নাও।' কেন যে বেচারা কানানবাসীদের প্রতি ঈশ্বর এত রুষ্ট ছিলেন সেই খোঁজ এখনও আমি করছি। এখানে যারা বাস করত ঈশ্বর তাদের সাথে বনি ইসরায়েলিদের যুদ্ধ করতে বলেছিলেন কিন্তু ইহুদিরা মুসা নবীকে ধোঁকা দিল। দুজন সাহাবি ছাড়া ইহুদিরা কেউ যুদ্ধ করেনি। আল্লাহ ইহুদিদেরকে শাস্তি দিলেন যুদ্ধ না করার জন্যে এবং নবীর সাথে বেয়াদবি করার জন্যে। বললেন, বনি ইসরায়েলীরা এখানে ৪০ বছর ধরে ঘুরবে, কিন্তু বের হতে পারবে না। ইহুদিরা এইখানে ঘুরে ঘুরে মিসর যাওয়ার রাস্তা খুঁজতো কিন্তু দেখতো যে, প্রতিদিন তারা যেখান থেকে শুরু করেছে সেখানেই রয়ে গেছে। পরবর্তীতে আল্লাহ অন্য নবীদের মাধ্যমে ইহুদিদেরকে এখান থেকে বের হবার সুযোগ দেন - এবং সেই সময় থেকে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কাছে এই জায়গা খুবই পবিত্র। ইসলাম ধর্মে হজরত মোহাম্মদ (সা.) নবী হিসেবে মুসা নবীকে নিজের ভাই বলেছেন একারণে মুসলিমদের কাছেও এই জায়গা অত্যন্ত পবিত্র। কিন্তু এসব কাহিনী

দূরান্তরে দেখি স্রষ্টার প্রতিশ্রুত ভূমি

পড়তে পড়তে মনে হয় গ্রিক দেবদেবীদের মতো ঈশ্বরও বুঝি যুদ্ধ ছাড়া একটুও থাকতে পারেন না। তার বান্দাদের মধ্যে যুদ্ধের বীজ বুনে দিয়ে ঈশ্বর কিভাবে নির্বিঘ্নে যে বসে থাকেন সেটা বোঝা বড় মুশকিল! হাজার হাজার বছর আগের এই প্রতিশ্রুত ভূমির ঘটনার বিস্তৃতি আর প্রভাব আজও বিদ্যমান। সহস্র বছর আগের সেই প্রতিশ্রুত ভূমি দখলের চেষ্টায় আজও মুহুর্মূহু গুলি আর বোমার শব্দে এই অঞ্চলে ভোর হচ্ছে। ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল আর ফিলিস্তিনিদের মধ্যে চলছে বছরেরে পর বছর ভয়াবহ যুদ্ধ, ভয়াবহ সব মারণাস্ত্রের আঘাতে প্রতিদিন নিহত হচ্ছে শত শত ফিলিস্তিনি মানুষ। ফিলিস্তিন দেশটা যেন এই দুনিয়ার দুয়োরানী, তাদের দুঃখ কিছুতেই দূর হয় না!

ভূমির লড়াই

আমরা একটা প্রজন্ম সেই যখন জ্ঞান হয়েছে তখন থেকেই দেখে আসছি ইয়াসির আরাফাতের মুখ, নিজের ভূমির অধিকারের জন্য কি লড়াইটাই না করে গেলেন জীবন ভোর। যখন আমরা বেশ ছোট, তখন অপরূপ চেহারার স্বর্গীয় দেবদূত যেন এমন সব ফিলিস্তিনী বাচ্চাদের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে মানে তারা কাঁদছে এমন অনেক ধরনের ভিউকার্ড বা পোস্টার পাওয়া যেত। ওদের দুঃখে সমব্যথী হয়ে আমরা ঘরে সেসব পোস্টার লাগিয়ে রাখতাম। ত্রিশ, চল্লিশ বছর আগে অশ্রুসিক্ত যে বাচ্চাগুলোর কষ্টে সমব্যথী হয়ে তাদের ছবি আমরা ঘরে টাঙিয়ে রাখতাম আজ এত বছর পরেও বংশানুক্রমে তাদের বাচ্চাদের সেই একই ক্রন্দনরত ছবি খবরের কাগজে, টিভিতে,

ফেসবুকে প্রতিদিন ভেসে বেড়াচ্ছে, মানুষ সমব্যথী হয়ে হাজার লক্ষ শেয়ার করছে সেসব ছবি, কান্নার ইমোজি দিচ্ছে, কিন্তু এই সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। ইতিহাস বলে এদেশ সবসময়ই কানান বা ফিলিস্তিনিদের দেশ কিন্ত স্বয়ং ঈশ্বর এবং অসভ্য দুনিয়ার ধর্মীয় ক্ষমতার কুচক্রে নিজ ভূমে তারা আজ পরবাসী, মানচিত্রে ফিলিস্তিন দেশটা প্রায় নেই হয়ে গেছে। নিজ ভূমির লড়াইয়ে তাদের রক্ত ঝরার খবরে আজও প্রতিদিন আমাদের ঘুম ভাঙে! ঈশ্বর কিভাবে তার সন্তানদের এই যুদ্ধে এভাবে ঠেলে দিয়ে নিজে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন কে জানে! বিখ্যাত ফিলিস্তিনি কবি মাহমুদ দারবিশ লিখেছেন কবিতায় জন্মভূমিকে নিয়ে তাঁর বেদনাঃ

‘সুতরাং ছেড়ে যাও আমাদের ভূমি

আমাদের সৈকত আমাদের সমুদ্র

আমাদের গমক্ষেত

আমাদের বুদ্ধির জগৎ

আর হৃদয়ের মর্মমূল।’

জলপাই পাতায় কি শান্তি মেলে!

ফুটে থাকা হলুদ ফুল গাছের সামনে আমি

দিগন্তে স্রষ্টা প্রতিশ্রুত ভূমি

বইয়ে পড়েছি এখানে কোথাও একটা, দুটো ছোট ঝরনা আছে। মুসা নবী এই পাহাড়ে তার অবস্থানের সময় তার হাতের লাঠির আঘাতে পাথর ফেটে ঝরনা তৈরি হয়, যা নাকি এখনও বহমান কিন্তু শীতকাল বলেই হয়তো সেসব কিছু দেখতে পেলাম না। এক পাশে সুন্দর কিছু নাম না জানা ফুলের গাছ দেখা গেল, এত উঁচু পাহাড়েও এমন সুন্দর ফুল ফুটে আছে! আমি দলছুট হয়ে একটু একা একা ঘুরে বেড়াই। হলুদ ফুলে ভরা একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে এক বিদেশিনীকে অনুরোধ করি আমার ছবি তুলে দিতে, হাসিমুখেই তিনি তুলে দিলেন, আবার বললেন, 'দ্যাখো, ঠিক আছে কিনা।'

ছবি দেখে খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানাই তাকে। বসন্তে নিশ্চয়ই আরো ফুলেল হয়ে ওঠে সব গাছপালাগুলো। চারপাশে বেশ কিছু জয়তুন বা জলপাই গাছ দেখতে পাই যার মধ্যে গির্জার সামনে চ্যাপেলের জলপাই গাছটি পোপ ২য় জন পল ২০০০ সালে এখানে লাগিয়েছেন শান্তির প্রতীক হিসেবে। বাইবেলে নূহের সিন্দুকের গল্পে জলপাই পাতার শাখা বহনকারী একটি ঘুঘুর কথা বলা হয়েছে, যা বন্যার শেষ এবং শান্তির একটি নতুন যুগের সূচনার আশা দেখায়, সেই থেকেই জলপাই পাতা শান্তি এবং শুভেচ্ছার সর্বজনীন প্রতীক। তবে বাস্তবেই জলপাই পাতার এমন কিছু গুণ রয়েছে যার সাথে রূপকার্থেই শান্তির বিষয়টা জড়িত। যেমন, জলপাই গাছগুলি তাদের দীর্ঘায়ু এবং স্থিতিস্থাপকতার জন্য পরিচিত এবং তারা কঠোর পরিস্থিতিতেও শত শত বছর ধরে বেঁচে থাকতে পারে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য জলপাই পাতা ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও, জলপাই গাছের গভীর শিকড় মাটিতে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, যা স্থায়ী শান্তি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতীক। যুদ্ধেও শান্তির

প্রতীক হলো জলপাইয়ের পাতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের সাক্ষী হয়ে বিশ্বনেতারা আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক শান্তির আহবান জানিয়ে জাতিসংঘ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করে এবং ১৯৪৭ সালের ৩০ অক্টোবর শান্তির প্রতীক হিসেবে জলপাই গাছের পাতাকে জাতিসংঘের পতাকায় স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু পরিহাস এটাই জলপাই পাতার এই অঞ্চলেই যুগ যুগ ধরে চলছে অশান্তির চরম আগুন।

ভ্রমণং শরণং গচ্ছামি

ঘুরে ঘুরে পুরো জায়গাটায় দেখা হলো বেশ। আমার সঙ্গী সাথীরা ফেরার পথ ধরেছে। ফিরে আসার সময় আবারও কিছুক্ষণ বসি, নিবো পাহাড়ে বসে দুচোখ যতদূর যায় তাকিয়ে দেখি সেই প্রাচীন সিয়াম দেশের পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে সবুজ জর্ডান ভ্যালি– কত শত রাস্তা, জেরিকো, বেথলেহেম, ডেড সি! আহা যদি যেতে পারতাম এইসব পথ ধরে ধরে সেসব প্রাচীনশ্ব প্রাচীন সব জায়গায়, সেই ভূমি, সেই দুধ ও মধুপ্রবাহী দেশ, সেই প্রমিজড ল্যান্ডে, মোজেস যেখানে ঢুকতে পারেননি!

বিস্তীর্ণ ভূমির শেষটা আর খালি চোখে দেখা যায় না, আকাশের সাথে যেন মিলে মিশে গেছে সীমানা, এই দেখার অভিজ্ঞতার সাথে কোনো কিছুর বুঝি তুলনা চলে না, টাইমমেশিনে চড়ে কল্পনার পাখা উড়িয়ে হাজার হাজার বছরের পুরানো সেই সময়ে ফিরে গিয়েছি! মুজতবা আলী তাঁর দেশে বিদেশে বই এ লিখেছেন, ‘আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, ইয়োম্ উস্ সফর্, নিসফ্ উস্ সফর্- অর্থাৎ কি না ‘যাত্রার দিনই অর্ধেক ভ্রমণ।’ বাংলায়ও একই প্রবাদ প্রচলিত আছে, যেখানে বলা হয়েছে, ‘উঠোন সমুদ্র পেরোলেই আধেক মুশকিল আসান।’ আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, যে দিনটাতে আমি এই দেশটাতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেদিনই আসলে আমার এখানে আধেক ভ্রমণ হয়ে গিয়েছিল, একথা নির্দ্বিধায় এখন বলতে পারি! এখানে আসার আগে কোনো ধারণাই ছিল না মুসা নবীর সাথে নিবো পর্বতের কি সম্পর্ক, গল্পগুলোই শুধু বিছিন্নভাবে জানা ছিল। এদেশে এসে জানা হলো যে, সেইসব প্রাচীন গল্পের বুনন হয়েছিল এই মাটিতেই। শতশত মাইল পাড়ি দিয়ে আসা এই ভ্রমণ আজ সার্থক যখন হাজার হাজার বছর পরে এখানে দাঁড়িয়ে এক ক্ষুদ্র মানুষ আমি স্মরণ করছি সেইসব গল্প, মেলানোর চেষ্টা করছি সেইসব গল্পের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ঈশ্বরের সাথে মানুষের, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের যোগসূত্র! হায়! তা কি আর মেলে এত সহজে!

কাশ্মীর ॥ অবিস্মৃত পরিভ্রমণ

গোলাম শফিক

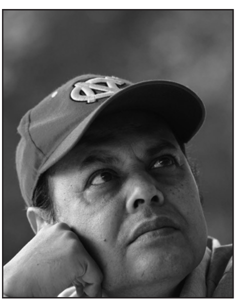

আমি ছিলাম কলকাতা ফেরৎ, তীব্র উষ্ণতা পেরিয়ে দু'জন নারীসঙ্গী নিয়ে হিমশৈলকে মোকাবেলা করতে যাচ্ছিলাম কাশ্মীর। ছেলেবেলা থেকেই এ নামটি টানতো চুম্বকের মতো। কাশ্মীর নামের ট্যালকম পাউডারের কৌটা, কিংবা কেটু (কারাকাম-টু) সিগারেটের প্যাকেটে বরাফাচ্ছাদিত পর্বতচূড়ার ছবি এখনও চোখে জ্বলজ্বল করে। এ ছিল এক স্বপ্ন। কিন্তু যাত্রার প্রারম্ভে স্বপ্নটা একবার ভঙ্গও হয়েছিল। ২৮ মে (২০২৪) প্রভাতে গ্রীষ্মকালীন রাজধানীর শ্রীনগর বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে ড্রাইভার রিয়াজকে সহজে পেয়ে গেলেও আরামটা খুঁজে পেলাম না। ঠাণ্ডার মধ্যে বৃষ্টির জল মাড়িয়ে যেতে যেতে মন খারাপ হয়ে গেল। বউয়ের কথা বাসি হইলে ফলে, কেন যে বারবার হাতড়ে গায়ে লাগিয়েও ভারি জ্যাকেটটি নিয়ে এলাম না! এই যে স্বপ্নভঙ্গের কথা বললাম, সেটির চূড়ান্ত রূপ

দেখেছিলাম নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে। সে গল্প পরে হবে, যার শেষটা দিয়ে যেতে পারব না, এ যে এক জনমে শেষ হওয়ার নয়। হয়তো নাতিদীর্ঘ এক ভূমিকা রেখেই চক্ষু মুদিব একদিন, নাতিপুতি কেউ থাকলে গল্পরথের রশিটি টেনে নিয়ে যাবে আরো সম্মুখে...।

হঠাৎ গাড়ির গতি একটু শ্লথ হলে চালক বলল, এই যে দেখছেন না নদী, এটির নাম ঝিলাম। আর তখনই মনে পড়ল ছেলেবেলায় বারবার শোনা শাহ্‌নাজ রহ্‌মতুল্লাহ্‌র সেই গান:

"ওরে আমার ঝিলাম নদীর পানি

দিনে রাতে যাও বলে কার

দুঃখের কথাখানি।"

আবদুল হাই মাশরেকীর কথার এই গানে ধীর আলী মিয়া সুর করেছিলেন যা' ১৯৬৪ সালে বেতারে গ্রামোফোন রেকর্ডকৃত। এটি নাকি শাহ্‌নাজেরও ছিল প্রথম ধারণকৃত গান। বুঝলাম স্মৃতির তাড়া খেয়ে হতবুদ্ধি হওয়ার জন্য বয়সের এ ভাটির লগ্নে এইখানে এসেছি।

পথে পড়েছিল রয়েল জমিনদার কেসার মেহাল, যা ছিল জাফরান দ্রব্যাদির এক বনেদি দোকান। কে না জানে যে, কাশ্মীর হচ্ছে জাফরানের জন্য জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু আজ আমরা ঐখানে নামিনি, প্রকৃতির সৌন্দর্য দর্শনেই বুঁদ হয়ে রইলাম। দেখতে লাগলাম উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় জমে থাকা বরফের সৌন্দর্য, কোথাও মেঘের দাপাদাপি কিংবা অভিমানে চুপ হয়ে বসে থাকা। তিন টুকরো কাশ্মীরের একটি হচ্ছে কাশ্মীর ভ্যালি বা উপত্যকা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য যেটি নাম ধারণ করেছিল 'পৃথিবীর স্বর্গ', অন্যটি আজাদ কাশ্মীর যা' পাকিস্তানের অংশ, আর আকসাই চীন নামের কিছুটা চলে গিয়েছিল চীনে। আমরা আছি এই স্বর্গভূমিতেই।

হোটেল লিদ্রু হাইট্‌স-এ গিয়ে মনে হলো হিমালয়ের পাদদেশে চলে এসেছি এক মায়াবী আশ্রয়ে। কক্ষ থেকে দৃশ্যমান এইসব শ্বেত শিরস্ত্রাণ পরিহিত পাহাড়কে খুব কাছেই মনে হয়। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টির ঝাপটায় এই মায়াতে মিশ্রিত হয় দুঃখ কিংবা কষ্ট। তাহলে কি মন খুলে, প্রাণ উজাড় করে, কিংবা হৃদয় রাঙিয়ে কাশ্মীর দর্শন হবে না? আজ যেখানে থাকবার কথা ছিল ১৩-১৪ ডিগ্রি তাপমাত্রা, সেখানে কেমন করে সই ৪-৫ ডিগ্রির ধকল? হোটেল কক্ষের ঠিক সামনেই বিশাল লিদ্রু (Lidroo) পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন হওয়ার আনন্দেই বিষাদিত হচ্ছি। স্ত্রী ইসরাত জাহান ও বৈবাহিকা মাজেদা খানের মনের অবস্থা যে তথৈবচ তা আর বলতে। জানলার কাচ গলিয়ে দেখতে পাচ্ছি ঝুল-বারান্দাগুলো, কিন্তু সেখানে বসে বাদাম চিবোনো বা জাফরানি চায়ের ঘ্রাণ, কাওয়ার স্বাদ নেওয়ার ফুরসত নেই, বৃষ্টিতে ভিজে উশারাগুলো হয়েছে নাকাল। কিন্তু বিষাদকে বিনোদনে রূপ দিতে হবে যে। তাই চটজলদি বের হয়ে যাই পাহালগামের সৌন্দর্য অবলোকনে।

পাহালগামের পয়গাম

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের মূল আকর্ষণটি লুকিয়ে আছে পাহালগামের গর্ভে। কিন্তু এর নামের ব্যুৎপত্তির সাথে স্বর্গের ধারণাটি যায় কি যায় না, এ নিয়ে ধন্দে পড়তে হয়। উর্দু উচ্চারণের পাহলগামই মুখে মুখে ফেরে 'পাহালগাম' কিংবা 'পেহেলগাম' হিসেবে। দুটি কাশ্মীরি শব্দ 'পুহেল' (মেষপালক) ও 'গোয়াম' (গ্রাম) একত্রে মিলে সময়ের পরিক্রমায় হয়ে যায় 'পাহালগাম', যার অর্থ মেষপালকের গ্রাম। আমরা যতোই অগ্রসর হচ্ছি ততোই নিরাভরণ প্রকৃতি আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। দেখতে পাই উঁচু উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা অগণন ঝরনার অনিন্দ্য সৌন্দর্য, শুনছি তাদের কুলুকুলু ধ্বনি। পাহালগামের পুরো অবয়ব জুড়েই রবি ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার প্রতিফলন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মনও ভালো হয়ে গেল কতিপয় পঙক্তি স্মরণ করেই, "জাগিয়া উঠেছে প্রাণ/ওরে উথলি উঠেছে বারি, ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।" ঠিকই তো, ভ্রমণে এসে আবেগ উথলে না উঠলে সবই যে মাঠে মারা যায়।

এ তো হলো কাব্যিক ভাবোচ্ছ্বাস, বাস্তবে কি দেখলাম? বাস্তবেও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের অবিকল প্রতিফলনই দেখেছি। লিদার (Lidder) নদীর শাখা-প্রশাখাগুলো অগণন পাহাড়-পর্বতের ঝরনার জল যেভাবে পাথরের বুকে ঘষে ঘষে ফেনা তুলে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার তুলনা কী? তুলনা একটাই, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ':

"থরথর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।"

এখানে দেখতে পাচ্ছি পাহাড়-নদী, ঝরনা, মেঘ-বৃষ্টি, বৃক্ষ, পাখি, গবাদিপশু ও মানুষের এক বিশাল হাট। পাহালগামকে যেমন বলা হয় মেষপালক বা রাখালদের গ্রাম, তেমনি এটিকে 'সহিসদের গ্রাম' বললেও ভুল হতো না। এতো উঁচু সব পাহাড় যা' থেকে দীর্ঘ পথ নিচে নেমে এসেছে সেসব পথেই সহিসরা পর্যটকদের নিয়ে উঠানামা করছে, কিংবা কিঞ্চিৎ সমতল পথের বিভিন্ন গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছে। একটা পর্যায়ে এসে যান্ত্রিক যান অক্ষম হয়ে পড়ে, তখন আবেগী মনের ভ্রমণতৃষ্ণা মেটাতে অশ্বারূঢ় না হয়ে উপায় থাকে না। এইভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে অসংখ্য কাশ্মীরি। আজও দেখলাম বাতাসের ঝাপটায় আধভেজা হয়ে এইসব ঘোড়ার মালিক কিংবা রাখাল একটা লম্বা আচকান পরে, ঘোড়াটি ভাড়া খাটাতে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। কর্দমাক্ত বন্ধুর পথে অনভ্যস্ত পর্যটকরা রোমাঞ্চের তলানীতে গিয়ে, কিংবা ভীতির কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও তাদের ক্লান্তি নেই। দেখলাম যে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে নিদারুণ দারিদ্র্য।

পাহালগামের আইল্যান্ড পার্কে বিদায়ী টিউলিপের সাথে শেষ সাক্ষাৎ

পাহালগামকে যে 'রাখালদের গ্রাম' বলা হতো তার একটি আদিসূত্র রয়েছে। এক সময় ছাগল-ভেড়া চরানো ছিল মূল বান্দাদের আদি পেশা। তখন পাহাড়ি এই দরিদ্র মুসলিম সম্প্রদায় 'গুজার' নামে পরিচিত ছিল। তারা বিভিন্ন মালিকের কাছ থেকে ভেড়া-ছাগল নিয়ে পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে পাহাড়ে-উপত্যকায় চরিয়ে বেড়াত। শীতের শুরুতে আবার মালিকদের কাছে ফেরৎ দিয়ে তারা চলে যেতো। এটি ছিল বহু তৃণক্ষেত্র ও চারণভূমিতে সহজে গমনের প্রবেশপথ।

'পাহালগাম' নামের এ উপত্যকা-শহরটি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অনন্তনাগ জেলায় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাশ্মীরি ভাষায় 'নাগ' মানে ঝরনা। একসাথে 'অনন্তনাগ' অর্থ অসংখ্য ঝরনা। আমাদের ভ্রমণের সময় যেসব পর্যটন-স্থানের নাম বারবার কানে এসেছে সেগুলো মিনি সুইজারল্যান্ড খ্যাত বাইসারান, বেতাব ভ্যালি, আরু ভ্যালি, চন্দনওয়ারি, কোলাহোই হিমবাহ ইত্যাদি।

হিন্দু পুরাণানুযায়ী পাহালগামকে বলা হতো 'বেইল গাঁও' (Bail Gaon), যার অর্থ 'ষাঁড়ের গাঁও'। কথিত আছে, দেবতা শিব অমরনাথ গুহায় প্রবেশ করার পূর্বে তাঁর

বাহন, ষাঁড় নন্দিকে এখানে রেখে গিয়েছিলেন। তাই অমরনাথ গুহা একটি হিন্দু তীর্থ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আমরা পাহালগামে যাওয়া-আসার পথে যে 'Yatra' বা যাত্রা বেসক্যাম্পটির অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলাম, সেটি অমরনাথে গমনের প্রস্তুতির জন্য নির্মিত স্থাপনা, এভারেস্ট বেসক্যাম্পের মতোই।

আমরনাথ গুহা একটি শৈব তীর্থ। এই গুহাটি সমতল থেকে প্রায় ১৩,০০০ ফুট উপরে বলে এটিতে গমনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। গুহাটি পাহাড়ঘেরা, যেসব পাহাড় বছরের দীর্ঘ সময়ব্যাপী শ্বেত তুষারে আবৃত থাকে, এমন কি গুহার প্রবেশপথও বরফে ঢাকা থাকে। গ্রীষ্মকালে খুব স্বল্প সময়ের জন্য এই দ্বার প্রবেশের উপযোগী হয়। তখন লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী অমরনাথের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন।

'বেদনা মধুর হয়ে যায়' ভাবতে পারলেও বৃষ্টি তো থামে না। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই তিনজন একটি মাত্র ছাতা সঙ্গী করে সেঁধিয়ে যাই আইল্যান্ড পার্কে। সেখানে টিউলিপ ফুল দেখে কাশ্মীরে টিউলিপ উৎসবের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার দুঃখ ভুলে থাকি। একটি বেঞ্চে কিছুক্ষণ বসে থাকি যার পেছনেই কুলুকুলু ধ্বনিতে বয়ে চলেছে লিদার নদী। বাণিজ্যিক ফটোগ্রাফাররা ঐখান থেকে অবশেষে আমাদের উঠিয়ে নিয়েই ছাড়ল। উদ্যানের মাঝখানে আমাদের কাশ্মীরি পোশাক পরিয়ে নানা নির্দেশনা জারি করা হলো। ষাটোর্ধ বয়সে শিখলাম কী ভাবে বধূকে জড়িয়ে ধরে আকাশের দিকে উদাস ভঙ্গিতে তাকাতে হয়। আহা, জীবন তা'হলে ফুরিয়ে যায়নি! তাদের এ কসরত দেখে কিছুই মনে করিনি, কারণ Every point was a learning point!

কিন্তু অকস্মাৎই তাল সামলাতে না পেরে মাজেদা আপা পিচ্ছিল মাটিতে ধপাস করে পড়ে যান। একটি হাতে শুরু হয় তীব্র ব্যথা। বুদ্ধিমান চালক রিয়াজ আশপাশেই ছিল, বলল– আরে এখানে তো একটি হাসপাতাল আছে। সে যা-ই হোক, দু'জন নারীর এক সফরসঙ্গীর মনের অবস্থা কেমন, সে প্রশ্নটি করার জন্য তখন কেউই ঐখানে ছিল না। এটি নিছক দুর্ঘটনা হলেও একটি ঈষৎ অপরাধবোধ জেগে উঠল। হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আঘাতপ্রাপ্ত হাতটিতে টানা দিয়ে কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। হোটেলে ফেরার পথে আবার তুমুল বৃষ্টি, ঝরনাধারা, ঘোড়া ও ভেড়ার পাল, খেটে খাওয়া মানুষদের মুখশ্রী দর্শনের সুযোগ পেলাম।

সন্ধ্যার পর তো তাপমাত্রার নিম্নগমন আর ধরেই রাখা যায় না। তীব্র বৃষ্টির কারণে দূরের বিচ্ছিন্ন খাবার ঘরে যেতে মহিলারা অপারগতা প্রকাশ করলেন। অগত্যা কক্ষেই সরবরাহ করা হলো নৈশ খাবার, একেবারেই ভারতীয় প্রথাগত, রুটি-অন্নের সাথে মুরগি, পনির, ডাল ইত্যাদি। বেডহিটার না থাকলে এই রাতে যে কী হতো! কিন্তু রাতে তো দীর্ঘ সময় কাশ্মীরে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎও থাকে না, ওরা যে এতোটা ঘাটতিতে আছে জানা ছিল না। তবুও বৃষ্টি ও বাতাসের ঝাপটার শব্দে ঘুমের ঘোরে তলিয়ে গেলাম।

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠেও দেখতে পেলাম আমাদের কক্ষের পেছনের পাহাড়টিতে চলছে ধুঁয়াসদৃশ মেঘ, বিষ্টি ও বাতাসের সম্মিলিত পাগলামি! এটাই এখানকার প্রকৃতি।

হোটেলের সব লেঠা চুকিয়ে আবার যেতে হয়েছিল হাসপাতালে। গতকাল বলা হয়েছিল পাহালগাম ত্যাগ করার আগে অবশ্যই এক্সরে করিয়ে যাবেন। যথারীতি আমাদের পথপ্রদর্শক রিয়াজের নির্দেশনায় হাসপাতালে ঢুকে আমার স্ত্রী মাজেদা খানকে নিয়ে ডাক্তারের অপেক্ষায় বসে রইল। আমি কুহকি বৃষ্টির আবহে যান অভ্যন্তরে বসে রোজনামচায় লিখতে লাগলাম কলকাতার অবশিষ্ট গল্প। কিন্তু সামনের এক চিলতে আসনে বসে পাহাড়ি রাস্তার কাত হওয়া গাড়িতে হাঁটুর উপর রেখে কাহাতক লেখা যায়? তাই আমার নোটগুলো হয়ে গেল কাজলরেখা উপাখ্যানের নকল রানীর আঁকা আলপনার মতো 'কাওয়ার ঠ্যাং, বগার পারা'।

মহিলারা সাথে থাকায় সরস্বতীর পাশে ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্মীকেও পেয়ে যাই। কারণ তারা কমবেশি কেনাকাটা করেন। প্রথম দিন পাহালগামে ঢুকবার পথে একটি জাঁকজমকপূর্ণ কাশ্মীরি বেকারি থেকে স্থানীয় গন্ধযুক্ত বড়ো আকৃতির বিস্কুট ও অন্যান্য বেকারিফুড কেনা হয়েছিল। শ্রীনগরে ফিরবার পথে বিশাল আকৃতির কাশ্মীরি রুটি দেখে বৃষ্টির মধ্যেই আমরা এগুলো সংগ্রহ করতে নেমে যাই। লোকজন তেলে ভাজা এই রুটি ভাগ করে হলদে হালুয়া দিয়ে খায়। আমরা কেনার পর ভাগ করে দিতে বললে দোকানি কেটে পাল্লায় মেপে ৪টি ভাগ করেন। বড়ো সহি তাদের রীতিনীতি। নামকিন ও নাদরু নামের ভাজা খাবারগুলো ঠাণ্ডা হয়ে ভীষণ শক্ত অবস্থায় আছে দেখতে পেলাম। কাস্টমার চাইলে নাকি এরা আবার তেলে ভেজে গরম করে দেবে। হাইজিন ফ্যাক্টর এদের কাছে বড়ো বিষয় নয়। অবশেষে জাফরানের আকর্ষণে ঢোকা হলো প্রথম দেখা সেই বিপনীটিতে। তখনাবধি বৃষ্টিই আমাদের মতো হাজার পর্যটকের সহচর হয়ে রইল। প্রারম্ভেই ওরা জাফরানের চা দিয়ে গ্রাহকদের আপ্যায়ন করে। সেসব পিয়ে ঐখান থেকে খরিদ করা হয় মিশ্র-বাদাম, ব্ল্যাক বেরি, জাফরানের ছোট কৌটা ইত্যাদি। জাফরান অতিশয় মূল্যবান এক পণ্য, যেটির এক কিলোগ্রামের দাম ৩,০০,০০০ রুপি। তবে সময় ও স্থান বিশেষে এর মূল্য হাঁকা শুরু হতে পারে ৮ লক্ষ রুপি থেকে।

জাফরানকে কাশ্মীরিরা বলে কেসার, আসলে এটি ফুলের কেশরের মতো। এক কেজি জাফরান উৎপাদনে দু'টি ফুটবল মাঠের সম পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন হয়। চারা লাগিয়ে ফুল দেখতে ৪ বছর অপেক্ষা করতে হয়। পার্পল কালারের প্রতিটি ফুলে জাফরান থাকে মাত্র ৩টি। দক্ষ কর্মীদের দ্বারা এক কেজি জাফরান সংগ্রহ করতে সাধারণত ৪০ ঘণ্টা সময় লাগে। মশলাটির এই মূল্য মানের জন্য এটিকে বলা হয় 'রেড গোল্ড'। কিছুদিন আগেও নাকি ১ আউন্স স্বর্ণের চেয়ে সম পরিমাণ জাফরানের মূল্য বেশি ছিল। কাশ্মীরিরা এক সক্ষম জাতি যারা বহুমুখী ভেষজ গুণসম্পন্ন এই

গুলমার্গে ঝুঁকিপূর্ণ রাইডের পর ফিরতিপথে বিশ্রাম

পণ্যটিকে ব্র্যান্ডিং করতে সক্ষম হয়েছে। অবশেষে জাফরানের আবেশে আমাদের শ্রীনগর প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় হয়ে রইল।

সোনমার্গের নৈরাশ্য ও হজরতবাল মসজিদ

যে আবাসটিতে আমাদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই হয়েছে, সেটি কলকাতা থেকে ঠিক করে দিয়েছিল কাশ্মীরি যুবক আসিফ। মারকুইস স্ট্রিটে তার একটি কাশ্মীরি শালের দোকান আছে, যেখানে প্রতিদিন আমাদের আড্ডা হতো, আর পান করা হতো তীব্র চিনিযুক্ত কাশ্মীরি চা। বেনিয়ার জাত আসিফ এই ব্যবসার পাশাপাশি পর্যটন ব্যবসার সাথেও জড়িত। অনর্গল ও শুদ্ধ বাংলা বলায় সক্ষম আসিফের সাথে আমাদের একটি

সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। তাই শ্রীনগর এসেও আমরা তাদের বস্ত্রালয়ে গমন করি এবং তার পিতা ও চাচার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। এক পর্যায়ে তার ছোটবোন বাসায় প্রস্তুতকৃত কাশ্মীরি চা নিয়ে আসে আমাদের আপ্যায়ন করাতে।

'নোভেলা রেসিডেন্সি' নামের এই হোটেলেই ঘুম থেকে উঠে ৩০ এপ্রিল তাপমাত্রা পরখ করে দেখি ৬ ডিগ্রি। তখনই ধরে নিয়েছিলাম আজ হয়তো আমাদের 'খবর' আছে। এপ্রিল-মে মাসে সোনমার্গ তার রূপের ডালি উজার করে দেয় কথিত থাকলেও আমাদেরকে দেখাতে পারে রক্তচক্ষু, এ রকম একটা আশংকা দানা বেঁধে উঠল। সোনমার্গের একটি আক্ষরিক অর্থ আছে যা 'সোনালি উপত্যকা'। এটি জম্মু ও কাশ্মীরের গান্দারবাল জেলার অন্তর্ভুক্ত এক প্রাকৃতিক পর্যটন-ভুবন, যা রাজধানী শহর থেকে ৮০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটি তো প্রাচীন রেশমপথের প্রবেশদ্বার হিসেবেও গুরুত্ব লাভ করেছিল, যা কাশ্মীরকে সংযুক্ত করেছিল তিব্বতের সাথে। এই পর্যটন আধারটি মূলত উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বর্গরাজ্য, যারা বিভিন্ন রাইডের মাধ্যমে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জন করে ঘরে ফেরে। মূলত সোনমার্গ বিখ্যাত হয়ে আছে বিভিন্ন হ্রদের জন্য, যে কারণে শৌখিন ও পেশাদার মৎস্য শিকারীদের এটি এক অনিবার্য গন্তব্য। তবে প্রধানত দু'টি মাছেরই সন্ধান পেয়েছি: Snow trout (তুষারকণ্ঠী বা তুষারের মতো গলা) এবং Brown trout (বাদামি গলা)। হাইকারদেরও সোনমার্গ এক চারণভূমি। আর ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধে এ এলাকা এক কৌশলগত পয়েন্ট হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা কেন যাচ্ছি? শুধুই দেখতে। পারলে পারব, না পারলে নাই।

কাশ্মীরে যারা আসে তারা প্রধানত বরফ দেখতেই আগমন করে। পুরো সোনমার্গ এলাকাই শীতকালে বরফে আবৃত থাকে। দুনিয়াব্যাপী বরফের সেই কী আকর্ষণ! কখনো তুষার হিসেবে সে পতিত হয় পেঁজা তুলার মতো, কখনো ঝড়োবৃষ্টিতে তুষারকণা পর্বতারোহী ও মেরুচারীদের চোখের পাতাগুলো বুড়িয়ে দেয়, আবার জমাট বেঁধে থাকে শত মাইলব্যাপী, কখনো কখনো হিমবাহ হয়ে গড়িয়ে যায় দূর কোনো গন্তব্যে। এই হিমবাহ বরফের স্তূপ বা নদী। বরফ আবার পাথরের টুকরোর মতো শিলাবৃষ্টি হয়েও ঝরে পড়ে। বরফের এই বহু রূপই আমাদের চর্মচক্ষুতে বিস্ময় সৃষ্টি করে রেখেছে সুদূর অতীত থেকে।

আমাদের যাত্রপথের পুরোটা জুড়েই আমরা দেখতে পাই সিন্ধ নদীর রূপ। এই নদী খরস্রোতা, কোথাও কোথাও গর্জনশীল। কাশ্মীরের মৎস্যশিকারীরা কখনো নিস্তরঙ্গ নদী আশা করে না, ক্ষীপ্রগতির নদীতেই তারা মাছ ধরে উত্তেজনা অনুভব করে। আমরাও দীর্ঘপথ পেরিয়ে জড়তা কাটাতে চা পান করতে নেমে নদীর এই খরস্রোত দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ি। এইখানে বাণিজ্যিক ভিডিওগ্রাফাররা দর্শনার্থীদের ভিডিও করে মেমোরি কার্ডে দিয়ে দিচ্ছে। তার সাথে জুড়ে দিচ্ছে মারদাঙ্গা হিন্দি ছবির

গান। কাপল বা প্রেমিক-যুগলকে পাকড়াও করার জন্য তাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। সিন্ধ নদীর পাড়ের পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ও সেতুতে গিয়ে অন্যের সাহায্য নিয়ে আমরা স্মৃতি ধারণ করেছি। জানতে পারলাম এ গ্রামটির নাম থুন (Thune) যা' কানগান (Kangan) তহসিলের অন্তর্ভুক্ত। গ্রামের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে যে সিন্ধ নদী, সেটির উৎপত্তি পশ্চিম তিব্বতের কৈলাশ পর্বত থেকে, যা ভারত-পাকিস্তান উভয় অংশেই প্রবাহিত। ঝিলাম নদীরও একই অবয়ব ও চরিত্র, যে গুলোকে আমরা বলি 'অভিন্ন নদী'। থুন কানগানের চাদরের যে দোকানটিতে আমরা ঢুকেছিলাম তার মালিক শাকিল। সে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের ভক্ত, আমার কাছে শাকিল বাংলাদেশী সকল ক্রিকেটারের নাম অনর্গল বলে গেল। এখানে অবস্থানকালেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম সোনমার্গের রাস্তা হয়তো বন্ধ আছে।

আবার অনেক দূর যান চালিয়ে একটি পয়েন্টে থামতেই হলো। সোনমার্গের রাস্তা সত্যিই বন্ধ। সব গাড়ি ফেরৎ আসছে। একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে আমাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি খুব বিনীতভাবে বললেন– দুঃখিত স্যার, পাহাড়ের বরফধসের কারণে বিরাট বিপর্যয় দেখা দেওয়ায় সোনমার্গের প্রবেশপথ গতকাল থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, দেখুন আপনার মতো হাজার পর্যটক ঘুরে বেড়াচ্ছেন যাদের কেউ কেউ গতকালও এসেছিলেন, আজ হয়তো যেতে পারবেন এই প্রত্যাশায় আবারও এলেন। আমার আর কিছু বলার রইলো না। প্রথম অনুধাবনে এলো 'প্রয়োজনীয় মন্দ যন্ত্র' মোবাইল ফোন কী ভাবে আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। সফরসঙ্গিনী বলল, কী আর করা, চলোনা যাই দূরের সেতুটির উপর, ঐপাড়ের পাহাড়টি তো একেবারেই খাড়া, ঐখানে গিয়ে ছবি তুলব। আসিফও ইতোমধ্যে ফোন করে জানিয়ে দেয় গতকালের বরফধসে কয়েকটি গাড়ি চাপা পড়েছিল, তাতে নাকি প্রাণহানিও ঘটেছে।

দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে আমরা যখন থেকে সেতু পেরোনোর কসরত শুরু করি তখন থেকে মেঘও জমাট বাঁধতে থাকে। তিনজনের একটি মাত্র ছাতা, তাও ছোট, কিন্তু নিদানের সহায়। সেতুর উপর উঠতেই মেঘলা আকাশ বৃষ্টি নামিয়ে দিলো, আর নামালো হিম বায়ু। নেসেসারি এভিল (মুঠোফোন) তো আর প্রাকৃতিক ডেভিলের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারে না, তাই কিছু ছবি ধারণ করেই রণে ভঙ্গ দিয়ে দৌড়ে উঠে আসতে হলো পাকা রাস্তায়। তখন ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগার অবস্থা। একজনকে বলি, ভাই দেখুন তো তাপমাত্রাটা কতো? তিনি বললেন, অ্যাকজাক্টলি জিরো ডিগ্রি। তীব্র ঠাণ্ডা বাতাসের কারণে এখানে আর টেকা যায়নি। ফিরতে ফিরতে রিয়াজকে বলি, এখন কী করব ভাইয়া, কোথায় গিয়ে সময় কাটিয়ে বেলাটা ডুবিয়ে দিয়ে আসতে পারব? সে বলল, হজরতবাল মসজিদ। তবে তা-ই হোক।

হজরতবাল মসজিদের নাম আমার পূর্বপরিচিত। এলাকাবাসী বলে দরগাহ্। উর্দু ও হিন্দি শব্দের সংমিশ্রণে 'হজরতবাল' শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ হজরতের চুল। কথিত আছে, হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর কোনো সাহাবি কর্তৃক আনীত তাঁর চুল বা দাড়ি ঐখানে সংরক্ষিত হচ্ছে। তবে এর ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে নিরবতাই লক্ষ্য করা যায়। অন্য একটি সূত্র ধারণা দিচ্ছে, এখানে অতীতে যে নিদর্শনটি সংরক্ষিত ছিল যা' মদিনা থেকে কাশ্মীর নিয়ে এসেছিলেন হজরতের কথিত বংশধর সৈয়দ আবদুল্লাহ্ মাদানি। অতঃপর এটিকে ঘিরে এখানে একটি দরগাহ্ প্রতিষ্ঠা করেন খাজা নূরুদ্দিন এশাইয়ের কন্যা এবং এটির রক্ষক ইনায়েত বেগম। মুঘল সম্রাট শাহ্জাহানের শাসনামলে সুবেদার সাদিক খান দরগার প্রথম ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন। ৪০০ বছরের পরিক্রমায় এটি এখন মুসলমানদের এক পবিত্র তীর্থের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এ ধরনের ধর্মীয় স্থাপনায় পান থেকে চুন খসলেই তীব্র উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে, যেটি ঘটেছিল ১৯৬৩ সালে। 'মোই-ই-মুক্কাদাস' নামের এ নিদর্শনটি নিখোঁজ হয়ে গেলে সারা ভারতেই ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এর তীব্রতা অনুধাবনে সক্ষম ছিলেন বলে জম্মু ও কাশ্মীরে একটি তদন্ত দল পাঠিয়ে তা উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। কাশ্মীরি সুফিসাধক সাইয়্যেদ মীরক শাহ কাশানি কর্তৃক শনাক্তকরণের পর উদ্ধারকৃত এ নিদর্শনটি ১৯৬৪ সালে পুনঃস্থাপন করা হয়।

গ্রামের নির্জন পথ দিয়ে অনেক দূরত্ব অতিক্রম করে এক দৃষ্টিনন্দন মসজিদের সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। এ চত্বরেও অন্যান্য মাজারের মতো প্রচুর জালালি কইতরের উপস্থিতি লক্ষ্য করি। এখানে শুধু পুরুষ দর্শনার্থীরা প্রবেশের সুযোগ পান, যদিও মূলদ্বার– রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে একজন মহিলাকেই পেলাম। অবশ্য দর্শনার্থীদের পাদুকা ও অন্য মালামাল পাহারা দেওয়াও তার অন্যতম দায়িত্ব। স্থূলকায়া এ নারীকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, হজরত কি বাল কিধারসে? আমার হিন্দি কতোটা সহি হয়েছে জানি না, তবে তিনি ঠিকই জবাব দিলেন, 'আন্দারমে'। আমি বললাম, ঠিক আছে বহিন, অন্দর মহলে তুমি এটি আমাকে দেখানোর ব্যবস্থা করে দাও। তিনি জবাব দিলেন– না ভাই, হজরতের চুল তো বছরে কেবল ১০ দিন দেখানোর সুযোগ আছে। এটি বলে তিনি একে একে দিনগুলোর উল্লেখ করলেন– রবিউল আউয়ালের সময় ৪ দিন, মেরাজের সময় ২ দিন এবং ৪ খলিফাকে স্মরণ করে নির্দিষ্ট ৪ দিন। হজরতের কেশ বা শ্মশ্রু প্রদর্শনের সময় নাকি তীব্র ভিড় লেগে যায়। মসজিদের ভেতর ছবি তোলা যাবে কিনা এ কথা জানতে চাইলে বললেন– বাহারমে তোলো। পরিশেষে আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি যা' বললেন তার অর্থ– একটা তোলো, তবে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, তুলতে হবে অলক্ষ্যে। এ জন্য আমি ভেতরে প্রবেশ করে একটা ছবিই তুললাম। এই বিধিনিষেধের মধ্যে স্মিতহাসির এ মহিলাকে একজন সাহায্যকারিণী হিসেবেই পেয়েছিলাম। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

মসজিদ পরিদর্শন করে বাইরে এসে ডাল হ্রদের বৈকালিক রূপ দেখে বিমোহিত হয়ে গেলাম। প্রচুর স্থানীয় ও বিদেশী এখানে বেড়াতে এসেছেন। অস্তগামী সূর্যের আভা এক মায়ার জাল বিস্তার করে রেখেছে। এরই মধ্যে 'শিকারা রাইড' বলে খ্যাত ছোট ছোট নৌকায় চড়ে বেড়াচ্ছে হাজার পর্যটক। মসজিদের পাশের শপিং মলে ঘুরতে ঘুরতে অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল পালাকার নাট্যদলের প্রাক্তনী ইয়া হাবিব সম্রাটের সাথে, যাকে নিয়ে থিয়েটারে একত্রে কাজ করেছি। তারই ইচ্ছায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা পান করে তার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দরগাহ্ এবং ডাল লেককেও মনে মনে বিদায় জানালাম। কিছুদূর আসতেই চালক বলল– ঐ যে দেখা যায় হরি পর্বত, মুঘল আমলে এটির উপর একটি কয়েদখানা ছিল। তাকিয়ে দেখলাম অনেক উঁচুতে উড়ছে ভারতের উজ্জ্বল পতাকাটি। এ যেন বাতাসে দোল খেয়ে নড়ে নড়ে আমাদের বিদায় জানাচ্ছে।

গুলমার্গ: ভিন্ন কায়দায় দিগ্বিজয়

তিনদিনের আবাসিক জীবনেই নোভেলাতে আমার অনেক স্মৃতি জমে উঠল। সকাল ও সন্ধ্যায় আহারের সময় হয়ে এলেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অতিথিরা এসে ভিড় করতে থাকেন। তাদের কলকাকলীতে মুখর হয়ে ওঠে পুরো হোটেল-লবি। তখন আমার দিনলিপি কিংবা রাতলিপি লেখায় কিছুটা ছেদ পড়ে যেতো। আমি সোফায় বসে হাঁটুতে ডায়েরি স্থাপন করে একনিষ্ঠভাবে লিখে রাখতাম প্রতিদিনকার ঘটনা। একদিন ম্যানেজার ইরফান বলল– স্যার, আপনার এতো কষ্ট করে লেখার দরকার কী, আপনি ডাইনিং হল খালি থাকা অবস্থায় এর টেবিলগুলো ব্যবহার করবেন। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পর মুহূর্ত থেকে তা-ই করতে লাগলাম। আজ এ হোটেল থেকেই বিদায় নেওয়ার আগে প্রাতঃরাশ সারবার সময় মনে পড়ল গত মধ্যরাত অবধি এই টেবিলেই বসে লেখালেখির কথা। আজ ০২ মে। নাস্তার টেবিলে এলো চিনা-কাউনের মতো এক অদ্ভুত খাবার। পরিবেশনকারী ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম এটির নাম কী হে? সে বলল 'দলিয়া'।

যে গুলমার্গের দিকে এখন আমরা ধাবমান হয়েছি সেটি শ্রীনগর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটারের এক গন্তব্য, যেটি জম্মু ও কাশ্মীরের বরমুল্লা জেলার অন্তর্গত। এটিও পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের পির পানজাল পার্বত্য এলাকা। যেতে যেতে চালক বলল, গুলমার্গ শহরের উচ্চতা যা-ই হোক, চূড়াটিতে উঠতে আমাদের ১২ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গুলমার্গের উচ্চতা ২৬৫০ মিটার (৮৬৯৪ ফুট)। যে দুটো মার্গে আমরা গিয়েছি, কাশ্মীরে এ রকম যে আরো কতো 'মার্গ' রয়েছে– তাংমার্গ, খিলানমার্গ, ইউমার্গ, নাগমার্ক ইত্যাদি। গুলমার্গ দুটি ফারসি শব্দের একত্র মিলন– 'গুল' অর্থ ফুল, 'মার্গ' মানে 'তৃণভূমি'। একত্রে বলা চলে 'পুষ্পভূমি'।

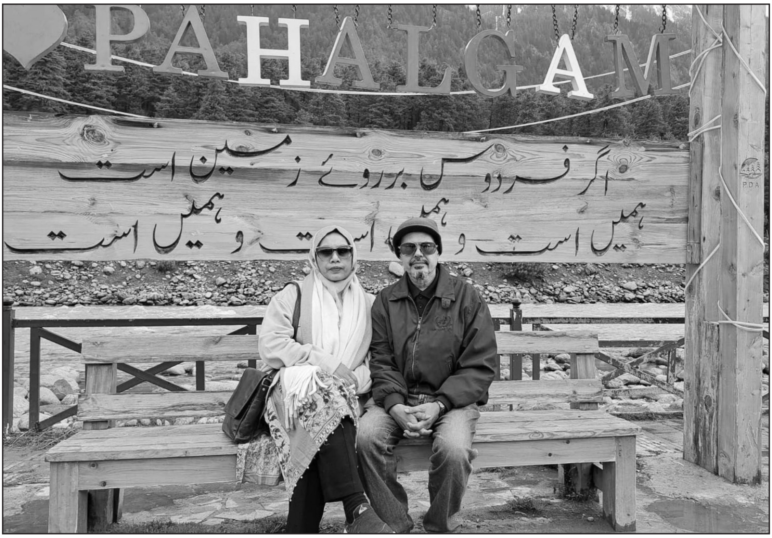

পেহেলগামে লিদার নদীর সামনে, কাশ্মীরি লিপির প্রচ্ছদপটে

ইউসুফ শাহ্ চাক, যিনি ১৫৭৯ থেকে ১৫৮৬ সাল পর্যন্ত কাশ্মীর শাসন করেছিলেন, তিনিই ছিলেন কাশ্মীরের শেষ স্বাধীন শাসক। তিনি এ অঞ্চলের পূর্বতন নাম 'গৌরীমার্গ' পরিবর্তন করে রেখেছিলেন গুলমার্গ। আগের নামটি ছিল দেবতা শিবের স্ত্রী গৌরীর নামে। কথিত আছে, ইউসুফ শাহ্ তাঁর প্রেমিকা ও কবি হাব্বা খাতুকে নিয়ে এখানে বিচরণ করতেন। পরবর্তী সময়ে মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক ইউসুফ শাহ্ গ্রেফতার হলে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ইউসুফের জীবন কাটে বিহার জেলে আর হাব্বা খাতুন বাকি জীবন পাহাড়ে-উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে হয়ে যান এক তপস্বী কবি। আর তাঁর গানের জন্য পরিচিত হয়ে উঠেন 'কাশ্মীরের নাইটিঙ্গেল' হিসেবে। এখন তাদের প্রেমের কথা লিখতে গিয়ে স্মৃতিকাতর হয়ে ভাবছি কাশ্মীরের সাথে নিজের প্রেমের সম্পর্কটি স্থাপিত হয়েছিল পাঁচ বছর আগে (২০১৯) যখন 'হাব্বা খাতুন' নামে একটি কবিতা লিখেছিলাম, যার কিয়দংশ উদ্ধৃত না করে পারছি না:

"জানি তুমি এখনো গাইছ গান পাহাড়ে পাহাড়ে

কাশ্মীরের হ্রদ থেকে হ্রদে

উপত্যকার পুষ্প ও তৃণগুল্মের কম্পনে কম্পনে

এখনো বিদ্বেষের অগ্নিশিখাতেই

খুঁজে ফিরছ প্রিয়তম ইউসুফের মুখ?"

অনেকটা দূরত্ব অতিক্রম করে আমরা তাংমার্গ টোল প্লাজায় এসে যাত্রাবিরতি করি। তারপর উর্ধ্বগমন করতে করতে পাহাড়ি রাস্তার উভয় পার্শ্বে কতো যে দেখি দীঘল সব পাইন ও ফার গাছের সারি! একেবারেই নয়নকাড়া এইসব গাছের উপস্থিতি, যার মাধ্যমে অনুধাবন করি পাহাড় ও বনের বিশালত্ব। সিএনএন গুলমার্গকে ভারতের শীতকালীন 'হৃদভূমি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল, যেটি আবার স্কিয়িং-এর জন্য এশিয়ার মধ্যে সপ্তম স্থানে অবস্থান করছে। গুলমার্গ শহরকে স্পর্শ করে তো আমরা এর সৌন্দর্য দেখে একেবারেই লা-জওয়াব। সর্বত্রই বিছানো আছে বরফের চাদর, ঘরের ছাদগুলোও বরফে ঢাকা, আর হিমালয়াংশের দূর পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে সাদা মুকুট পরে।

ভ্রামণিকরা মূলত গুলমার্গ আসে গন্ডোলা বা তারের গাড়ি/রজ্জু গাড়িতে চড়তে। আমরাও আজ একই মূল উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি। আমাদের ট্যুর অপারেটর বলে দিয়েছিল গুলমার্গের দুই স্তরের গন্ডোলার কথা। প্রথম পর্যায়ের যাত্রার মাধ্যমে পর্যটকরা ২,৬০০ মিটার উচ্চতা থেকে যাত্রা করে কংদুরি'র ৩,০৮০ মিটার উচ্চতায় পৌঁছে যায়। তখন পর্যটকরা দেখতে পারে 'আল-পাথার' নামের এক জমাটবাঁধা হ্রদ। দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রার মাধ্যমে ইচ্ছুক পর্যটকরা পৌঁছায় আপারওয়াত চূড়ার (Apharwat Peak) কাছাকাছি ৩,৯৫০ মিটার উচ্চতায়। এই চূড়াটির মোট উচ্চতা ৪,২০০ মিটার। আমরা কেবল প্রথম স্তরটিতে চড়ার জন্য বুকিং দিয়েছিলাম। গতকাল টিকিট পাওয়া যায়নি বলে একদিনের জন্য যাত্রা পিছিয়ে দিয়ে আমরা এসেছি আজ। কিন্তু এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও সেটি জোগাড় করা সম্ভব না হওয়ায় আসিফ ফোনে আমাদের কাছে ক্ষমা চাইল। গুলমার্গে একটি গন্ডোলার টিকিট প্রকৃতই সোনার হরিণ। এখানে পর্যটকরা দুটি কারণে ক্যাবল কারে চড়তে ব্যর্থ হয়। প্রথমত আবহাওয়া খারাপ থাকলে, যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল ২০১১ সালে স্কটল্যান্ডে। আর আজ টিকিট না পেয়ে ব্যর্থ হলাম গুলমার্গে। তবে আমি ও আমার স্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়ার মুজুতে অনেক রোমাঞ্চকর গন্ডোলায় চড়ে সাদা প্রকৃতি দর্শনের সুযোগ পেয়েছিলাম বলে আফসোসের কারণ খুঁজে পাইনি। কাশ্মীর এলেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আবহাওয়া ও পর্যটকের অতিরিক্ত চাপ– এ তিনটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। এই ৩টি কারণে ভ্রমণ পরিকল্পনায় পরিবর্তন আসতে পারে, আজ যেমন আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে। ট্যুর অপারেটরের তাৎক্ষণিক প্রস্তাবে আমরা ব্যয় সমন্বয় করে রোমাঞ্চকর রাইডের মাধ্যমে গুলমার্গ পরিভ্রমণের বিকল্প পরিকল্পনা করি।

এক একটা বাইক বিশাল আকৃতির, ছাদখোলা গাড়ি যেন। তবে এসবে চড়ে সামান্য অগ্রসর হতেই বুঝলাম এগুলো কেবলই অ্যাডভেঞ্চারাস নয়, সম্পূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ, মহিলাদের জন্য তো বটেই। আমি যে রাইডারের গাড়িতে উঠি তার নাম সাহেল। বাকি দু'জনের একজনের নাম আকিব। অনেক উঁচুনিচু ও পাথুরে আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করে আমরা বরফের একটি স্থানীয় রাজ্যে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু এখানে পৌঁছা অবধি

প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়েছে জীবন বাঁচাতে প্রয়োজনে আমি তো লাফ দিতে পারব, কিন্তু আমার পেছনের দুটি গাড়িতে থাকা সফরসঙ্গিনীরা কি পারবে? এসব নানা দুশ্চিন্তায় মুহূর্তগুলো অতিক্রান্ত হয়েছে। পথে পথে অন্যান্য গাড়ির জ্যাম, অশ্বারোহীদের সারি অতিক্রম করে এসেছি। সমতল স্টেশনটিতে দাঁড়িয়ে আমরা কাশ্মীরের ঐতিহ্যবাহী চা 'কাওয়া' পান করলাম, ঐখানে যেটির এক কাপের দাম ৫০ রুপি। একটি সুস্বাদু, কিন্তু অতি মিষ্ট কাশ্মীরি খাবার ছিল বাদাম, নারকেল ও অন্যান্য উপচারের সংমিশ্রণে বানানো। সমতল স্টেশনটি থেকে কেউ কেউ হাতে টানা স্লেজিং করে আরো উপরে উঠবার কসরত করছে। কেউ ঘোড়ায় চড়ে উপরে উঠছে তো উঠছেই। আমি হেঁটেই রওনা দিলাম, কিন্তু কিছু দূর গিয়ে একটি আশংকা দানা বেঁধে উঠল। নামবার সময় এই বরফগলা পথে পা পিছলে গেলে অনেক নিচে গড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাই এই শীতল রণে ভঙ্গ দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেই হলো। যারা যাচ্ছে তাদের জুতার নিচে পিছলা-প্রতিরোধী পেরাগ বসানো।

ফিরবার পথে তিনটি গাড়িই অনেক নিচের একটি খাদের বরফগলা পানিতে নেমে দু'এক চক্কর দিয়ে এদের চাকাগুলো পরিষ্কার করে নিলো, যাতে চাকায় লেগে থ াকা কাদায় স্লিপ কাটার সম্ভাবনা না থাকে। কী এক অভিজ্ঞতা! তবে ফিরতিপথে ৩টি গাড়ির আরোহীদেরই তারা দূর থেকে একটি ভালো স্থাপনা দেখায়, Indian Institute of Skiing and Mountaineering. একেই বলে শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থানীয়করণ। পরে জেনেছি ইচ্ছুক দেশী-বিদেশী স্কিয়ার ও পর্বতারোহীদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। অবশেষে ফিরে এসে গুলমার্গ বন বিভাগের অতিথিশালার চত্বরটি পরিদর্শন করা হয়, যেখানে বাসিত নামের এক যুবক আমাদের ছবি তুলে দেয়।

আজ রওনা দিয়েছিলাম দলিয়া নামের এক স্থানীয় জাউ সহযোগে অন্যান্য খাবার খেয়ে। কিন্তু ফিরবার পথে ভক্ষণ করা হয় কাশ্মীরের সবচেয়ে দামি রাজকীয় খাবারটি, ওয়াজওয়ান (Wazwan). এটি কাশ্মীরের নিজস্ব এক থালি বলে দাবি করা হয়, যদিও খাবারটি আমদানি করা হয়েছিল ইরান থেকে। এটিকে বলা হচ্ছে পায়াম (Payam) স্পেশাল কাশ্মীরি ওয়াজওয়ান থালি। এতে ছিল মোট ১৬টি পদ– শিক কাবাব, তাবাখ মাজ, মেথি মাজ, পায়াম বিশেষ পনির, ওয়াজওয়ান চিকেন, সামি কাবাব, রিস্তা, রোগান জোশ, দানিয়া কোর্মা, গোস্তাবা, স্পেশাল কাশ্মীরি সাগ, সবুজ সালাদ, সবুজ চাটনি, পাপাদ, ভাত ও রুটি। তবে যা' ভেবেছিলাম বিল তারও চেয়ে কম, ১৭০০ রুপি মাত্র। হোটেলটির নামও দেখি ইরানি ভাষা ফারসিতে লেখা, তাই বুঝতে পারিনি। গাছ-গাছালি ও পুষ্পরাজিতে হোটেল চত্বরটি সুশোভিত। তাই সহজেই ভোজনবিলাসীদের মন ভরে যায় ।

গুলমার্গে বরফের স্তূপে

মুঘল নির্মিত বাগিচা দর্শন

মুঘল সম্রাটরা তাদের মূল সাম্রাজ্যের পাশাপাশি ভারতে বাগ-বাগিচার যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন তৃতীয় দিনে সে সব বাগিচাই আমাদের গন্তব্য হয়। আজ জুন মাসের প্রারম্ভ। আবহাওয়াও আশাপ্রদ, কোনো হিডেন থ্রেট আছে বলে মনে হয় না। প্রথমেই আমাদের গন্তব্য হয় পণ্ডিতজির স্মৃতিবিজড়িত এক উদ্ভিদ উদ্যান, যেটির নাম জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেন। যদিও বাগানের দিগন্ত বরাবর কালো মেঘের উঁকিঝুঁকি, তবুও মন ভরে গেল পুষ্পের বিচিত্র বর্ণ দেখে। আহা পার্পল আর পিংকের কী মোহনীয়তা! প্রথমেই ওরা লিখে রেখেছেন Beauty surrounds us, but usually we need to be a walking in a garden to know it. বলা হলো শুধুই জানার জন্য বাগানে বিচরণ করতে। কিন্তু সবাই তো আর জগদীশ চন্দ্র বসু

নয় যে, উদ্ভিদের সুখ-দুঃখ বোঝার জন্য এটিকে জানতে যাবে। এই দায়িত্ব কেউই অনুভব করে না। মূল ফটকের পাশেই একটি দপ্তরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে আমি সেখানে সেঁধিয়ে গেলাম। বাংলাদেশী পরিচয় পেয়ে পরিচালক মহাশয় দারুণ আন্তরিকতা প্রদর্শন করলেন। একটি মুদ্রিত সচিত্র ফোল্ডার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, স্যার আপনাকে আজ ৫টি মুঘল গার্ডেন পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অতঃপর তিনি নেহরু গার্ডেন ছাড়া বাকি ৪টি বাগানের নাম পেন্সিলে লিখে দিলেন– Parimahal, Cheshmashahi, Nishat and Shalimar garden.

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের Department of Floriculture, Gardens and Parks-এর তত্ত্বাবধানে এসব বাগান ও উদ্যান পরিচালিত হচ্ছে। দেখলাম যে, চেশমাশাহীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে নেহরু উদ্যানটি তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে যাচ্ছে, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। বিশাল এ উদ্যানটি এশিয়ার সর্ববৃহৎ টিউলিপ বাগানের লাগোয়া, যার পাশেই রূপভবানী মন্দির, আর পশ্চাতে রয়েছে জাবারভান পাহাড়শ্রেণী। নেহরু উদ্যানটি দেড় লক্ষ উদ্ভিদের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার, যার মধ্যে রয়েছে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পুষ্পঝোপ, সৌন্দর্যবর্ধক বৃক্ষ, কন্দজাতীয় গাছ এবং কিছু বিরল উদ্ভিদ। এর কার্যক্রম ৪টি প্রধান ভাগে বিভক্ত– গাছপালা রোপন-লালন, গবেষণা, বিনোদন উদ্যানের ব্যবস্থাপনা এবং রোগনাশক-অ্যারোমাসহ সকল প্রকারের বৃক্ষ সংরক্ষণ। ১৭ হেক্টর আয়তনের যে মিনি লেকটি দেখতে পাই সেটিই দর্শনার্থী আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এমন একটি উদ্যান যে সৌন্দর্যদায়ক, সুগন্ধি ফুল ও ভেষজ-ঔষধি বৃক্ষের দেশীয় চাহিদা মেটানোর জন্য বিক্রয়কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে, তা জানা ছিল না। কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে জানতে পারি, উদ্যানটি প্রতি বছর প্রায় ৪ লক্ষ দর্শনার্থীর পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে।

নেহরু উদ্যানের পর আমাদের গন্তব্য হয় পরিমহল। কিন্তু ঐখানে পৌঁছার জন্য আমাদের ৫ কিলোমিটার উর্ধ্বগমন করতে হয়েছে। পর্বতারোহণের পূর্বে প্রতিটি গাড়ির নিরাপত্তা তল্লাশি সম্পন্ন করেছে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর লোকজন। জানতে পারি পরিমহলকে পীরমহলও বলা হতো। পরিমহল ধারণার সাথে পরি বা পাখাওয়ালী নারীর একটা সম্পর্ক তো অতীতে ছিলই, যদিও বাস্তবে পরির কোনো বাও-বাতাস কেউ কোনোদিন পায়নি। তবে উপর তলায় কাশ্মীরি পোশাক পরিধান করিয়ে নিসর্গের পটভূমিকায় আলোকচিত্র গ্রহণ করে নারীদের কাছ থেকে টু পাইস কামাইয়ের কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত আছে। এই রকমই পোশাক পরিহিতা পিঠে বিশাল ফুলের ঝাপি নিয়ে দণ্ডায়মান এক মধ্যবয়স্কা নরীর দিকে তাকিয়ে বললাম 'সিনিয়র পরি'। তখন তার আনন্দ দেখে কে, খুশি হয়ে একাধিকবার উচ্চারণ করলেন, Thank you!

তবে এটি যেনতেন উদ্যান নয়, এর সাতটি স্তর রয়েছে। মুঘলাই কারবার। এঁরা যে বিলাসী ছিলেন, তাতে সন্দেহ কী? এটির সপ্তম স্তর থেকে ডাললেক ও পুরো

শ্রীনগরের সৌন্দর্য অবলোকন এক অপার্থিব হাতছানি। আমরা একে একে ইটের সিঁড়িগুলো ডিঙিয়ে উপরে উঠে বুঝতে পারি এটি হচ্ছে এক অনন্য মুসলিম স্থাপনা, যা' তাজমহলের পাশাপাশি সম্রাট শাহ্জাহানের আরো একটি কীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে। প্রতিটি স্তরেই একটি করে বাগানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করি, যে গুলোর সাথে জটিল জল সরবরাহের ব্যবস্থাও ছিল। তবে নিচের ২টি বা ৩টি স্তরের অস্তিত্ব বোঝা যায়নি, হয়তো মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে।

শাহ্জাহান-পুত্র দারাশিকো এখানে ১৬৪০, ১৬৪৫ এবং ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে অবস্থান করেছিলেন বলে জানা যায়। তখন এর সর্বোচ্চ স্তরটি মানমন্দির (Observatory) হিসেবে ব্যবহৃত হতো যেখান থেকে রাজকুমার আকাশ পর্যবেক্ষণপূর্বক জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। তিনি নাকি জ্যোতিষশাস্ত্রী হওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন। বিজ্ঞান আর অপবিজ্ঞান কখনো হাত ধরাধরি করেও চলে। ১৯৮০ সালে ডি.এল রায়ের 'সাজাহান' নাটক অবলোকনের সময় আওরঙ্গজেব কর্তৃক ভ্রাতৃহত্যা সংক্রান্ত সংলাপ-বর্ণনাগুলো শ্রবণকালে গা শিউরে উঠত। কথিত আছে, আওরঙ্গজেব নিজের সিংহাসন দখলের পথকে নিষ্কণ্টক করার জন্য ভাই দারাশিকোকে এই উদ্যান-বাড়িতেই হত্যা করিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে এ পরিমহল আধাসামরিক শিবির হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসদছিল। এই কারণেই বোধ করি সরকারের উচ্চপদস্থ আমলারা সন্দেহভাজন মানুষদের পরিমহলের অতি গোপনীয় কক্ষে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা করতেন।

এখানকার সৌন্দর্যবর্ধক বিশাল গাছগুলো দৃষ্টিনন্দন, পাতাবিহীন গাছেরও কী নান্দনিকতা! সর্বোচ্চ স্তরে একটি প্রাচীন মনুমেন্টের অস্তিত্বও লক্ষ্য করি, কিন্তু কিসের সেটা বোঝা গেল না। তবে এর কোনো ক্ষতিসাধন করা হলে ২ লক্ষ রুপি জরিমানা, বা দুই বছরের কারাবাস, কিংবা উভয় দণ্ড প্রদানযোগ্য– এসব লেখা আছে।

তৃতীয় গন্তব্যটিতে গিয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ একঘেয়েমি পেয়ে বসে। কারণ সবই দেখতে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তবুও প্রতিবার ২৪ রুপি করে টিকিট কেটে বাকি ৩টি উদ্যানও আমরা পরিদর্শন করে আসি। ৪০০ বছর আগে নির্মিত এই সব স্থাপনায় আছে ইতিহাসের গন্ধ, পূর্বপুরুষদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশের এক অনন্য অনুভূতি। এসবের মধ্যে চেশমাশাহী হচ্ছে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এখানকার প্রাকৃতিক জলাধার হতে পাহাড়ের বিশুদ্ধ পানি ৩টি নল, ধাতব-পাথুরে নালা দিয়ে গড়িয়ে পড়ার এক অন্য রকম দৃশ্য কাছ থেকে অবলোকন করা যায়। জানতে পারি প্রধানমন্ত্রী নেহরু-ইন্দিরা, পিতা-পুত্রী উভয়েই এই পাহাড়ি জল নিয়মিত পান করতেন। এ জলাধারটি আবিষ্কার করেছিলেন কাশ্মীরের সন্ন্যাসিনী রূপাভবানী। তিনি ছিলেন কাশ্মীরি পণ্ডিতগোষ্ঠীর এক সাধিকা। তাঁর বংশের নাম 'সাহিব'। এ জন্য এ জলধারার নামটি হয়েছিল 'চেশমা সাহিবি'। এ নাম পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী সময়ে হয়ে যায় 'চেশমাশাহী' বা রাজকীয়

জলাধার/জলধারা। তখনও সম্রাট শাহ্জাহানেরই রাজত্বকাল। এখানকার বাগানটি নির্মাণ করেছিলেন তাঁর গভর্নর আলী মর্দান খান।

এসব বাগানের নির্মাণ কৌশলে ইরানের স্থাপত্যরীতির প্রভাব রয়েছে। এ স্থাপত্য মন জুড়ানো ও নয়নকাড়া। লেখক-পর্যটক অমিত কুমার বলেছিলেন, ছোট্ট এ চেশমাশাহী শ্রীনগরের বাগানগুলোর মধ্যে স্থাপত্যগত ভাবে খুবই মনোমুগ্ধকর।

কিন্তু পরবর্তী দুটো স্থাপনা নিশাত গার্ডেন ও শালিমার গার্ডেন আর এ আকর্ষণ, কিংবা মুগ্ধতা ধরে রাখতে পারেনি। যদিও নিশাতবাগ ছিল ১২ স্তরের এক নান্দনিক বাগান, কিন্তু এখন এটির বহু স্তরের চিহ্ন মুছে গেছে। নিশাতবাগ একটি উর্দু শব্দ যার অর্থ 'আনন্দ উদ্যান'। কাশ্মীরের পির পানজাল পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে ১৬৩৩ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সম্রাট শাহ্জাহানের শ্বশুর ও প্রধান উজির আসিফ খান। শাহ্জাহান বাগানটি তিন তিনবার দর্শনের পর তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন এই আশায় যে, শ্বশুর মশাই তাঁকে এটি উপঢৌকন হিসেবে দান করবেন। কিন্তু এ বিষয়ে আসিফ খানের অনড় অবস্থান দেখে সম্রাট এতে জল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাতে বাগানটি মরুভূমির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় আসিফ খান হতাশ ও হতহৃদয় হয়ে পড়েছিলেন। একদা গাছের ছায়ায় বিশ্রামরত অবস্থায় তিনি পানির শব্দ শুনতে পান এবং দেখতে পান সবগুলো ফোয়ারাই চালু হয়েছে, যা' ছিল তাঁর এক চাকরের কারসাজি, যে শালিমার বাগান থেকে কৌশলে এ জল আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। তখন তিনি অজানা আশংকায় ভীত হয়ে এহেন কৌশলে সৃজিত জলপ্রবাহ বন্ধের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর ফল হয়েছিল উল্টো। প্রভুভক্ত এই নফরের কথা শুনে সম্রাট প্রীত হন এবং বাগানটি পূর্ণোদ্যমে চালু করার নির্দেশ দেন। তবে আজকের দিনের মতো চত্বরের ঘাসের এই মোহনীয়-কমনীয় সবুজ রং সম্রাট দেখেছিলেন কিনা জানি না, দেখলেও রাজনিতম্ব তো কখনো মাটির স্পর্শ পায় না। আমরা কেবলই অদ্ভুত সবুজ রঙে মুগ্ধ হয়ে ঘাসের উপর উপবেশন করেছিলাম খানিকটা সময়। আর আমাদের মাথার উপর ঘন ছায়া হয়ে অনড় ছিল বিশাল চিনার বৃক্ষ (Platanus Orientalis), কাশ্মীরিরা যেটিকে বলে 'বুইন' (Buin). এই বাগানে একটি সমাধি আছে যা' ছিল মুঘল রাজকন্যা জুহরা বেগমের। জুহরা ছিলেন মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের কন্যা, যার উপর এই সবুজ ঘাস এখন বিছিয়ে রেখেছে মমতার আচ্ছাদন।

শালিমার বাগ, অর্থাৎ 'সুন্দর' বাগানটিও ছিল মুঘলদের এক অনন্য সৃজন, যেটি আমাদের আজকের পরিদর্শনের পঞ্চম বা সর্বশেষ গন্তব্য। কিন্তু এই বাগানটি বহু পুরানো, যা' ১৬১৯ সালে নির্মাণ করেছিলেন শাহ্জাহানের পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর। পরে একই আদলের ২টি শালিমার বাগ নির্মিত হয়েছিল লাহোর ও দিল্লিতে, যে সব এখনও অস্তিত্বমান। এই বাগানটি এখন এক গণউদ্যানে পরিণত হয়েছে যার পরিচিতি 'শ্রীনগরের মুকুট' (Crown of Srinagar) হিসেবে। নির্মাণের পরপর এটিকে বলা হতো

'ফারাহ্ বক্শ' যার অর্থ আনন্দদায়ক। ১৯৩০ সালে শাহ্জাহানের নির্দেশে কাশ্মীরের গভর্নর জাফর খান এটিকে বর্ধিত করে নয়া নামাকরণ করেন 'ফয়েজ বক্শ' (Faiz Baksh), যার অর্থ প্রচুর বা প্রাচুর্য। তখন থেকে শিখ গভর্নদের একটি আনন্দবিহার হিসেবে এটি পরিগণিত হতে থাকে। মহারাজা রঞ্জিত সিং-এর শাসনামলে ইউরোপীয় দর্শনার্থীদের জন্য মার্বেল পাথরের একটি অতিথিশালা নির্মাণ করা হয়। উদ্যান-চত্বর বিদ্যুতায়ন করেছিলেন মহারাজা হরি সিং। এই মহারাজার ইচ্ছাতেই কাশ্মীর একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুপ্রধান ভারতের সাথেই থেকে গিয়েছিল। এই বাগানের সৌন্দর্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহান এতোটাই মোহিত ছিলেন যে, তাঁরা উপর্যুপরি দিল্লি থেকে কাশ্মীর চলে আসতেন। কথিত আছে, তাঁরা ১৩বার দিল্লি থেকে কাশ্মীরে আগমন করেছিলেন। এই শালিমার বাগ ছিল তাঁদের গ্রীষ্মকালীন আবাস। পির পানজালের দীর্ঘ বরফঢাকা পথ তারা হাতিতে চড়ে অতিক্রম করতেন। এখানে যে মূল ভবনটি ছিল সেটি পুনর্নির্মাণাধীন অবস্থায় দেখতে পেলাম, যেটির সামনে নান্দনিক ফোয়ারাগুলো পূর্ণ চালু অবস্থায় আছে। বৃহৎ ঝোপের ঘন গাছের পাতায় তারা ঘাসকর্তনী দিয়ে আরবিতে খচিত করে রেখেছেন 'আল্লাহু'।

কাশ্মীরের বন-পাহাড়, উপত্যকা, হ্রদ, নদী, বরফ, ধাবমান মেঘ, ঝরনা ও উদ্যানগুলো নিয়েই এর পরিপূর্ণ অস্তিত্ব। কাশ্মীর পরিদর্শনকালে পারস্যের কবি ওর্ফি সিরাজী রাজ্যটির সার্বিক রূপে মুগ্ধ হয়েই লিখেছিলেন, "পৃথিবীতে স্বর্গ বলে যদি কিছু থাকে, এটি এখানে, এটি এখানে, এটি এখানে।"

জীবিকার সংগ্রাম ও ডাল হ্রদের মাহাত্ম্য

গুলমার্গ থেকে আমরা সরাসরি চলে আসি ডাললেক। এটি পৃথিবীর এক মনোরম লেক যা' মানুষের জীবিকারও উৎস হয়ে সদা রিরাজমান। এটি এক শহুরে লেক, যে নামটি বিখ্যাত হয়ে আছে 'ফুলের হ্রদ' হিসেবে। অন্যান্য পরিচয় তো এর আছেই, যেমন 'শ্রীনগরের রত্ন', 'কাশ্মীরের মুকুটমণি' ইত্যাদি। এটি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণেরও আধার যা' জলজবৃক্ষ ফলানোর কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে। ইত্যাকার কারণে এই হ্রদ পর্যটকদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চারণভূমি কিংবা চারণজল।

এটিকে কেন্দ্র করেই মুঘল আমলের বুলেভার্ডগুলো গড়ে উঠেছিল। ১৮ বর্গকিলোমিটারের এই হ্রদ ২১ বর্গকিলোমিটারের এক জলাভূমির অংশ। এই হ্রদের ভাসমান বাগানের শাপলা, পদ্মফুল জুলাই-আগস্ট মাসে পর্যটকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ তৈরি করে। তবে আমরা যখন একটি শিকারা নৌকায় উঠে এর বুকে পা রাখি তখন এই পদ্মবন ফুটবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমাদের নৌকার মাঝির নাম ফায়াজ, সে এ বিশাল ডাল হ্রদে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রতিটি স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়। প্রথমেই এর একটি অংশকে বলা হলো গোল্ডেন লেক। আমরা যেতে যেতে একটার পর একটা ফেরিওয়ালার নৌকাকে অতিক্রম করে আসি। তারা নানান দ্রব্য ফেরি করে বেড়াচ্ছে, অনেকেই

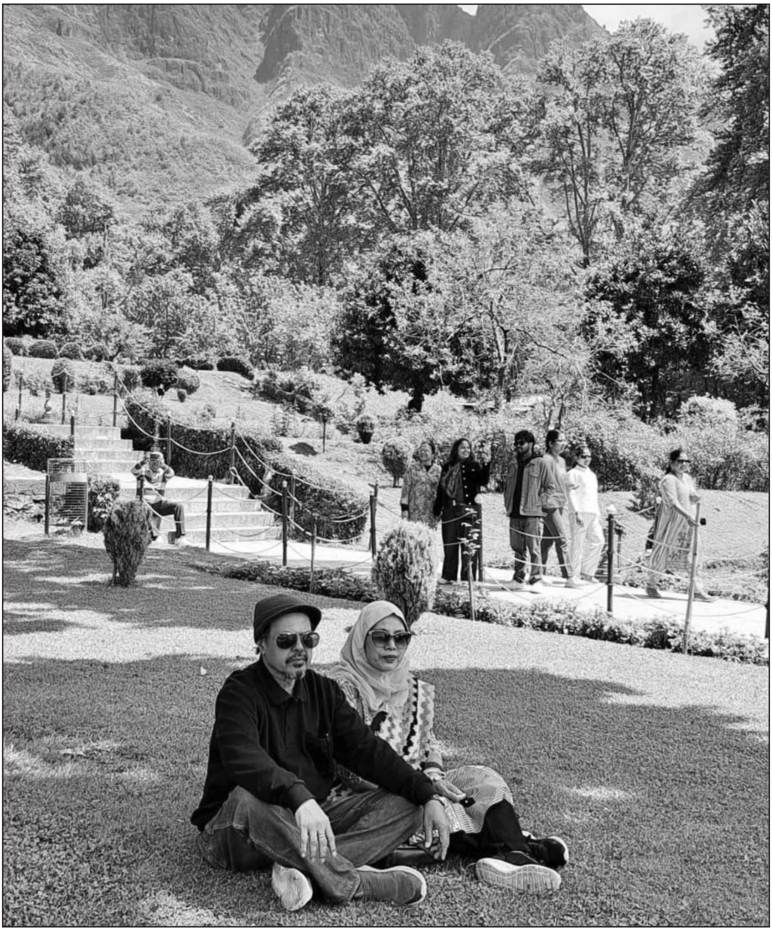

অফুরন্ত সবুজের মাঝে শালিমার গার্ডেনে

কাছে নৌকা ভিড়াল। একজনের কাছ থেকে আমরা এক প্লেট মিক্সড ফ্রুট নিলাম, দোকানি খুব দ্রুতই তা' কেটে দিলো। দেখলাম প্রকৃতিমাতা কীভাবে তার সন্তানদের জীবিকার সংস্থান করে চলেছে। তারাও মায়ের যত্ন নিচ্ছে অহোরাত্রি। কোনো আবর্জনা না ফেলে হ্রদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে চলছে ব্যতিক্রমহীন ভাবে।

ফায়াজ আঙুল উঁচিয়ে দেখাল, এটা হচ্ছে ওপেন ডাললেক। এখানে নাকি একটি চলচ্চিত্রের শুটিং হয়েছিল। অতঃপর অন্যপাশে সে একটি বিলবোর্ড দেখাল– লেখা আছে গুলফাম (Gulfaam), যা' একটি টিভি সিরিয়ালের নাম। ওপেন বা উন্মুক্ত ডাল হ্রদে একটি পোস্ট অফিসেরও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল। তবে সেটি খুব পুরানো নয়।

২০১১ সালে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ্ উদ্বোধন করেছিলেন এই ভাসমান ডাকঘর ও জাদুঘরের। এটি আসলে ফিলাটেলি মিউজিয়াম। ১ নম্বর ঘাটের বুদিয়ারচক থেকে পোস্টকার্ড সংগ্রহ করে এই পোস্ট অফিসের মাধ্যমে প্রাপকের কাছে প্রেরণ করা যায়। তবে ডাকঘরটি অতো পুরানো না হলেও সে 'গ্রিনভিউ' নামের যে হোটেলটি দেখাল তা কিন্তু ১৮০ বছরের পুরানো। তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, যে শিকারা রাইডে আরোহণ করেছি হাউসবোটে যাওয়ার জন্য, সে গুলো কতোটা পুরানো বা কতো বছর আগে চালু হয়েছিল? যখনই চালু হোক, এ সব যে শতাব্দীপ্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের স্বাধীনতার উপর ল্যারি কলিন্স ও দোমিনিক ল্যাপিয়ের রচিত 'ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট' নামের সবচেয়ে বড়ো যে আকর গ্রন্থটি রয়েছে তাতেও এর একটি সূত্র খুঁজে পাই, "যারা কাশ্মীর যেত তাদের একটি বিলাসিতা ছিল ওখানককার ক্ষিপ্রগতি নদীতে বসে মাছ ধরা। ইসমে (মাউন্টব্যাটেনের চীফ অব স্টাফ লর্ড ইসমে) ছুটি কাটাতে যেতেন কাশ্মীরের রাজধানী শহরে। প্রথম ছুটির আমেজ উপভোগ করতেন ডাল লেকের উপর হাউসবোটে বাস করে। গ্রীষ্মকালের ছুটিতে ৮,০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ি গ্রাম গুলমার্গে চলে যেতেন (রবিশেখর সেনগুপ্ত অনূদিত, পৃষ্ঠা: ২৩৬-২৩৭)।"

সকল ভ্রমণেই কিছু বাণিজিক বিষয়াদি থাকে। তাই সে আমাদের পানির উপর নির্মিত একটি দ্বিতল বস্ত্রালয়ে নিয়ে গেল। আমরা এটির বৈশিষ্ট্য দেখে আশ্চর্য হলাম। লোকজন জানায়, দোকানটির প্রথম তলায় কখনো পানি উঠেনি। আমরা ধীরে পার হয়ে আসি 'মিনা বাজার' ও অন্যান্য স্থাপনা। আমাদের দেখানো হলো ভাসমান বাগান যেখানে শাক-সবজির চাষ হচ্ছে। লেকের পানি সর্বোচ্চ ১৫ ফুট গভীর বলে ফায়াজ জানাল। ফেরিওয়ালার নৌকা আসছে-যাচ্ছে চাদর, জাফরান, ধাতবালংকার, চা-কফি, ফলমূলের সওদা নিয়ে। আর আমরা শিকারার আরামদায়ক কুশনে হেলান দিয়ে এসব উপভোগ করছি। রবির অস্তরাগে এক অপার্থিব অনুভূতি নিয়ে দেখছি কতো যে যুবক-যুবতীও আছে শিকারাগুলোতে, আছে হয়তো নববধূ আর বর। তাদের অনুভূতি নিশ্চয় আমাদের চেয়েও আবেগময়। যারা মধুচন্দ্রিমায় এসেছে তাদের উপর আজ রজনীতে চন্দ্র ঢেলে দেবে জ্যোৎস্নালোক। তারকারাজি ফুটে থাকবে আকাশে ঝালর হয়ে।

বাংলার লৌকিক দেবী দুর্গার আবাসটি এ হ্রদের কাছেই ছিল বলে জানা গেল। সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ডাল হ্রদের পূর্ব দিকে ইসাবার (Isabar) গ্রামে ছিল দুর্গার বাড়ি। হ্রদপাড়ের এই স্থানটির নাম ছিল সুরেশ্বরী, এটিই উৎস ছিল 'শতধারা' নামধেয় জলধারার। শতধারা, সরোবর, মানস সরোবর, এসব সংস্কৃত শব্দ। ১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল প্রভাব দুর্বল হয়ে এলে অত্রাঞ্চলে, অর্থাৎ এই হ্রদ এলাকায় পশতুন উপজাতির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তখন থেকে শ্রীনগর শহরও বর্ধিষ্ণু হতে থাকে। এর পর শুরু হয়ে যায় আফগান দূররানী সাম্রাজ্যের

দাপট। শহরের সম্প্রসারণের সাথে পর্যটনও সবল হয়ে ওঠে, যা শুরু হয়েছিল ১৮১৪ সাল থেকে মহারাজা রণজিৎ সিংহের হাত ধরে। অতঃপর ২৭ বছর শিখরাও এখানে মাতব্বরি করে বেড়ায়। তাই ডাল হ্রদসহ পুরো কাশ্মীর উপত্যকায় এক মিশ্র সংস্কৃতি লালিত হয়ে আসছিল। অতঃপর দোগরা মহারাজাদের কাল পেরিয়ে এলো ব্রিটিশের শাসন। তখন তারা বিপুল অর্থ ব্যয় করে 'বাড়িনৌকা' বা হাউসবোটগুলো নির্মাণ করেন। এসব তখন পরিচিতি পায় 'হ্রদের উপর ভাসমান এক একটি ছোট্ট ইংল্যান্ড' (Each one a little piece of England afloat on Dal) হিসেবে।

ভারত স্বাধীন হলে পাঞ্জাবি হানজি জনগোষ্ঠী এসব হাউসবোটের মালিকানাসহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পায়। তারাই ভাসমান বাগানের গোড়াপত্তন করে এ সবের পরিচর্যা করতে থাকে। ভাসমান জমির উৎপাদিত ফসলাদি তাদের জীবিকা নির্বাহের এক প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসব হাউসবোট শ্রীনগরের স্বাভাবিক আবাসন চাহিদাও মেটায়, পর্যটকদের জন্য তো এক আবশ্যিক গন্তব্য হয়েই দাঁড়ায়।

ফায়াজের শিকারা রাইডের মাধ্যমে আমাদের দু'ঘণ্টা বাইচালি করা হলো। অতঃপর সন্ধ্যায় যে হাউসবোটের সিঁড়িতে পা রাখি সেটির নাম লাকি পিকক, অর্থাৎ 'ভাগ্যবান ময়ূর'। তবে আমরা অতোটা ভাগ্যবান ছিলাম না, কারণ ইতোমধ্যেই 'তিনি কিছুটা পুরানো হয়ে গিয়েছেন'। তবে এর ভেতরটা স্থলভাগের যে কোনো হোটেলের চেয়ে ঐশ্বর্যময়। আবাস কক্ষটিতে একটি একক ও বড়ো আকারের দ্বৈত বিছানা রয়েছে। সোফা, টুল ইত্যাদি তো আছেই যা' আমরা এই ভ্রমণের সময় অন্য কোনো হোটেলে পাইনি। একটি চমৎকার বিশাল ডাইনিং হল ও আলাদা ড্রয়িং রুম রয়েছে। সবই ওয়াইফাই-এ সংযুক্ত। খাবার ঘরের মধ্যিখানের ঝারবাতি, পেছনের দামি তৈজষপত্র ব্রিটিশরাজের জাঁকজমকের ইঙ্গিত দিয়ে যায়। বৈঠকখানাটিতে পাঠকের পড়ার জন্য অনেকগুলো বইও তাকিয়ায় শোভা পাচ্ছে। সবার ব্যবহারের জন্য যে বারান্দাটি রয়েছে তার শোভা বর্ধন করে যাচ্ছে রাজকীয় কোলবালিশ গুলো। এ বারান্দায় পা রেখেই দেখতে পেলাম কলকাতার সেই পরিবারটি ডিভানে বসে লুডু খেলছে, যাদের সাথে আমাদের নেহরু গার্ডেনে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তারা নাকি অন্য কোথাও হোটেল নেননি, এই লেকের উপরই বসবাস করছেন।

হাউসবোটে এসে যে হাউস-কিপার ছেলেটিকে পেলাম তার নাম সাজিদ। সে যথেষ্ট সুদর্শন ও স্মার্ট। আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করল। তার বাসা ৪০ কিলোমিটার দূরে বলে জানায়, প্রতিদিনই সে বাইকে আসা-যাওয়া করে। সাজিদ ছাত্র, এটি তার খণ্ডকালীন চাকরি। বোটের রাতের খাবারে এই প্রথমবার নিরামিষের সাক্ষাৎ পেলাম। সকালে নাকি আলুপরটা দেওয়া হবে। আমি রাত ১২টার আগে আগে শয্যা গ্রহণ করি। তার আগে নিঃসঙ্গ শৌচাগারে গিয়ে দেখতে পাই এর মেঝেটি আমরা শুকনোই রাখতে সক্ষম হয়েছি। সচেতনভাবে এটি না করলে কিছুটা ভোগান্তি যে পোহাতেই

হয়, কারণ সুশোভিত এ মেঝের পানি সহজে শুকায় না। এখানে সারা রাতই শুনেছি পালিত মোরগের দূরাগত বাক ও জলচর পাখির ডাকাডাকি। দিনের বেলায় এই হ্রদে সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম ডাহুক ও পানকৌড়ির। ভোরেই শুনতে পেয়েছি চড়ুই পাখির কিচিরমিচির। তখন শয্যা তাগ করে বোটের সরু পথটি ধরে সামনে এগুতেই ডান পাশ থেকে শুনতে পাই, গুড মর্নিং স্যার! আমার পদশব্দ শুনে সিঁড়িঘরের শয্যা থেকে সাজিদ জানাল এ প্রভাতী সম্ভাষণ। বুঝলাম সে রাতে বাড়ি যায়নি, এখানেই রাত কাটিয়েছে আমাদের বিদায় জানানোর জন্য। সে ঠিক কাজটিই করেছে, কারণ ৯ ডিগ্রি তাপমাত্রার বাতাসে মটরবাইকে সে হয়ে যেতো জবুথবু। নিজেও যখন রোজনামচার খাতায় শেষ আঁচড়গুলো বুলাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল আঙুলগুলো একেবারেই হিম হয়ে এসেছে। যে হ্রদে শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের ১১ ডিগ্রি মাইনাসে চলে যায় এবং হ্রদটি কখনো কখনো শ্বেত বরফের বিশাল এক চাতালে পরিণত হয়, সেখানে আমার নাঙ্গা আঙুল জমতেই পারে। অনেকটা জেদ করেই এ সফরে কোনো হাতমোজা পরিধান করিনি।

সাজিদের সাথে প্রভাতী সম্ভাষণ বিনিময় করে বারান্দার দিকে আর একটু এগুতেই শুনতে পাই হ্রদের উপর চা ও কফিওয়ালাদের হাঁকডাক– এই চা-ই, এই কফি...। কতো ভোরেই তারা বের হয়ে এসেছে জীবিকার তাগিদে। বাইরে গলা বাড়িয়ে দেখতে পাই কাশ্মীরি প্রকৃতি কুয়াশার অবগুণ্ঠন ভেদ করে জেগে উঠছে। উদয়োন্মুখ সূর্যের আভা ছড়িয়ে পড়ছে চৌদিকে। দুনিয়াকি বেহেস্ত নিজকে মেলে ধরছে অকৃপণভাবে।

কিছুটা সময় কাটিয়ে আমি কাঠের জেটিতে উঠে দেখতে পেলাম সাজিদ বৈঠার মতো একটি যন্ত্র দিয়ে পানি আছড়ে ছোট্ট কচুরিপানার দলকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। বুঝলাম এটি দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম। দ্রুত বংশ বৃদ্ধিতে পারঙ্গম এসব কচুরিপানাকে না তাড়ালে দু'দিনেই বোটের চারপাশের পানিকে ঢেকে ফেলবে। তখন অতিথিরা আর জলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে সক্ষম হবে না। তা'ছাড়া অন্যান্য জলজ বৃক্ষলতাকেও সে বৈঠা দিয়ে পেঁচিয়ে ডাল লেকের গভীর জলস্রোতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এভাবেই তাকে অনবরত পরিপার্শ্বের সৌন্দর্য ও পরিবেশ রক্ষা করে চলতে হয়।

যখন আবার আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ফায়াজ চলে এলো শিকারা নিয়ে, হৃৎপিণ্ডের কোনো একটা অলিন্দে কিছুটা মোচড় দিয়ে উঠল বৈকি! আমাদের মাল-সামান হ্রদের পাড়ে স্থাপন করে তুলে দেওয়া হলো রিয়াজের গাড়িতে। ফায়াজ থেকে রিয়াজ। বিদায়ের ঘনঘটা। পাড়েতে প্রস্তুত গাড়ি, বেলা একপ্রহর। দেহটা কাশ্মীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে চলে যাচ্ছি এই দেহেরই ছোট্ট একটি অংশে একে স্থান করে দিতে– সে অংশটির নাম 'হৃদয়'। আর রাজনৈতিক ঝঞ্ঝ-বিক্ষুব্ধ, মনোহার, অব্যয়-অক্ষয় কাশ্মীর তো মনের মধ্যে সর্বদাই বিরাজ করবে, যে মন অনেক বড়ো, খোদ কাশ্মীর থেকেও।

সাজেক ॥ শুধু ভ্রমণ নয়

জালাল আহমেদ

সাধারণভাবে পললগঠিত সমভূমির দেশ বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল পাহাড়ি এলাকা। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সুন্দরবন। তাই বৈচিত্র্যপিয়াসী ভ্রামণিকরা এসব অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। এর মাঝে রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ভ্যালি সকল ভ্রমণপিয়াসুর কাছে এক আকর্ষণের নাম। শীতের সাজেক একরকম আর বর্ষার সাজেক ভিন্ন। তাই প্রতিদিন, সারাবছর সারাদেশ থেকেই ভ্রামণিকগণ দল বেঁধে সাজেকে যায়। পথের দুর্গমতা বা ঝুঁকি তাঁদের আকর্ষণে বাধা হতে পারে না। সাজেকের এই জনপ্রিয়তা খুব বেশিদিন হয়নি। ২০০৩-০৪ সাল থেকে দুর্গম এই পাহাড় চূড়ায় গাড়িতে যাতায়াত শুরু হয়। মুখে মুখে এর সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ২০১৫ থেকে এর জনপ্রিয়তার পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হয়।

এখন সপ্তাহান্তে ৩০০০ এর মতো ভ্রামণিক সাজেকে যায়, ছুটি একটু লম্বা হলে এই সংখ্যা ৪০০০ ছাড়িয়ে যায়।

আমি খাগড়াছড়ি মহকুমা ও পরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় কাজ করেছি ১৯৮৩-৮৬ সালে। সে সময়ে খাগড়াছড়ি থেকে দীঘিনালা রাস্তাও পুরো পাকা বা ব্ল্যাকটপ ছিল না। হেরিংবোন করা রাস্তা ছিল আর কোথাও কোথাও তা' তুলে ম্যাকাডাম করা হচ্ছিল। একই সঙ্গে কাজ করা হচ্ছিল দীঘিনালা-বাঘাইহাট রাস্তায়। ১৯৮৫-৮৬ সালে বাঘাইহাটে শুকনো দিনে চান্দের গাড়ি বা সেনা জিপ যেতো। বাঘাইহাট-সাজেক রাস্তার কাজ শুরু করা হয় আরো অনেক পর। ২০০৩-০৪ সাল থেকে সাজেকে চান্দের গাড়ি বা সেনা জিপ যায় আর ২০১২-১৩ সালে পুরো রাস্তা হেরিংবোন হয়ে যায়। বিশেষ করে অভিযাত্রী ভ্রামণিক বা ট্রেকারদের যাতায়াত শুরু হয় তখন থেকে। ২০১৮ সালেও সেখানে সেনাবাহিনীর দু'টি রিসোর্ট, 'সাজেক রিসোর্ট' আর 'রুন্ময় রিসোর্ট' ছাড়া থাকার জায়গা ছিল না।

এই ২০২৩ য়ে আমরা যখন সপরিবারে সাজেক যাচ্ছি তখন ঢাকা থেকে প্রথমে যাচ্ছি খাগড়াছড়ি জেলা সদরে। বেশিরভাগ ভ্রামণিক ঢাকা থেকে সরাসরি রাতের বাসেই গিয়ে থাকেন আর পরদিন সকালে জেলা সদরে পৌঁছান। কেউ কেউ ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়েও যান তবে কার নিয়ে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত যাওয়া গেলেও সাজেকে কার নিয়ে যাওয়া অনুচিত। আমরা গিয়েছিলাম ঢাকা থেকে বিমানে চট্টগ্রাম এবং সেখান থেকে একটি জিপ নিয়ে খাগড়াছড়ি। দুপুরের খাবার সময়ে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে পৌঁছে যাই। পর্যটকদের জন্য খাগড়াছড়িতে এখন বেশ কিছু হোটেল আছে। তবে অধিকাংশ পর্যটক খাগড়াছড়িতে রাত কাটান না। তারা সকালে এখানে পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা করে চান্দেরগাড়ি ভাড়া করেন আর সকাল ১০ টার এসকর্ট ধরার জন্য দ্রুত দীঘিনালা হয়ে বাঘাইহাট চলে যান। বিকেলে একটু সময় পেয়ে আমার পুরানো স্টেশন পানছড়ি থেকে ঘুরে আসি।

পরদিন সকালে একটা স্থানীয় ভাড়ার আর্মি ডিসপোজাল এর জিপ গাড়ি নিয়ে সাজেক রওয়ানা হই। সঙ্গে আনা চট্টগ্রামের গাড়ি নিলাম না মূলত পাহাড়ি রাস্তায় চালকের অনভিজ্ঞতার জন্য। পথে একটু ডিট্যুর করে দীঘিনালা উপজেলা সদর হয়ে মাইনী নদী পার হই। উপজেলা সদরে না ঢুকেও এখন আরেকটু আগে ডানে মোড় নিয়ে নতুন সেতু দিয়ে নদী পার হওয়া যায়। মাইনী নদীর জন্যই এই ভ্যালিকে বলে মাইনী ভ্যালি। নদী পার হবার পর বাম দিকে রাস্তা চলে গিয়েছে ১৫ কিলোমিটার দূরের বাবুছড়ায় যেখানে ১৯৮৩ সালে দুই বছর পুনর্বাসন কাজ করেছে আমার ব্যাচমেট আনওয়ারুল করিম। দীঘিনালা থেকে বাঘাইহাট জোন, যা একটি ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার, ১৩ কিলোমিটার এবং সেখানে গিয়ে সকাল ১০টার আগে গাড়ি ও যাত্রী নিবন্ধন করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাঘাইহাট পৌঁছে দেখি শত শত

সাজেকে রিসোর্টের পর রিসোর্ট

গাড়ি, থ্রি-হুইলার্স আর মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে আছে নিবন্ধন ও এসকর্ট এর জন্য। দশটার পর সামনে সেনাবাহিনী ও পেছনে পুলিশের এসকর্ট নিয়ে ৩২ কিলোমিটার এর যাত্রা শুরু হলো। কনভয়ের শুরুতে শতাধিক মোটর সাইকেল। খাগড়াছড়ি-দিঘিনালা-বাঘাইহাট সড়কপথের তুলনায় এই অংশে উঁচুনিচু বেশি এবং কোনো কোনো জায়গায় রাস্তা বেশ খাড়া উঠে গিয়েছিল। কেউ কেউ সেডান কার নিয়ে আসার সাহস দেখিয়েছেন কিন্তু এই কারগুলো অন্য গাড়ির জন্য পথের বাধা। দু'পাশে রাস্তার দৃশ্য খুব সুন্দর। বর্ষাকাল হওয়াতে পাহাড়ের রং গাঢ় সবুজ, ছড়াগুলোতে পানি প্রবহমান। আমি ব্যক্তিগতভাবে বর্ষার পাহাড় পছন্দ করি এর সবুজের জন্য। বিশেষ করে যেখানে গঙ্গারামছড়া এসে মিশলো কাসালং নদীর সঙ্গে জায়গাটা চমৎকার লাগল।

মাঝামাঝি যেতেই ফিরতি কনভয়ের গাড়িগুলো ক্রস করতে লাগলাম। কোনো কোনো চান্দের গাড়িতে ভেতর খালি রেখে যাত্রীরা ছাদে বসে আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য। এক চড়াই এর মুখে থামতে হলো কারণ উঁচুতে উঠে যাওয়া রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত, একপাশে গাড়ি নামতে থাকলে এক টানে উঠা যাবে না, তাই। সাজেকের ৫/৬ কিলোমিটার দূর থেকেই সামনে হাতের বামে সাজেকের উঁচু পাহাড় চোখে পড়তে থাকে। আমরা ভ্যালি থেকে উঠে যাচ্ছি 'রিজ' এ কিন্তু তাকেই সবাই বলে সাজেক ভ্যালি। সাজেকের আরো কাছে সিজুকছড়ায় যাবার পর ডান দিকে একটি রাস্তা চলে গিয়েছে সীমান্তের দিকে, উদয়পুর সীমান্ত সড়ক। আরো কিছুদুর যাবার পর রাস্তা খাড়া উঠে গিয়েছে সাজেকে, সেই নাক খাড়া পাহাড়। সাজেকে উঠে

যাবার পর রাস্তার বামপাশে পুলিশ ক্যাম্পের পর রাস্তার দুইপাশেই অসংখ্য রিসোর্ট নামীয় আবাসন ব্যবস্থা। একদা বিখ্যাত হেলিপ্যাড পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে কোনো ফাঁক নেই। যারা ২০১৮-১৯ সালে গিয়েছেন তারা ফাঁকা পথ বেয়ে হেলিপ্যাডে যেতেন, আর এডভেঞ্চারিস্টরা কংলাক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন। এখন হেলিপ্যাড পার হয়ে বিজিবি ক্যাম্পের পরেও কংলাক পাহাড় পর্যন্ত রিসোর্ট, রিসোর্ট কংলাক পাহাড়ের চূড়াতেও। আমাদের আবাস ছিল কংলাক এর আগে শেষ রিসোর্টে ফলে রুইলুই পাড়ার ভিড়বাট্টা থেকে দূরে। সন্ধ্যায় যখন থ্রি-হুইলার নিয়ে রুইলুই পাড়ায় আসি তখন শতশত লোক রাস্তায়। রেস্টুরেন্টগুলোতে রান্না হচ্ছে রাতের খাবার আর হেলিপ্যাডের পাশে সাজেকের বিখ্যাত স্ট্রিটফুড ভেন্ডরস।

এবার সাজেকে যেতে যেতে ভাবছিলাম যে কারা প্রথম সাজেকের এই উঁচু পাহাড়ে বসতি গড়ে! বাইরের দুনিয়া বা প্রশাসনের সংগে তাঁদের সম্পর্ক কেমন ছিল? প্রশাসনিক কর্মকর্তা কে বা কারা এখানে প্রথম গিয়েছিলেন? তাঁদের লেখার কোনো বিবরণ কি কোথাও আছে? আগেকার সিভিলিয়ানরা কি সাজেককে চিনতেন? সাজেকে কি তখনো বসতি ছিল? সাজেক নাম কোথা থেকে কখন এলো? কারণ ১৯০৯ সালে প্রকাশিত আর হাচিনসন এর সম্পাদিত চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল বিষয়ক গেজেটিয়ারে সাজেক এর কোনো উল্লেখ আমি দেখিনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল সম্পর্কে কোনো আলোচনা কিংবদন্তী জেলা প্রশাসক টমাস হারবার্ট লিউইনকে ছাড়া শুরু করা যায় না, শেষও না। যেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আলফা এন্ড অমেগা টি এইচ লিউইন। লিউইন কি বলেন এই এলাকা সম্পর্কে?

লিউইন এর আত্মজীবনী "এ ফ্লাই অন দ্য হুইল" প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে, তাঁর ভারতবর্ষ থেকে ফিরে যাবার কয়েক বছর পর। ১৮৬৬ সালে টি এইচ

পথের পাশের খাবার

লিউইন ১৮৬০ সালে সৃষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রথম ডেপুটি কমিশনার হিসেবে জেলা সদর চন্দ্রঘোনায় যোগদান করেন। লিউইন জেলা সদরকে জেলার আরো অভ্যন্তর রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর করেন। ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে লিউইন কাসালং যান লুসাই চীফ রতন পুইয়া'র পাঠানো প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। কাসালং এ হেডম্যান ঈশান দেওয়ান এর গ্রামে লুসাই চীফ রতন পুইয়া'র পাঠানো কারবারিদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তারা জানায় যে লুসাই চীফ উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তিরক্ষায় উদগ্রীব এবং লুসাইরা যাতে সীমান্তে ব্যবসা করতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে চান। তাঁর জিজ্ঞাসায় তারা জানান যে চীফ রতন পুইয়া কাসালং এ আসবেন না তাই লিউইন তাৎক্ষণিক সেখানে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ঈশান দেওয়ান এর আপত্তি সত্ত্বেও লিউইন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং কাসালং থেকে উত্তর পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করেন। এই যাত্রার প্রথমাংশ 'ডাগ আউট' বোটে (বড় গাছের ভেতরের অংশ ফেলে দিয়ে তৈরি করা নৌকা, পৃথিবীর সর্বত্রই এর ব্যবহার ছিল) চড়ে।

'আমরা আমাদের নৌকাগুলো কখনো কখনো কোমর সমান জলে ভিজে কষ্ট করে টেনে দ্রুত (উচ্চতা পার্থক্যের কারণে উপর থেকে খাড়া নেমে আসা পানি তবে জলপ্রপাত নয়) পার করি। তবে এরপর সমান পানিতে আরামে বেয়ে যাওয়া। তাই বিকেল পর্যন্ত বিরতিহীন বেয়ে উঠানছত্র নামক জায়গায় পৌঁছে। সেখানে বনের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে আসা লুসাইদের আমাদের অপেক্ষায় দেখতে পাই।' সেখানেই নদীর পাড়ে পাথরের উপর তাঁরা রাত কাটান। লিউইন ডাগ আউট বোটেই ঘুমিয়েছিলেন। পরদিন সকালে 'আকাশ ঘোলা থাকতেই আমরা রওয়ানা দেই যখন নদীর জলের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে ঘন কুয়াশা। তারপর চারিদিক স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত করে দিনমণির উদয় হয়। আমার লোকের সূর্যালোকে উষ্ণ হয়ে এগিয়ে যাবার ইচ্ছেয় 'হেঁইয়ো' ডাকে চীৎকার দিলে তা প্রতিধ্বনিত হয় চারিদিকে। আচমকা সবাই চুপ, আর কানে কানে বার্তা এগিয়ে আসে 'সাহেব, সামনে স্রোতের কিনারে নিশানার মধ্যে জলপানরত একটা হরিণ!' অথবা স্রোতধারার উপরে গাছের ক্যানোপীতে দোল খাচ্ছে বানরের দল, তাদের কেউ কেউ জলের কিনারে হাতের কোষ ভর্তি করে পান করছে পানি। কয়েকশো গজ দূরে সূর্যকিরণেস্নান করে ঘুরে বেড়াছে এক সুপুরুষ বনমোরগ।'

দুপুরে সব শুনশান, সবাই আশ্রয় নিয়েছে আড়ালে বা গাছের ছায়ায়, একঘেঁয়ে যাত্রা। বুনো মাছিদের উৎপাত আর বেঁধানো হুলের যন্ত্রণা। একপর্যায়ে লিউইন বলেন 'একবার কোনো এক আকাশচারী যন্ত্রের মতো ডানার আওয়াজ তুলে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল রাজ ধনেশ বা গ্রেট হর্নবিল, তার বাসার দিকে অথবা বাসা থেকে খাবারের সন্ধানে, নিঃসন্দেহে বড় গাছের খোড়লে একটু ছিদ্র রেখে কাঁদা দিয়ে মুখ বন্ধ করা বাসায় ডিমে তা' দিচ্ছে তার সংগী, যে ছিদ্রে পুরুষ ধনেশ তার সঙ্গীর

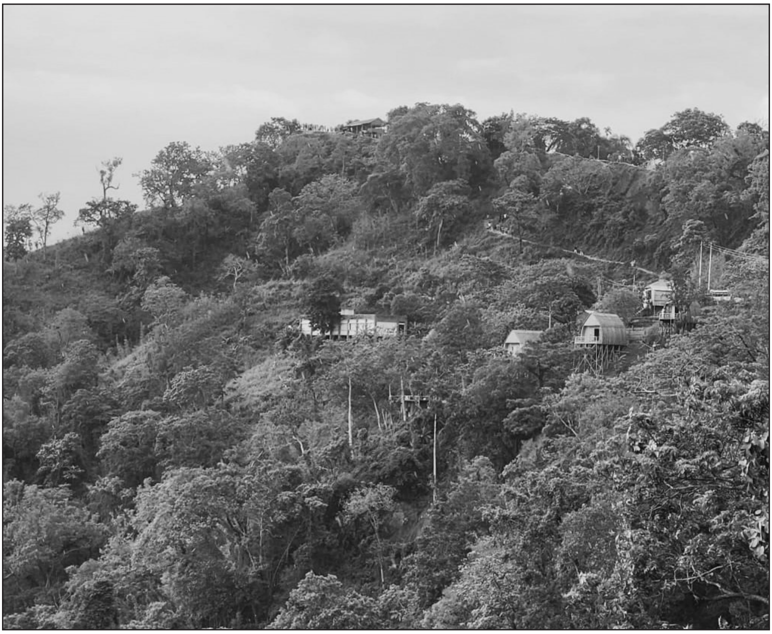

কংলাক পাহাড়চূড়ায় মানব বসতি

খাবার দিতে পারবে।' আগের রাতের মতো এই রাতও জঙ্গলে কাটিয়ে পরদিন পায়ে হেঁটে রওয়ানা। 'The next morning early we left our boats, and followed a jungle-path leading towards a lofty range of hills some ten or twelve miles distant, on the top of which was situated Rutton PoiaÕs village. Our path for some distance lay over low-lying undulating ground, crossing occasionally a rivulet, or passing through dense forest jungle; than it rose on a hill spur, winding up over boulder-covered slopes, among huge trees thickly hung with creepers and orchids., until at length it narrowed into a close rocky difile.' এরপর আরো অনেক ঝুঁকি পার হয়েই লিউইন লুসাই চীফ রতন পুইয়া'র গ্রামে পৌঁছান। এখন প্রশ্ন হলো গ্রামটি কোথায়!

এর স্পষ্ট জবাব লিউইন রেখে যাননি। তবে সাজেক সম্পর্কে একাধিক লিখাতে দেখতে পাচ্ছি যে সাজেকে রুইলুই পাড়ায় জনবসতির শুরু ১৮৮৫ সালে। এভাবে সাল তারিখ বলা যাচ্ছে কিভাবে এর কোনো ব্যাখ্যা নাই। তবে আমার একটি নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে। থমাস হারবার্ট লিউইন রতন পুইয়া'র গ্রামে গিয়েছিলেন ১৮৬৬ সালে। লিউইন এর আত্মজীবনী 'এ ফ্লাই অন দ্য হুইল' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে। সে বইতে চট্টগ্রামের একটি ম্যাপ সংযুক্ত আছে। সে ম্যাপে রাঙ্গামাটির কিছুটা উত্তরে কাসালং দেখানো আছে এবং কাসালং এর উত্তর-পূবে দেখানো আছে Rutton

Poia। এমন কি হতে পারে রতন পুইয়া'র গ্রামটি ছিল সাজেকে? ম্যাপে রতন পুইয়া'র যে গঠন তা' কিন্তু তা'ই নির্দেশ করে, ছোট্ট একটি রিজ, আচমকা উঠে গিয়েছে উপরে এবং তারপর কংলাক পাড়ার পর শেষ। তাই যারা রুইলুই পাড়ার প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫ তে দেখাচ্ছেন তাঁরা হয়তো লিউইন এর ১৮৮৫ সালের ম্যাপ থেকেই উৎস নির্দিষ্ট করেছেন বলে আমার ধারণা।

কিছুটা খোঁজাখুঁজি করতেই অন্তত আরো দুটি আত্মজীবনী পেলাম যেখানে গত শতকের ষাটের দশকে সাজেক ভ্রমণের বিবরণ রয়েছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক ছিলেন প্রাক্তন সিএসপি ১৯৫৫ ব্যাচের সুলতান-উজ জামান খান (পরবর্তীতে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন)। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি তাঁর অন্য সহকর্মীদের নিয়ে সাজেক ভ্রমণ করেন। সুলতান-উজ জামান খান তাঁর আত্মজীবনী 'স্মৃতির সাতকাহন' এ লিখেন, 'আমি জানতে পারলাম যে, প্রায় দেড়-দুই দশক আগে এক ইংরেজ ডি.সি. (আইসিএস ল্যান্স নিবলেট ১৯৪৮-৫০, ১৯৫৪-৫৬) সাজেক উপত্যকা সফর করেছিলেন, তারপর আর কেউ যাননি। আমি মারিশ্যার নবপ্রতিষ্ঠিত জনপদ পেরিয়ে স্পীডবোটে রওনা হলাম। সবচেয়ে দুস্তর যাত্রাটি ছিল 'নাক-ঠেকা' পাহাড়গুলো অতিক্রম করা (পা পিছলে পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই!)। ঘন জঙ্গলাকীর্ণ সরু পথে বুনো হাতির সদ্য নিঃসৃত বিষ্ঠা দেখা গেল কোনো কোনো স্থানে, কিন্তু ভাগ্যিস তাদের দেখা মেলেনি!' তিনি আরো লিখেন, 'অস্তগামী সূর্যের আলোয় সরু উপত্যকাভূমিতে পৌঁছে ভ্রমণের দারুণ ক্লান্তির মধ্যেও এক অনির্বচনীয় আনন্দে মন ভরে উঠল! অনুভূতিটুকু এমন যেন কোনো দুর্গম গিরিচূড়া জয় করেছি।'

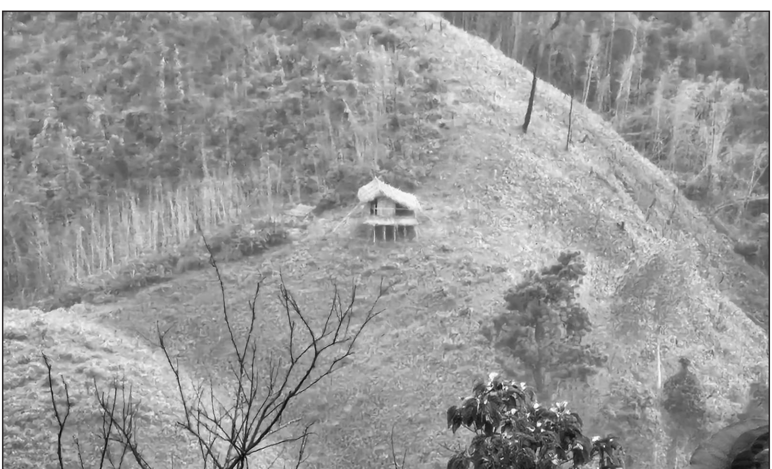

জুমলেন্সে জুমঘর

সেখানে অবস্থিত সীমান্ত রক্ষী (ইপিআর) ক্যাম্পের প্রধানসহ লুসাই নরনারীরা আমাদের উষ্ণ সম্বর্ধনা জানালেন। রাতে লুসাই তরুণ-তরুণীরা গিটার সহযোগে তাদের ঐতিহ্যবাহী বাঁশ-নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশন করল। ওখানকার হেডম্যান ছিল এক যুবক, মিশনারি শিক্ষার কল্যাণে কিছুটা ইংরেজি জানত। তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় পরিস্থিতি ও সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা হলো। পরদিন সকালে দেহমনের সব ক্লান্তি মুছে গেল। আমরা ষষ্টি হস্তে পর্বতপৃষ্ঠে অবস্থিত লুসাই জনপদগুলোর অবস্থা পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনধারনের প্রধান অবলম্বন ছিল 'জুম' চাষ। এতদ্ব্যতীত, ৫০/৬০ বছর আগে খ্রিস্টান মিশনারিরা ঐ পাহাড়গুলোতে ব্যাপক কমলালেবুর চাষ শুরু করেছিলেন। কমলার বাগানগুলো ছিল লুসাইদের নগদ আর্থিক আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবত যত্নের অভাবে বেশ কয়েকটি বাগান উর্বরতা হারিয়ে ফেলছিল। তাছাড়া উৎপাদিত ফসল বাজারজাতকরণের সমস্যাটিও লুসাই জনগোষ্ঠীর আর্থিক দুর্গতির অন্যতম মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'
যেটুকু বুঝা যাচ্ছে মারিশ্যা থেকে স্পীড বোটে কাসালং ছড়া ধরে বাঘাইহাট পয়েন্ট পার হয়ে কোথাও তাঁরা স্পীড বোট ছেড়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে সাজেক উপত্যকার উপরে উঠে যান। দীঘিনালা থেকে এখন বাঘাইহাট হয়ে সাজেক পর্যন্ত সড়ক চলে গিয়েছে। আর বাঘাইহাট থেকে মারিশ্যা পর্যন্ত আরেকটি সড়ক এখন বর্তমান। তখন তার কোনোটিই ছিল না।

সুলতান-উজ জামান এর এডিসি ছিলেন সিদ্দিকুর রহমান যিনি ১৯৬৪-৬৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক পদে নিয়োজিত হন এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনিও ডিসির সাথে সাজেক ভ্যালি সফর নিয়ে তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনতরীর যাত্রী'তে লিখেছেন, 'কিছুদিন পর ডিসির কাছে সাজেক ভ্যালি সফর করার প্রস্তাব করলাম। সাজেক লুসাই পাহাড়ের সঙ্গে লাগানো একটা পাহাড়ের ভ্যালি- প্রায় দুই-আড়াই হাজার ফুট উঁচু। ওই সমস্ত অঞ্চলে এককালে দুর্ধর্ষ বলে পরিচিত কুকি ও লুসাই উপত্যকার উপজাতিদের বাস। কাসালং উপত্যকা পার হয়ে যেতে হয়, বাঘ-ভল্লুক, হাতি, হরিণ নানারকম জীবজন্তুতে ভরা এই এলাকা। তাই এই অঞ্চলে প্রশাসন বা সাধারণ মানুষের যাতায়াত খুবই কম। ব্রিটিশ আমলের ডাকসাইটে কর্নেল-মেজর ডিসিরাও খুব কমই গেছেন। শুনেছি নিবলেট সাহেব নাকি গিয়েছিলেন অনেক আগে। সুলতান-উজ জামান সাহেব রাজি হয়ে গেলেন - সব কিছু জোগাড়যন্ত্র করে একদিন রওনা হয়ে গেলাম একটা ছাদ দেওয়া স্পীডবোটে, ডিসি আমি আর একজন স্টাফ; ডাগ আউটে এসিস্ট্যান্ট রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার (এআরও) এবং অন্যান্য স্টাফ।'

মারিশ্যা পৌঁছুতে পৌঁছুতেই প্রায় বিকেল– খাওয়া দাওয়া করে গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পাহাড়ি নদীতে রওনা হলাম কাসালং ফরেস্টের মাঝামাঝি। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে গেল। দু'ধার থেকে এখানে সেখানে গাছপালা

হেলিপ্যাডের পাশে রাতের স্ন্যাক্স

বেরিয়ে এসেছে সেই খালের মধ্যে। মাঝে মাঝে আবার নিচে ছোট-বড় পাথর। নিচের পাথরের থেকে বাঁচতে গেলে ওপরের ডালপালায় লাগে। একবার পাথরে লেগে স্পীডবোটের ব্লেড ভেঙে গেল, আরেকবার হঠাৎ এক মোটা গাছের ডাল এসে বোটের চাল দিলো ভেঙে। সে এক অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু তবু আমরা এগিয়ে চলেছি আস্তে আস্তে। কিন্তু সামনেইতো হাতির কুম-খালটা সেখানে বেশ প্রশস্ত একটা বিলের মতো, হাতিরা সেখানে দল বেঁধে গোসল করতে নামে। যদি কুমে হাতি থাকে, তাহলে যে কি হবে তা চিন্তাই করতে পারি না।' মারিশ্যা পর্যন্ত এখনো, বিশেষ করে বর্ষাকালে খোলা পানি থেকে। এরপর কাসালং খাল ধরে উজানে যেতে হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে বা গভীর রাতে এই সরু খালে ষাট বছর আগের ভ্রমণি নিশ্চিতই ছিল এক অ্যাডভেঞ্চার।

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান আরো উল্লেখ করেন 'পরদিন সকালে শুরু হলো সেই গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমাদের পাহাড়ে উঠার যাত্রা। প্রায় দুই হাজার ফুট উপরে আমাদের গন্তব্যস্থল। কোথা থেকে হাতি, বাঘ বেরিয়ে আসবে কে জানে - দল বেঁধে আমরা চলেছি। শেষের পাঁচ-সাতশো ফুট ওঠা ছিল একটা অসাধ্য ব্যাপার। একদম নাক খাড়া পাহাড় - তাও বড় বড় পাথরে ভর্তি। এক পা এক পা করে এগোনো, পাথরের পর পাথর, কখন পা ফসকে পরে যাব, কে জানে - তখন বোধহয় শ দুয়েক ফুট উঠতে বাকি, ঘামতে ঘামতে শরীরের সমস্ত শক্তি চলে গেছে, ডিহাইড্রেশন হয়ে সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে যাবে। এমন সময় দেখি, এলুমিনিয়ামের জগ হাতে করে ইপিআরের (এখনকার বিজিবি) জওয়ানরা পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসছে

- পথের মধ্যে আমাদের লবণপানি খাইয়ে উপরে নিয়ে গেল।' তখনকার অনুভূতি তিনি উল্লেখ করেছেন এভাবে যে 'চূড়ার উপর পা রেখে যখন দাঁড়ালাম, সে যে কি আনন্দ-অপরূপ সৌন্দর্য - ঢেউয়ের পর ঢেউ পাহাড়।' তিনি বলেন, 'আমরা তিনদিন ছিলাম সাজেক ভ্যালিতে। আসলে এটা পাহাড়ের ওপরে অনেকটা মালভূমির মতো, তিনটা পাড়া মিলে এই গ্রাম। এরা সবাই খ্রিস্টান, গিটার বাজিয়ে গান গায়। একটা ছোট প্রাইমারি স্কুল আছে, একট ছোট্ট চার্চ আছে, কাপড়চোপড়ে পুরুষরা অনেকটা পশ্চিমা ভাবাপন্ন - মিশনারিদের কৃপায় - মেয়েদের কাপড় চোপড় রংবেরঙের উজ্জ্বল, এরা দুলে দুলে গান গায়, সমবেত সংগীত। এই প্রথম এদের চমৎকার বাঁশের নাচ দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম।'

এবারে আমরা যখন সাজেকে তখন তেমনই মুগ্ধ হলাম ঢেউ এর পরে ঢেউ এর মতো পাহাড় দেখে। বর্ষার সাজেকের আকর্ষণ পাহাড়সারির মাঝে আটকে যাওয়া ভাসমান মেঘমালা। সকালে আমাদের ভিলার দু'পাশেই সাদা মেঘের ভেলা দেখতে পেলাম। বেলা উঠার সঙ্গে মেঘেদের আড়মোড়া ভাঙা আর এদিক সেদিক ঘোরাফেরা শুরু হলো। সাজেক রিজ পেরিয়েও পশ্চিমের মেঘ পূর্বে আর পূর্বের মেঘ পশ্চিমে যাচ্ছিল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল মুহূর্তে মুহূর্তে দৃশ্যের বদল, সেলফোনের ক্যামেরা সে অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের আর কতটুকুই বা ধরতে পারে! সকালের নাস্তা শেষ করতে করতেই ফিরে আসার সময় হয়ে আসছিল। সমায়াভাবে আমরা রুইলুই পাড়ার স্থানীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারি নাই বা কংলাক পাড়ায়ও সময় কাটাতে পারি নাই। তবে এটুকু অনুধাবন করতে পারছিলাম যে নিস্তব্ধতা আর নিঃশব্দে প্রকৃতি উপভোগের জন্য একসময় সাজেক নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু একরাতের বাণিজ্যিক প্যাকেজ ট্যুরের পাল্লায় পরে রিসোর্ট আকীর্ণ সাজেকের সৌন্দর্য এখন বিলীনপ্রায়। সপ্তাহান্তের তিন হাজার ভ্রামণিকের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ওয়ান টাইম প্লাস্টিক বর্জ্যের নিয়ন্ত্রণ আর টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা না গেলে সাজেককে বাঁচানো কঠিন হয়ে যাবে। সেনা নিয়ন্ত্রিত সময় অনুসরণে সকাল দশটায় এসকর্ট প্রহরার কনভয়ে আবার ফিরতি যাত্রা। যাতায়াতে সবুজ প্রকৃতি, পাহাড়ি ঢেউ খেলানো পথ আর বিশুদ্ধ অক্সিজেন ছাড়াও যা ভালো লেগেছে তা' হলো রাস্তার দুইপাশের শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত হাত নাড়িয়ে শুভেচ্ছা জানানো। ঘরের দরজায়, আঙিনায়, রাস্তার পাশ থেকে ছোট বড় শিশুদের নিষ্পাপ হাসি আর আবাহনে মন ভরে যায়। তবে আমরা যদি দায়িত্বপূর্ণ ভ্রমণ নিশ্চিত না করতে পারি তাহলে আরো অনেক ভ্রমণ আকর্ষণের মতো সাজেকের অপমৃত্যু কেবল সময়ের ব্যাপার।

দ্বীপ কুতুবদিয়া

ডি.এম. ফিরোজ শাহ্

যারা বিসিএস বা অন্য কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়েছেন, তাদের একটি প্রশ্ন মুখস্থ করতে হয়েছে -'দেশের প্রথম বাতিঘর কোথায় অবস্থিত?' – কুতুবদিয়া দ্বীপে, যেটি কক্সবাজার জেলার একটি দ্বীপ ও উপজেলা।

কুতুবদিয়া দ্বীপ আমার কাছে ভিন্ন কারণে বেশি পরিচিতি পায়। আমাদের একজন ব্যাচমেট যার নাম মোহা. আকতার হোসাইন কুতুবী। এই 'কুতুবী' নামটি সে ধারণ করেছে দ্বীপে জন্মগ্রহণ করায়। যতদূর জানা যায়, এই দ্বীপের একটি অংশের মানুষ তাদের নামের শেষে কুতুবী অংশটি যোগ করেন।

অনেক দিনের শখ কুতুবদিয়া দ্বীপ ভ্রমণে যাবো। কিন্তু সময় সুযোগ হয়ে ওঠে না। ২০২২ সালে দাপ্তরিক কাজে কক্সবাজার গিয়ে কুতুবদিয়ার অধিবাসী

কয়েকজনকে পাই। পরবর্তীতে বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল কুতুবদিয়ার অধ্যক্ষ নেয়ামুল এর সাথে পরিচয় হবার পর আশার আলো এসে ধরা দেয়।

কোনো স্থানে ভ্রমণে গেলে যদি স্থানীয় কাউকে পাওয়া যায় তাহলে ভ্রমণ সহজ হয়ে যায়। বহিঃপরীক্ষক হলাম কক্সবাজারের টিটি কলেজে এবং ভ্রমণসঙ্গী করলাম ড. মুজিবকে। দু'জনে এর আগে একসাথে অনেকবার ভ্রমণ করেছি। তার সাথে ভ্রমণের ভালো দিক হলো উভয়ে উভয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নেই এবং যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকি। ১৪ জুলাই ২০২৪ রাতে ইমপেরিয়াল এক্সপ্রেসের স্লিপিং এসি বাসে চড়ে কক্সবাজার রওনা হলাম। কুঠুরির মতো স্লিপিং সীট। দোতলায় কেনা সীটে টানটান হয়ে শুয়ে হেলে-দুলে-ঘুমিয়ে- জেগে ভোর প্রায় পাঁচটায় কক্সবাজারের ডলফিন মোড়ে নেমে গেলাম। বাস চলে গেল টেকনাফে।

আমাদের গন্তব্য সুগন্ধা পয়েন্টের কোরাল রীফ হোটেল। ভোরের স্নিগ্ধতায় ভিজে আমি হেঁটে যেতে চাইলেও অটোওয়ালার বারংবার অনুরোধে এবং বন্ধু মুজিবের ইচ্ছায় তাতে চড়তেই হলো। হোটেল রুমে ব্যাগ রেখে ফজরের সালাত আদায় করে সোজা চলে গেলাম সী বীচে। সূর্য তখনও ওঠেনি। জোয়ার আসছে, আসছে পর্যটকরাও।

আমরা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে হোটেলে ফিরে তৈরি হলাম। বিকেল পর্যন্ত দাপ্তরিক কাজ শেষ করে ঘুরতে গেলাম পাশেই খুরুস্কুল ইউনিয়নের আশ্রয়ন প্রকল্পে। এখানে প্রায় ২৫০ টির মতো বহুতল ভবন রয়েছে তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য যারা কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বাঁকখালী নদী পার হয়ে সামনে গেলেই এই প্রকল্প।

ঘোরাঘুরি ও রাতের খাবার শেষ করে শোবার আগে আরেকবার গেলাম সমুদ্র তীরে। রাত বারোটার মতো বাজে, সী বীচে তখনও অনেক ভ্রমণচারী নিশিত সমুদ্র দর্শন নিষ্পন্ন করছে। আমারা দেখলাম অন্য এক সমুদ্রকে। নিশির অন্ধকারকে হালকা করে দিচ্ছে চাঁদের মৃদু আলো। আকাশে কালো মেঘ, নিচে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে 'ধবল ক্ষীর' বিস্ফোরিত করে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে, সাথে একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজ। সে এক ঐশ্বরিক মুহূর্ত! কেউ যদি সমুদ্রের প্রকৃতরূপ দেখতে চায় তাহলে এরূপ যৌবতি নিশিতে নিঃশব্দে নিরবে সমুদ্রতীরে দীর্ঘসময় বসে থাকতে হবে।

১৬ জুলাই সকালে ঘুম ভাঙলো একটু দেরি করে। গত দুদিনের দৌঁড়ঝাপে শরীর কিছুটা ক্লান্ত। সকালের সী বীচ গমন বাদ দিলাম। ফ্রেশ হয়ে নাস্তা খেয়ে সাড়ে আটটার দিকে হোটেল কোরাল রীফ থেকে যাত্রা করলাম কক্সবাজার বাস টার্মিনালের দিকে, সাথী নূর মোহাম্মদ, সে মালিক ভক্ত একজন অত্যন্ত ভালো মানুষ। কক্সবাজারে এসে একাধিকবার তার সান্নিধ্য পেয়েছি।

চট্টগ্রামগামী পূরবী পরিবহণের একটি গাড়িতে দুজন চড়ে বসলাম। হাল্কা বৃষ্টি হলো। আমরা এ গাড়িতে যাবো চকরিয়া পর্যন্ত। ওখানে তৌহিদ ও মোবারক থাকবে

কুতুবদিয়া চ্যানেলে নৌকা পারাপার

মোটরসাইকেল নিয়ে। ওরা আমাদের পৌঁছে দিবে পেকুয়া উপজেলার মগনামা ঘাটে, ওপারে কুতুবদিয়া দ্বীপ। সেখানে আমাদের স্বাগত জানাবে নেয়ামুল।

গাড়ি এগিয়ে চলল চকরিয়ার দিকে। কিন্তু রাতের মতো গতি নেই। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নাইটকোচ ঢুকছে কক্সবাজারে। এছাড়া রাস্তায় অনেক লোকাল গাড়িও রয়েছে।

সকাল দশটার দিকে চকরিয়ার এস আলমের পুরাতন কাউন্টারে নেমে গেলাম। তৌহিদ, মোবারক ও ওদের এক বন্ধু দাঁড়িয়ে ২টি মোটরসাইকেল নিয়ে। অনেক বড় ও ব্যস্ত বাজার চকরিয়া। আমরা সময় নষ্ট না করে দুটো মোটরসাইকেলের পিছনে দুজন চড়ে বসলাম। আমাদের গন্তব্য উত্তর-পশ্চিম দিকে। প্রথমে উপজেলার সরু সড়ক পেরিয়ে গ্রামীণ বড় রাস্তায় উঠলাম।

রৌদ্রোজ্জ্বল চমৎকার দিন। নীলাকাশে মেঘের ওড়াওড়ি। হঠাৎ একটি নদীর ওপর ব্রিজ পাওয়ায় ব্রিজে নেমে গেলাম ছবি তুলতে। এটি মাতামুহুরী নদী। পাহাড়ি নদী, তাই এখন পানি কম থাকলেও বৃষ্টির পর এটি খরস্রোতা হয়ে যায়। পেকুয়ার দিকে এরপাশে ডান দিকে নদীটি দুভাগে বিভক্ত। পাড়েই রয়েছে একটি শতবর্ষী মসজিদ। এদিক ওদিক ভাঙলেও মসজিদটি অক্ষত রয়েছে।

আমরা এগিয়ে চললাম পেকুয়ার দিকে। একটু পর চৌমুহনী এলাকায় এসে বিরতি দিলাম। এখানে চৌমুহনী মানে চার রাস্তার মোড় বা সংযোগস্থল। এখান থেকে চকরিয়া, বাঁশখালী, মগনামা এবং মাতারবাড়ি যাওয়া যায়। এলাকাটি পেকুয়া উপজেলায় অবস্থিত। আবারো চা-সিংগারা খেয়ে ফ্রেশ হলাম। এ সময় এক টেকনিক্যাল সমস্যা

দেখা দিলো আমার মোবাইল ফোনে। কোথাও চাপ পড়ে মোবাইল ফোনের Talk back চালু হয়ে গেছে, কোনোভাবেই তা বন্ধ করতে পারছিলাম না। সকলের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় পাশেই একটি মোবাইল সার্ভিস সেন্টারে গেলাম। সে আমাদের আড়াল করে কাজটি দ্রুত করে দিলো। কিন্তু সমাধানের স্থায়ী রাস্তা বলল না। তবুও তাকে ধন্যবাদ দিয়ে কুতুবদিয়ার দিকে রওনা হলাম।

এই রাস্তাটি সদ্য মেরামত করা এবং দৃষ্টিনন্দন। রাস্তার ডানে একটি সরুখাল রাস্তা বরাবর চলেছে অনেকদূর। তার ওপর একটি সদ্য নির্মিত ব্রিজ লাল-সাদা রং করা যা দূর থেকেই দেখা যায়। আমাদের রাস্তায় একটি জোয়ার-ভাঁটার খালের উপর ব্রিজ পড়ল। এলাকাটির নাম বাইন্যাঘোনা। একটু এগুতে রাস্তার বাম পাশে একটি সাইনবোর্ড নজরে এলো তাতে এটি প্রাইমারি স্কুলের নাম, ঠিকানা ও দূরত্ব দেওয়া আছে। সাইনবোর্ড থেকে ২টি স্কুলের নাম উদ্ধার করা গেল। একটি পূর্ব উজানটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং অন্যটি মধ্যম উজানটিয়া ভেলুয়ারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তৃতীয়টির নাম উদ্ধার করা গেল না। আমারা আরো কিছু পথ সামনে এগুতে বামে মোড় নিলাম। এলাকাটির নাম পূর্ব মগনামা।

আরো সামনে এগুতে চোখে পড়ল একটি সিএনজি রাস্তায় দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে, তবে মারাত্মক নয়। যাত্রীরা আহত হয়নি, সিএনজির উইন্ডশিল্ড ভেঙে গেছে। বর্তমানে দেশব্যাপি চলছে সিএনজি আর অটোর দৌরাত্ম্য। এগুলোর চালকদের

কুতুবদিয়া দ্বীপে

কোনো লাইসেন্স নেই, নেই ভালো প্রশিক্ষণ। এছাড়াও অধিকাংশ চালক কম বয়সী হওয়ায় রাস্তায় গাড়ি নিয়ে নামলে একটা থ্রিল অনুভব করে। ফলে ঘটে দুর্ঘটনা।

পূর্ব মগনামা মোড় থেকে একটু সামনে এগুতে এক নয়ন জুড়ানো দৃশ্য চোখে পড়ল। দুদিকে জলাশয়ের মাঝ দিয়ে পীচঢালা পথ। নীলাকাশে সাদা মেঘ। ঝিরি ঝিরি বাতাস। এখানে কথা হলো লবণ শ্রমিকদের সাথে। রাস্তার পাশে ট্রাক দাঁড় করিয়ে ডিঙি নৌকায় করে পাশের গ্রাম থেকে কাঁচা লবণ এনে বাঁশ দিয়ে বানানো ঠুকরি দিয়ে ট্রাকে লবণ তুলছে। প্রতিমণ কাঁচা লবণ বিক্রি হচ্ছে ৪৫০ টাকায়, অর্থাৎ প্রতি সের ১১.২৫ টাকা। আমরা প্রতি কেজি তথাকথিত আয়োডিনযুক্ত লবণ কিনি ৪০ টাকায়। এই হলো ব্যবসা! তবে লবণের দাম কম থাকলে কৃষকরা মাঠেই বিশেষ কায়দায় গর্ত করে লবণ সংরক্ষণ করে।

বেলা প্রায় ১০ টা নাগাদ আমরা মগনামা ঘাটে পৌঁছে গেলাম। এখানে পুরো চ্যানেল জুড়ে একটি বেড়িবাঁধ রয়েছে। এখান থেকে বাস চট্টগ্রাম ও ঢাকা যায়। এছাড়া সিএনজি যায় চকরিয়া ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত। মোটরসাইকেল নিয়েই আমরা জেটিতে পৌঁছালাম। এটি কুতুবদিয়া চ্যানেল। এই চ্যানেল দিয়ে মহেশখালী-মাতারবাড়ী-বাঁশখালী হয়ে চট্টগ্রাম যাতায়াত করা যায়।

জেটিতে দাঁড়িয়ে চারদিকটা ভালো করে দেখলাম। এখান থেকে স্পীডবোট ও বড়/গাম বোটে কুতুবদিয়ার ৫টি ঘাটে যাওয়া-আসা যায়। এগুলো হলো- আলি আকবর ঘাট, বড়ঘোপঘাট, দরবারঘাট, ধুরংঘাট ও আকবর বলির ঘাট। আমাদের যেতে হবে বড়ঘোপ ঘাটে। যেটা সবচেয়ে কাছে। আমরা ভিডিও করা ও ছবি তোলায় ব্যস্ত থাকায় একটি স্পীডবোট মিস করলাম। এর মাঝে দেখে নিলাম চারপাশটা। জেটিতে দাঁড়ালে সামনেই, ওপাড়ে দেখা যায় কুতুবদিয়া দ্বীপ। এই চ্যানেলের প্রস্থ আনুমানিক ৪/৫ কিলোমিটার হবে যা আমরা পদ্মার দক্ষিণপাড়ের মানুষ সচরাচর পার হই। অথচ যাদের সাথেই কুতুবদিয়া যাওয়ার কথা বলেছি তারাই ভয় দেখিয়েছে চ্যানেল পারাপারে। এর চেয়ে কক্সবাজারে থেকে মহেশখালী যাওয়া অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। সেখানে বাঁকখালী নদীর চ্যানেল পার হলে অনেকপথ মূল সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

মগনামা জেটিতে দাঁড়িয়ে ডানে তাকালে দূরে দেখা যায় বাঁশখালী কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনি। বাঁ-দিকে কাছেই রয়েছে শেখ রাসেল সাইবার ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন এবং এরপরেই মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্র।

আমরা একটি বড় গাম বোটে করে চ্যানেল পার হলাম। কোনো ঝড় বাতাস নেই, তবে মাঝ চ্যানেলে ব্যাপক দোলানি লাগল। স্থানীয় যারা সচরাচর পারাপার হন, ছেলে-বুড়া নারী-শিশু কেউ কিছুই মনে করল না। মেয়েদের বসার স্থান বোটের মাঝ বরাবর খোলের মধ্যে। ছেলেরা সামনে ও পিছনে। আমি সামনে বসলাম, ড. মুজিব পিছনে। এতে দুজনে দুজনার ছবি তুলতে পারলাম। প্রায় ৪০/৪৫ মিনিটের মধ্যেই

বোট বড়ঘোপ ঘাটে ভিড়ল, ভাড়া জনপ্রতি ৪০/- । জেটিতে হোস্ট নেয়ামুল আমাদের স্বাগত জানাল।

একটি অটোতে চেপে চলে গেলাম জেলা পরিষদের ডাক বাংলোতে। এখানে দোতলায় একটাই ভালো রুম, নিচে মার্কেট। স্থানটি বাজারের মাঝে অবস্থিত। আমি ফ্রেশ হয়ে নেয়ামুলের সাথে ওর স্কুলে গেলাম। বন্ধু মুজিব রুমে বিশ্রামে রইল।

থানা আর উপজেলা কমপ্লেক্স পাশাপাশি। উপজেলা চত্বরে সকল সরকারি অফিস একসাথে। ওখানেই বিয়াম মডেল স্কুল। এটি প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত। সামনে অফিসার্স ক্লাব ও প্রেস ক্লাব। অফিসার্স ক্লাবে বসে ওর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে মত বিনিময় করলাম। ডাকবাংলোতে ফেরার সময় ঝুম বৃষ্টি এলো। কিছুটা ভিজে চলে গেলাম ডাকবাংলোতে।

নেয়ামুল বাড়ি গেল থেকে খাবার আনতে। ও হোস্ট, বাড়ি থেকে রান্না করা খাবার নিয়ে আসবে। এদিকে ক্ষিদেয় পেট চো চো করছে। বিকেল ৩টা নাগাদ খাবার নিয়ে ঢুকল নেয়ামুল। আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম খাবারের ওপর। এখন দেশব্যাপি মাছ ধরা বন্ধ। তবে কুতুবদিয়া দ্বীপের আশেপাশে প্রচুর লইট্যা মাছ পাওয়া যায়। লইট্যা ভাজা, কোরাল মাছসহ আরো পদের সামুদ্রিক মাছ, করল্লা ভাজি ও মুরগি দিয়ে ভোজ সারলাম। বিকেল ৪টায় কুতুবদিয়া দ্বীপ ঘুরতে বের হবো বলে পরিকল্পনা করলাম।

দীর্ঘদিন ধরে কুতুবদিয়া দ্বীপের ভূগঠন প্রক্রিয়া শুরু হলেও এ দ্বীপ সমুদ্র বক্ষ থেকে জেগে উঠে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ধারণা করা হয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ দ্বীপে মানুষের পদচারণা ও মানুষের বসবাস শুরু হয়। হজরত কুতুবুদ্দীন নামে এক কামেল ব্যক্তি আলী আকবর, আলী ফকির, এক হাতিয়াসহ কিছু সঙ্গী নিয়ে মগ-পর্তুগিজদের বিতাড়িত করে এই দ্বীপে আস্তানা স্থাপন করেন। অন্যদিকে আরাকান থেকে পলায়নরত মুসলমানেরা চট্টগ্রামের আশেপাশের অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষণে এই দ্বীপে আসতে থাকে।

এক জরিপে দেখা যায়, পার্শ্ববর্তী আনোয়ারা, বাঁশখালী, সাতকানিয়া, পটিয়া, চকরিয়া অঞ্চল থেকে অধিকাংশ মানুষের আগমন, যারা এ দ্বীপের আদিপুরুষ। মুসলমানগণ কামেল পির হজরত কুতুবুদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধাভরে তাঁর নামানুসারে এ দ্বীপের নামকরণ করেন 'কুতুবুদ্দীনের দিয়া', যা পরবর্তীতে হয়ে 'কুতুবদিয়া' নামে স্বীকৃতি লাভ করে। দ্বীপকে স্থানীয়ভাবে 'দিয়া' বা 'ডিয়া' বলা হয়। এই দ্বীপের প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ হলেন- হজরত কুতুবউদ্দিন (রহ., যার নামে কুতুবদিয়া দ্বীপের নামকরণ), হজরত আলী আকবর (রহ.), হজরত আলী ফকির (রহ.) ও হজরত শাহ আবদুল মালেক আল-কুতুবী (রহ.) প্রমুখজন।

বিকেল ৪ টায় একটি অটো নিয়ে চললাম দক্ষিণ ধুরং ইউনিয়নের দিকে। এখানে দ্বীপের উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একটি প্রধান সড়ক রয়েছে যার নাম আজম খান রোড।

লে. জেনারেল মুহাম্মদ আজম খান (১৯০৯-১৯৯৬) ছিলেম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। ২৮ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে তিনি পাকিস্তানের ক্যু গঠনে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে সহায়তা করেন। এর বিনিময়ে তিনি আইয়ুব খানের মন্ত্রী পরিষদের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ক মন্ত্রীর দায়িত্ব পান।

আইয়ুব খান ১৯৬০ সালের ১৪ এপ্রিল লে. জে. মুহাম্মদ আজম খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেন। আজম খান দ্রুতই বাঙালিদের মন জয় করেন। ১৯৬১ সালের অক্টোবরে চট্টগ্রামে ২ বার প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। এ সময়ে আজম খান মানুষের দুর্দশা লাঘবে ও পুনর্বাসনে ব্যাপক কাজ করে মানুষের মন জয় করেন। তিনি কুতুবদিয়া ভ্রমণ করেন এবং দ্বীপের উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একটি পাকা রাস্তা নির্মাণের ঘোষণা দেন। সেই থেকে কুতুবদিয়া দ্বীপের প্রধান সড়কের নাম ‘আজম খান রোড’।

কুতুবদিয়া দ্বীপের আইকোনিক স্থাপনা ‘কুতুবদিয়া বাতিঘর’ দেখতে দক্ষিণ ধুরং গেলাম। রাস্তা খুবই চাপা, দুপাশে বস্তির মতো বাড়িঘর। বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তায় কাদাপানি জমে আছে।

আমরা ৪ জন বাতিঘর এলাকায় প্রবেশ করলাম। মূল বাতিঘর সমুদ্রের মাঝে বিলীন হয়ে গেছে, যেটি ২/৩ কিমি দূরে ছিল। এখানে বর্তমানে ২টি বাতিঘর নির্মিত হচ্ছে। প্রথম বাতিঘর নির্মিত হয়েছিল ১৮৫০ সালের দিকে যা সমুদ্রের প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূর থেকে দেখা যেত।

বাতিঘর দিয়ে বীচে যাবার একটি ছোট গেট রয়েছে। গেটটি তালাবদ্ধ। চাবি কার কাছে কেউ বলছে না। খুব হতাশ হয়ে যখন ফিরব ভাবছি, তখন বিদ্যুৎ বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তা এলেন পরিদর্শনে, গেটের চাবি পাওয়া গেল। আমরা দ্রুত চলে গেলাম বাতিঘর বীচে।

এখানে একটি বেড়িবাঁধ রয়েছে। বাঁধ থেকে নামলেই বিশাল সী বীচ। বীচটি অনেক দীর্ঘ ও প্রশস্ত। মুগ্ধ হয়ে গেলাম এর সৌন্দর্যে। এটি কক্সবাজারের চেয়েও অনেক সুন্দর মনে হলো।

বেলা পড়ে এসেছে। রাঙা আকাশে খণ্ডিত কালো কালো মেঘ। নিচে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে বেলাভূমিতে। দূরে নোঙর করা জাহাজগুলোর বাতি আস্তে আস্তে জ্বলে উঠছে। বীচের কাছাকাছি মাছ ধরা কিছু ট্রলার বিক্ষিপ্তভাবে নোঙর করা। আবীরে রাঙা আকাশ, এমনি এক মায়াবী পরিবেশ দেখে মনে হলো এখানে থেকে যাই অনন্তকালের জন্য।

নেয়ামুল মনে করিয়ে দিল সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, অনেক দূর যেতে হবে। আমরা এবার হাজির হলাম পূর্ব ধুরং ইউনিয়নে যেখানে হজরত মালেক শাহ (র.) এর মাজার রয়েছে। আমরা মালেক শাহ (রহ.) এর মাজারে গেলাম। মাজার এলাকার

ও ভিতরের পরিবেশ মোটেও ইমপ্রেসড করল না। একপাক ঘুরে সামনে এগিয়ে গেলাম। কৈয়ারবিল ও লেমশিখালী ইউনিয়নকে যুক্ত করেছে একটি ব্রিজ। আমরা ব্রিজে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে ছবি তুললাম। কৈয়ারবিল একদা কৈ মাছ পাওয়া যেত, এজন্য এর নাম হয়েছে কৈয়ারবিল। এখানে কিছু খোলা জমিন আছে যেখানে লবণ ও মাছ চাষ করা হয়। রাস্তায় চোখে পড়ল ভ্যানে করে লইট্যা মাছ বিক্রি করা হচ্ছে, প্রতি কেজি মাত্র ৪০/-টাকা।

সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, আমরা দ্রুত বড়ঘোপ সমুদ্র বীচে গেলাম। বাজারের শেষে একটি ছোট পার্ক, এরপর ঝাউগাছের সারি, তারপর বীচ। এই বীচটিও খুব সুন্দর। বাজারের কাছে বলেই এখানে লোক সমাগম বেশি। তবে পর্যটক নেই বললেই চলে। পর্যটক কেন্দ্র হিসেবে কুতুবদিয়ার কোনো পরিচিতি নেই, যা আছে তা ভীতি। এখানে কিছুক্ষণ হেঁটে শারীরিক ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

বড়ঘোপ বীচের পাশেই রয়েছে কুতুবদিয়ার একমাত্র মানসম্মত হোটেল সমুদ্রবিলাস। বীচের পাশেই আরো ২টি সরকারি প্রতিষ্ঠান মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র, সামুদ্রিক কচ্ছপ প্রজনন কেন্দ্র রয়েছে কিন্তু সময়াভাবে সেখানে যাওয়া সম্ভব হলো না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত নেমে এলেও আমাদের ভ্রমণ শেষ হলো না। এবার যাত্রা করলাম দ্বীপের সর্বদক্ষিণের ইউনিয়ন আলী আকবর-এ, এখানে রয়েছে বাংলাদেশের প্রথম সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র, যদিও এটি বর্তমানে বন্ধ। যাবার পথে রাস্তায় অনেক হোটেল চোখে পড়ল যেখানে পরোটা ভাজা হচ্ছে, সাথে অনেক কাস্টমার। নেয়ামূল জানাল বর্তমানে মাছ ধরা বন্ধ থাকায় জেলেরা অলস সময় কাটাচ্ছে হোটেলে, আর বসে বসে পরোটা খাচ্ছে বাকিতে। পরে মাছ বিক্রি করে বাকির টাকা শোধ করা হবে, এমনই চুক্তি উভয়ের মধ্যে। ওদের নির্ভার হাসিমুখে পরাটা খাওয়া দেখে মনে হলো, এইতো আসল জীবন!

আলী আকবর-এ বেড়িবাঁধের চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মোবাইলের টর্চে দূরে ২/১ টা পাখা দেখেই তৃপ্ত থাকতে হলো। বেড়িবাঁধের ঢালে পা ছড়িয়ে বসে এখানের একমাত্র দোকানের লাল চা পান করলাম, সাথে বাদাম ভাজা। মুক্ত প্রাঙ্গণ, হালকা বাতাস, আকাশ জুড়ে অবারিত তারার মেলা, দূরে সমুদ্রের গর্জন-এ যেন এক অপার্থিব পরিবেশ! মনে হলো অনন্তকাল বসে থাকি এখানে। ডিনারের হোস্ট কামরুল ইসলাম তাড়া দিল, বাজারে ওদের খাবার হোটেল আছে, নিউ মদিনা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট। রাত ৯ টার পর হোটেলে খেতে গেলাম ।

খেতে যাবার আগেই আগে ঢাকা থেকে খবর পেলাম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সহিংস রূপ নিয়েছে। রংপুরে আবু সাইদসহ কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়েছে। উত্তাল সারাদেশ। রাস্তাঘাট বন্ধ, ঢাকা চট্টগ্রাম রোডে শত কিলোমিটার জ্যাম।

তাহলে ঢাকা ফিরব কীভাবে?

মেঘনাঘাটের জেটিতে আমি

দু বন্ধু মিলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম চট্টগ্রাম থেকে ফ্লাইটে ঢাকা যাবো। কুতুবদিয়া দ্বীপ থেকে চট্টগ্রাম যেতে কোনো সমস্যা হবে না। গুগুলে সার্চ করে বাংলাদেশ বিমানের টিকিট পেলাম, ৪২৫০/-টাকা প্রতিজন। কিন্তু অনেক কসরত করেও আমরা অনলাইনে টিকিট কাটতে ব্যর্থ হলাম। অতঃপর ট্রাভেল এজেন্ট দ্বারা ৪৫০০/-টাকা করে টিকিট নিয়ে নিলাম।

কামরুলের দাওয়াতে খাবারের এলাহিকাণ্ড। কিন্তু দেহ-মন ভালো না থাকায় এত সুস্বাদু খাবারও টানলো না। লইট্যা ভাজা, ছুরি মাছের ভর্তা, লইট্যার ঝোল, কোরাল মাছ, মুরগির রোস্ট, গরুর ভুনা ও আরো কয়েক পদের মাছ। কামরুল খুবই অমায়িক ও আন্তরিক। ভূরিভোজ শেষে ওকে ধন্যবাদ দিয়ে নেয়ামুলসহ ডাক বাংলোয় এলাম। প্রচণ্ড গরম। আমাদের প্ল্যান সকালের ট্রলারে কুতুবদিয়া চ্যানেল হয়ে চট্টগ্রামে ফিশারিঘাটে নামব। ট্রলার সকাল আটটায় ছাড়ার কথা থাকলেও পরে জানা গেল সকাল ৬টায় ছাড়বে। আমরা তাতেই রাজি হলাম।

রাতে নেয়ামুলকে বিদায় দিয়ে সাত সকালে শয্যা ছাড়ার প্রস্তুতি নিয়ে ঘুমাতে গেলাম। ঘুম ভালো হলো না। একটু পরপর উঠি আর মোবাইলে সময় দেখি। ফজরের আজান দিতেই নামাজ পড়ে চলে গেলাম বড়ঘোপ সী বীচে। আঁধার কাটেনি তখনও। ঝাউবনে দেখা হলো লাল কাঁকড়ার সাথে। একটু কাছে যেতেই ওরা ফুস্ করে গর্তে ঢুকে যায়। এক মায়াবী ভোরে সী বীচে কিছু মাছ ধরা লোকজন ছাড়া কেউ নেই। সমুদ্রের ঢেউ অবিরত আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে, কোনো অনন্তকাল থেকে এ চলা

শুরু হয়েছে কে জানে। আমরা সমুদ্রের এইরূপ দেখতে দেখতে বুড়া হয়ে গেলাম কিন্তু সমুদ্র যেন চিরযৌবনা।

সমুদ্রে পেনি জাল দিয়ে যারা মাছ ধরছে কিছু মানুষ। এরা জানে না যে কী এক সর্বনাশ করে যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। তারা পেনিজাল দিয়ে মূলত গলদা, বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণ করে। এগুলো খুবই সূক্ষ্ম। একটি চিংড়ির পোনা ধরতে অন্য প্রজাতির শতশত মাছ ধ্বংস করছে প্রতিনিয়ত। ১০০ গলদা চিংড়ি পোনার দাম মাত্র ৫৫ টাকা, অর্থাৎ একটির দাম ৫৫ পয়সা। এ সকল পোনা খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে পাঠানো হয় যেগুলো চিংড়ি ঘেরে চাষ করে বড় হলে বাজারে বিক্রি করা হয়।

নেয়ামুল এলো ভোর সাড়ে পাঁচটায় ডাকবাংলোয় চলে এলো। কিছু হোটেল খুলে কেবল চুলায় আগুন দিয়েছে। আমরা বড়ঘোপ ঘাটে গিয়ে নাস্তা খাওয়ার চিন্তা করে একটি অটোতে চড়লাম। ঘাটের কাছে আসতেই দূর থেকে ট্রলার দেখে ভালো লাগল। নেয়ামুল খোঁজখবর নিয়ে জানাল এটির চট্টগ্রাম যাওয়া অনিশ্চিত। কারণ এখান থেকে মালপত্র নিয়ে চট্টগ্রাম গেলেও ওদিক থেকে যদি পণ্য না পায় তাহলে আর্থিকভাবে তাদের পোষাবে না।

এ খবর শুনে একটা বড় ধরনের ধাক্কা খেলাম। অনেক দিনের একটি আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলো না। ঘাটে গিয়েও নিশ্চিত হওয়া গেল না, এটি আদৌ চট্টগ্রাম যাবে কি-না। এ সময় একটি খালি বোট দেখলাম মগনামা ঘাটে যাচ্ছে। ওকে ডাকতেই ভাড়া হাঁকালো জনপ্রতি ১০০/- টাকা, অথচ ভাড়া মাত্র ৪০/-টাকা। আর এখন সে এমনিতেই মগনামা ঘাট যাচ্ছে, তাই যা পায় তাতেই খুশি হবার কথা। কিন্তু ওর এককথা, জনপ্রতি ১০০ টাকা। ও বোট স্টার্ট করে রওনা হলো, অগত্যা ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে বোটে চড়লাম। এ হলো আমাদের চরিত্র, সুযোগ পেলেই দাও মারার স্বভাব। গত ২ দিন আন্তরিক সহযোগিতার জন্য নেয়ামুলকে ধন্যবাদ দিয়ে বোটে চড়লাম।

সকাল বলে কুতুবদিয়া চ্যানেল একবারে শান্ত। গাম বোট দ্রুত এগিয়ে চলল মগনামা ঘাটের দিকে, বড়ঘোপ ঘাট আস্তে আস্তে চোখের আড়ালে চলে গেল। মাঝি নিশ্চিত মনে বৈঠা ধরে বসে আছে আর বিড়ি ফুঁকছে। ধীরে ধীরে পুব আকাশ আলোকিত হচ্ছে। দূরে বাম দিকে আবছা দেখা যাচ্ছে বাঁশখালী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনি, ডানে কাছেই সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন, সমুদ্রগামী একটি লাইটারেজ জাহাজ আস্তে আস্তে চোখের আড়ালে চলে গেল। বোটের গলুইয়ের কাছে বসে ড. মুজিব কিছু একটা ভাবছে যা আমি জানি না। আমি চোখ আর হৃদয়ের সকল কপাট খুলে উপভোগ করছি প্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্য যা নিখরচায় পাওয়া যায় অনন্তকাল। যত ঝামেলা মানুষের মধ্যে-লোভ, লাভ, লালসা চলছে লাগাতার। কবে আমরা প্রকৃত মানুষ হব, নির্মল হবো প্রকৃতির মতো, কে জানে!

মিজোরাম ॥ সাত সহোদরার রাজ্য

নাহিদা চৌধুরী

পঞ্চম শ্রেণীতে প্রথম ভূগোলে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির মানচিত্রের সমতলকরণ করতে গিয়ে দেশের উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিমে অবস্থিত দেশ ও স্থানের পর পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা তারপরই মিজোরাম রাজ্যের নাম লিখতে হতো, তখন থেকেই মিজোরাম নামের সাথে আমার পরিচয়। এছাড়া পার্বত্য শান্তিবাহিনীর মিজোরামে অবস্থানের সন্দেশ সে সময়ে বেতারে ছিল প্রভূত শ্রুত। এভাবেই পাশের দেশের এই রাজ্যের সাথে পরিচয় আমার। পরবর্তীতে জানা হলো উত্তর পূর্ব ভারতে সপ্ত সহোদরার একটি রাজ্য এই মিজোরাম। বয়স বাড়ার পাশাপাশি পড়াশুনা করতে গিয়ে অনেক কিছুই জানা হয়। একটা সময় এই রাজ্যগুলোতে বিদেশীসহ ভারতীয়দেরও প্রবেশে জারি করা দছিল নিষেধাজ্ঞা। সময়ের সাথে সাথে এই এলাকাগুলোও পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ৩০ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারি

করা নির্দেশ অনুসারে, মণিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড রাজ্যের সমগ্র এলাকাকে বিদেশী (সুরক্ষিত এলাকা) আদেশ ১৯৫৮-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত সুরক্ষিত এলাকা শাসন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, প্রাথমিকভাবে এক বছরের জন্য হলেও যা সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়েছে। নিম্নলিখিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই শিথিলকরণ এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে :

(১) আফগানিস্তান, চীন এবং পাকিস্তানের নাগরিক এবং এই দেশগুলিতে তাদের উৎপত্তি বিদেশী নাগরিকদের মণিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড রাজ্যে তাদের সফরের আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

(২) এই রাজ্যগুলিতে আসা সমস্ত বিদেশী তাদের আগমনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য/জেলার বিদেশী নিবন্ধন অফিসার (এফআরও) এর কাছে নিজেদের নিবন্ধন করবে।

মিজোরাম উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য। আইজল মিজোরামের রাজধানী। মি মানে জাতি, জো মানে পাহাড় এবং রাম মানে ভূমি, এই তিনটি শব্দ থেকে উদ্ভূত মিজোরাম বলতে 'পাহাড়ি জাতির ভূমি' বোঝায়। ভারতের উত্তর-পূর্বে, এটি সর্বদক্ষিণের স্থলবেষ্টিত রাজ্য এবং ভারতের সপ্ত সহোদরা রাজ্যের ত্রিপুরা, আসাম, মনিপুর এই তিনটি রাজ্যের সাথে যার সীমানা রয়েছে। এছাড়াও প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের প্রায় ৭২২ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে মিজোরামের সীমানা অবস্থিত।

এবার রোজায় মাঝামাঝিতে আমার ভ্রামণিক বন্ধু রওশন আপা ম্যাসেজ দিলেন দুজন যাচ্ছে আগরতলা হয়ে মিজোরাম। তারা আরও দুজনকে তাদের সাথে নিতে চায় বলে সামাজিক মাধ্যমে জানান দিয়েছে। আপা বললেন আমি রাজি থাকলে উনি কথা বলবেন। যেতে হবে ঈদের পরদিন। আমি জানিয়ে দিলাম আমার আপত্তি নেই। তারপর খোঁজ নিয়ে জানলাম, আপা ফোন করার আগেই ওরা দুজনকে পেয়ে গেছে। আমি বললাম, পেয়েছে তো কি হয়েছে আমরা তো সাথে যেতেই পারি। ওদের সাথে যোগাযোগ করলে ওরা জানিয়ে দিলো আমাদের ওরা সাথে নিবে না। ভাবলাম না নিলেই কি আমরা তো নিজেরাই যেতে পারি। আপাও বললেন যাওয়াই যায়। এর মাঝে বন্ধু স্বপন বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে বেড়াচ্ছিল কিন্তু সেটাও হয়ে উঠছিল না। ওকে বললাম আমরা এভাবে যাবো বলে ঠিক করেছি, তুই চাইলে আমাদের সাথে যেতে পারিস। সে রাজি হয়ে গেল। তারপর স্বপন খোঁজ খবর করে জানাল, আগরতলা থেকে বিমানে খরচ কম, সড়ক পথে আগরতলা তারপর বিমানে মিজোরাম। স্বপনের অর্ধাঙ্গিনী বিভাও আমার ভালো বন্ধু, সে যেতে চায় ঈদের আগেই। আপাকে জানালাম, উনি না করে দিলেন কারণ রোজায় উনি কোথাও যাবেন না। অবশেষে ঠিক হলো ২০ এপ্রিল আমরা রওনা করব ঢাকার কমলাপুরের বিআরটিসির আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের রয়েল পরিবহন ও ত্রিপুরা সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত 'রয়েল মৈত্রী' বাসে করে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার উদ্দেশে। এই বাসটা সকাল

ফলকান ভিলেজ

আটটায় ছেড়ে যায় এখান থেকে। সরাসরি আগরতলা চলে যায় সীমান্তের নিয়মানুগত্য শেষ করে।

আমরা ২০ এপ্রিল রওনা করে আগরতলা পৌঁছুতে পৌঁছুতে চারটা বেজে গেল, আগেই হোটেল ঠিক করা ছিল, সেটায় যেতে গিয়ে গেলাম আরেকটায়। পরে গেলাম সেটায়। পরদিন আমাদের মিজোরামের ফ্লাইট, ভারতীয় মুদ্রা বিনিময় করতে বটতলা চৌমুহনী গেলাম টোটোতে করে হোটেল সারদার নিচে একটা পাইকারি খুচরা দোকানে লিখা আছে তারা মুদ্রা বিনিময় করে। সেখানে ঢাকাইয়া কথা বলে এমন একজন বসে আছে। তার কাছে বিমানের টিকিট, ফোনের সিম, যা দরকার তাই পাওয়া যাবে। আমাদের বলল কত টাকা বিনিময় হবে, বলার পর সে সব টাকা নিয়ে ছোট একটা ব্যাগে ভরল, তারপর বলল আপনারা বসেন আমি এখনই আসছি। আমি বেশ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম, স্বপন বলল সমস্যা নেই বিভাও বেশ সাহসী। সে স্বপনকে পাশেই তার চাচার দোকানে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাবার আগে আমাকে বলল আপনি কি ভয় পাচ্ছেন? আমি এখনি চলে আসবো ভয় পাবেন না। আমি বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে বললাম একটু ভয় তো পাচ্ছি, কারণ আপনাকে আমি চিনি না, আমাদের কাছে যা সর্বস্ব ছিল সবই আপনাকে দিয়ে দিয়েছি। এরপর অপেক্ষার পালা, এর মধ্যে দুজন এলো তাকে খুঁজতে, আমরা তাদের তার চাচার দোকানে পাঠালাম। তারা ফোন করে জানল তার আসতে আরেকটু সময় লাগবে। তাদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম তাদের আদি নিবাস নরসিংদী। এরমধ্যে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এলেন, এসেই বললেন আপনাদের বসিয়ে চলে

আইজল বিমানবন্দরে

গেছে। ভাববেন না চলে আসবে। ভদ্রলোক তার বাবা। এখন কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। আলাপ করে জানতে পারলাম এদের আদিবাস নোয়াখালীর ফেনী। অবশেষে সে এলো, আমাদের হিসেব বুঝিয়ে দিলেন তার বাবা, তারপর আমরা দুজন দুটো ভারতীয় সিম নিলাম। সেটা তাদের দোকানে নেই, কাকে ফোন করল সে এসে ফোনে সিম লাগিয় চালু করে দিলো। ফিরে আসার পর ভদ্রলোক আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন তাকে বিশ্বাস করার জন্য। ফেরার পথে স্বপন উজয়ন্ত প্রাসাদে গেল রাতের ছবি তুলতে, তখন তো জানতাম না এবার আর আগরতলা ঘুরা হবে না। বিভার ভালো লাগছিল না, সে টোটোতেই বসে ছিল। একটা জায়গায় লেখা আছে 'আই লাভ আগরতলা' স্বপনের ইচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার। আমি সামনে গেলাম স্বপনকে যেতে হবে ভিতরে, অনেকদূর হেঁটে যেতে হবে, আমি অপেক্ষা করছি, দেখলাম দুটো মেয়ে সেলফি তুলছে সেই লেখাটা সহ, বুঝলাম আনতে পারছে না। চিৎকার করে ওদের বললাম আমাকে দাও আমি তুলে দিচ্ছি। ওদের একজন এগিয়ে এসে ওদের ফোনটা আমাকে দিলো, আমি ওদের ছবি তুলে দিয়ে বললাম দেখতে, পছন্দ না হলে আবারও তুলে দিবো, ওরা ছবি দেখেই অনেক খুশি। এর মধ্যে স্বপন পৌঁছে গেছে, ছবি তোলা দেখে বলল আমি ওকে নিয়ে এসেছি আমার ছবি তোলার জন্য। ওরা খিলখিল হাসিতে নুয়ে পড়ল। বললাম আমার বন্ধুর সাথে দাঁড়াও

ছবি তুলে রাখি। ওরা বেশ উৎসাহের সাথে ছবি তুলে বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমি স্বপনের ছবি তুলে দিলাম, আমরাও হোটেলে ফিরে এলাম, এসেই রুমে গেলাম না একটা জায়গায় ফুচকা দেখলাম, ভাবলাম হয়ে যাক। স্বপন মোমো খেতে গেল, বিভা গেল ঔষধ কিনতে। পথ খাবার খেয়ে রাতে খাবো না বলে রুমে চলে গেলাম। রাতেই রুমের বিল মিটিয়ে দেওয়া হলো কারণ সকালেই বিমানবন্দরে চলে যেতে হবে।

সকাল ৭ টায় একটা টোটো নিয়ে চলে গেলাম বিমানবন্দরে, আগরতলা বিমানবন্দরটি মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর নামে পরিচিত। চেক ইন সেরে নিলাম তিনজনের। ইন্ডিগোর অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে ব্যাগেজ ১৫ কেজির বেশি নেওয়ার অনুমতি নেই। সে কারণে আগরতলা থেকে কিছুই কেনা হলো না, ফেরার সময় যেহেতু সড়ক পথে যাবো ওজনে বাধা নেই, তখন কেনা যাবে এই ভেবে। সকাল ৯.৩৫ এ ফ্লাইট। আমরা নাস্তা করিনি, দ্বিতলে রেস্তোরাঁগুলো আছে, সেখানে স্পাইস গ্রীল নামে একটা রেস্তোরাঁতে নাস্তার ফরমাশ করে তিনজনই ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে গেলাম। বিমান বন্দরের ভিতরটা বেশ সুন্দর। আমরা নাস্তা সেরে নিলাম। হাতে সময় আছে ভেবে আয়েশি ভঙ্গিতে সময় পার করছি, এর মাঝে ঘোষণা শোনা গেল শেষ ডাক হিসেবে নিদা চৌধুরী, হাবিবা, স্বপন। কারো নামই ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারেনি। ছোট ফ্লাইট হওয়াতে সবাই বোর্ডিং করে ফেলেছে, কেবল আমরা তিনজনই বাকি। আমরা দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে বাস এ চড়লাম, তারপর বিমানে। মাত্র ৪৫ মিনিটের ফ্লাইট। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম মিজোরামের লেংপুই বিমানবন্দরে। এটিও পৃথিবী ও ভারতের বিমানবন্দরের মধ্যে একটি বিপজ্জনক বিমানবন্দর। চারদিকে পাহাড় বেষ্টিত দৃশ্য চোখে আরাম দিলেও এতে অবতোরণ বিপজ্জনক। তবে নামার পরে হেঁটে হেঁটে মূল ভবনে যেতে হয়। ভবনে প্রবেশের পর ভারতীয়দের জন্য একটা ফর্ম পূরণের যেমন ব্যবস্থা আছে একটা ফি প্রদানের পর তারা মিজোরামে প্রবেশের অনুমতি পায়। তেমনি বিদেশী পর্যটকদেরও একটি ফর্ম পূরণ করতে হয় কোনো ফি প্রদান ছাড়াই। এটাই এফআরও নামে পরিচিত, এটা পূরণ করেই মিজোরাম প্রবেশের অনুমতি মেলে। আমরা তিন জনে আমাদের ফর্ম পূরণ করে ওদের জমা দিলাম। তারপর বেরিয়ে এলাম।

আমাদের ঠিক করা হোটেল রিজেন্সি থেকে পাঠানো গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি। কারো হাতেই আমাদের নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নেই। স্বপনের কাছে গাড়িচালকের ফোন নাম্বার ছিল, ফোন করলে সে ধরল না, হোটেলে ফোন করে জানা গেল, সে ভেবেছে ফ্লাইট দুইটার পর তাই আসেনি। বিমানবন্দরের ভিতর থেকে রেন্ট কার নিয়ে আমরা রওনা করলাম আইজলের দিকে। এখান থেকে আইজলের দূরত্ব ৩২ কিলোমিটার। এর মাঝে হোটেল থেকে ফোন করে জানাল তারা গাড়ি পাঠাতে চায়। আমরা আর সেটা নিলাম না, নিজেরাই ঠিক করে রওনা করলাম। আবহাওয়া দেখে মনে হলো যে কোনো সময় আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামবে। রাস্তার পাশে কত-শত সব বিচিত্র পসরা। কচি বাঁশ, আরও কত কী সব। কত রং, পান, সুপুরি প্লাস্টিকে মোড়া।

পশ্চিমী পোশাকে মিজো রমণীর দল। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে রাস্তা, এর মাঝে গাড়ি চলছে, চারদিকে সবুজের সমারোহ মন্ত্রমুগ্ধের মতো আচ্ছন্ন করে আছে আমাদের। একটা মাতাল করা বুঁনো গন্ধ চারিদিকে। একটা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে চালক পানি কিনল। আমরা পাহাড়কে পিছনে রেখে ছবি তুলে নিলাম। তারপর আবারও চলা শুরু, দূরত্ব কম হলেও পাহাড়ি রাস্তায় এটুকু পথ পেরোতে অনেক সময় লেগে যায়। পাহাড়ি পথ ছেড়ে ধীরে ধীরে আমরা আইজলের শহুরে পরিবেশে প্রবেশ করলাম। প্রকৃতিকে অটুট রেখে অসাধারণ একটা শহর গড়েছে মিজোরা। আমরা হোটেলে পৌঁছে গেলাম। আমার রুমটায় একটা ছোট জানালা ছিল। যেটা দিয়ে আকাশ এর পাশাপাশি দূরে আইজল শহরের সারি সারি ঘরবাড়ি দেখা যায়। আমরা হোটেলের রেস্তোরাঁতেই দুপুরের খাওয়া সেরে নিবো ভাবলাম। তার আগে বিকেলের সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য একটা গাড়ি ঠিক করলাম কাছাকাছি যা দেখা যায় দেখব বলে। বড়বাজার কাছেই তাই সেখানে হেঁটে গিয়ে দেখে আসা হবে ঠিক হলো। এই বাজারে মিজোদের অনেক হস্তশিল্প, কাপড় এবং গয়না পাওয়া যায়। আমরা তারপর রেস্তোরাঁতে গেলাম, যে মেয়েটা মেনু নিয়ে এলো ওকে বললাম আমরা পর্ক নিবো না। তারপর সবাই সবার মতো করে অর্ডার করলাম, আমি একটা চিকেন নুডুলস্ নিয়েছিলাম। দেখলাম সেটাতে পর্ক আছে। খাওয়ার রুচি শেষ হয়ে গেল, ওদের বললাম তোরা খেয়ে নেয়, আমি রুমে আছি। স্বপন আর বিভা রুমে এলো, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপর বের হবে, বিভা রুমে এসে ঘুমিয়ে গেল।

বিভা ঘুমিয়ে উঠলে ওরা ওদের রুমে চলে গেল তৈরি হতে, আমিও তৈরি হয়ে নিলাম, হঠাৎ জানালায় বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, আইজল শহরের যে অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল সেটা কালো মেঘে ঢেকে গেছে। সে এক অসাধারণ দৃশ্য। কখনও মেঘ সরে যাচ্ছে কখনও এসে ছেয়ে যাচ্ছে। মেঘেদের খেলার কথা বরাবর শুনেছি দেখেছিও, তবে এই খেলা দেখাটা নেশার মতো, মনে হয় সারাদিন বসে এই খেলা দেখি। কিছুক্ষণ পর অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামল। একদম যেনো শ্রাবণের বৃষ্টি। এমন ঝুম বৃষ্টিতে পাহাড়ি পথে পাহাড় ধসের সম্ভাবনা থাকে। কোনো গাড়িচালকই গাড়ি নিয়ে বের হয় না। আমাদের দুদিনের মিজোরাম ভ্রমণের প্রথমদিনের তালিকার জায়গা গুলো আর দেখা হলো না। আমরা রুমে বসেই বৃষ্টি উপভোগ করলাম। আসলে সবকিছু কি পরিকল্পনা মাফিক হয়? হয় না। বৃষ্টি ধরতে ধরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে এলো। দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি তাই ভাবলাম বাইরে গিয়ে কিছু খেয়ে আসা যায়। আমরা তিন জনে বেরিয়ে হাঁটছি, পাহাড়ি এলাকায় এটাই মজা অনেক বৃষ্টির পরও রাস্তায় কোনো পানি জমে থাকে না। কিছুটা হেঁটেই একটা কেএফসি পেয়ে গেলাম। সেখানে যে যার পছন্দে খেয়ে নিলাম। এখানেই দেখলাম কেএফসি চিকেন বিরিয়ানি শুরু করেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে ভাবলাম বড় বাজার যাই, এই শহরটি তার সুন্দর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, হস্তশিল্প এবং সুস্বাদু খাবারের জন্য পরিচিত, এই শহরে অনেক জাদুঘর, আর্ট গ্যালারি এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রয়েছে, যার মাধ্যমে মিজোরাম সম্পর্কে আরও

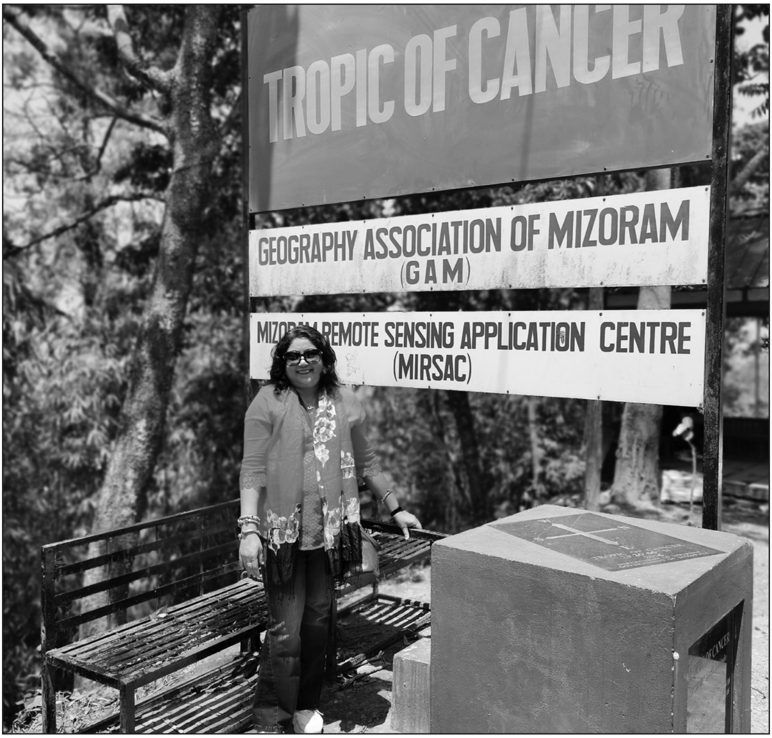

ট্রপিক অব ক্যান্সার

জানতে পারা যায়। মিজোরা বেশির ভাগই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী, প্রচুর গির্জা আছে এখানে। এখানে মেয়েরা পাশ্চাত্যের পোশাকেই অভ্যস্ত মনে হলো। আরও মনে হলো ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বাইরে কাজ করে বেশি। জাতিগত ইতিহাসও তাই বলে। যাইহোক, কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করার পর জানা গেল রাস্তায় কিছুদূর পর পর করা সিঁড়ি দিয়ে নেমেই বড়বাজার যেতে হবে। এই বৃষ্টি ভেজা সিঁড়িতে পা পিছলে যাবার কথা ভেবে সে পরিকল্পনা বাতিল করা হলো। ভাবলাম যতটুকু হাঁটা যায়, হেঁটেই শহর দেখি। ভালো ভালো দামি ব্র্যান্ডের দোকান আছে। সব দোকানই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, কয়েকটা বন্ধ হবার পথে। জানা গেল বৃষ্টি হলে এরা দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়। কারণ বৃষ্টি হলে সেদিন আর কেউ আসে না। সুপার শপগুলোও বন্ধ। অগত্যা কি করা হোটেল এ ফিরে পরদিনের জন্য গাড়ি ঠিক করা হলো। তারপর রুমে ফিরে গেলাম। রাতে আর কিছু খেতে ইচ্ছে হলো না।

পরদিন একটু আগেই ঘুম থেকে উঠে গেলাম। ঈদের দিন, বাসায় ফোন করে সবার সাথে কথা বলে নিলাম। হোটেলেই নাস্তা সেরে নিয়ে বের হবার কথা। নিচে নেমে জানলাম গাড়ি তৈরি, আমরা নাস্তা সেরে বেরিয়ে গেলাম। আজ ঝলমলে দিন, পথ

দেখেও বোঝা যায় রাতে ঝুম বৃষ্টি হয়েছে। সব গাছপালা পাহাড় ঝকঝকে সবুজ। প্রথমেই আইজল থেকে ১৮ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত একটি ছোট গ্রাম ফালকান এ গেলাম। গ্রামটি সাধারণ মিজো গ্রামের জীবনধারা এবং সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করে, তাই স্থানটি প্রায়শই পর্যটকরা পরিদর্শন করে। মিজোরাম শিল্প ও সংস্কৃতি বিভাগ ১৯৯২ সালে ফালকানে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (জোখুয়া) স্থাপন করেছে। কেন্দ্রটিকে একটি মিজোদের জীবনযাপনের-জাদুঘর হিসেবে নির্মাণ করা হয়। যেখানে রয়েছে জাওলবুক (ডরমিটরি), লাল ইন (প্রধানের বাড়ি), পুম (কামার) এবং অন্যান্য মিজো সাধারণ ঘর। এখানে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিস্তম্ভ ও তাইতেসেনা (তাইতেসেনা ছিলেন একজন সাহসী মিজো যোদ্ধা, এর বেশি তাঁর সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি) স্মৃতিস্তম্ভ। আমরা প্রতিটা জায়গায় গিয়ে ছবি তুললাম। জায়গাটা সুন্দর, ঘরগুলোতে প্রবেশ করলে প্রাথমিক একটা ধারণা মিলে মিজোদের জীবনধারার। একজন খণ্ডকালীন চৌকিদার নিযুক্ত আছেন এবং কেন্দ্রটি টিকিটের বিনিময়ে দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত যার প্রবেশমূল্য প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের জন্য যথাক্রমে ২০ এবং ১০ টাকা। যখন ঢুকলাম তখন কাউকে না দেখে আমরা ভিতরে চলে যাই। ফেরার পথে চৌকিদারের ঘরে যাই, সবার টিকিটের মূল্য চুকিয়ে বেরিয়ে আসি। আকাশ অসম্ভব সুন্দর নীল, আগের দিন যে বৃষ্টি হয়েছে তা বোঝার কোনো উপায় নেই। এরপর আমাদের গন্তব্য মুইফাঙ।

মুইফাঙ যাবার পথে ট্রপিক অব ক্যান্সার কল্পিত রেখাটি যে রাস্তায় সেখান দিয়ে যেতে হয়। হোটেলে যে মেয়েটি নাম বন্দনা গাড়ি ঠিক করে দিয়ে ছিল সে গাড়িচালককে এখানে থামতে বলে দিয়েছিল। ট্রপিক অব ক্যান্সার বা কর্কটক্রান্তি রেখা ১৭টি দেশ, ৩টি মহাদেশ এবং ৬টি জলাশয় অতিক্রম করেছে। ভারতে এটি মিজোরামের অবস্থানসহ আটটি রাজ্যের মধ্য দিয়ে যায়। মিজোরাম রিমোট সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার, ডিরেক্টরেট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং মিজোরামের জিওগ্রাফি অ্যাসোসিয়েশন এমন জায়গায় একটি পাথর তৈরি করেছে যেখানে মিজোরামের মধ্য দিয়ে ট্রপিক অব ক্যান্সার প্রবাহিত হয়েছে, একটি সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইজল এবং দক্ষিণ মিজোরামের লুংলেই শহরের সাথে সংযোগকারী বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত সড়কের আইজল জেলার মাউবুয়াং লুংসাই গ্রামে পাথরটি স্থাপন করা হয়েছে এবং একটি মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে। জায়গাটিতে নেমে আমরা রেখাটির উপর দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম। এই অনুভূতি ছিল একদম অন্যরকম। ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম আমার নিজ জেলা কুমিল্লার উপর দিয়েও এই কল্পিত রেখা গেছে। মনে হলো আমার দেশেও তো এমন একটা জায়গা তৈরি করা যায় পর্যটকদের জন্য।

পথে যেতে যেতে আরও দুটো ভিউ পয়েন্টে থেমে ছবি তুললাম। পাহাড়ের মাঝে রাস্তা চলে গেছে দৃশ্যটা অসাধারণ। এরপর আবারও পথ চলা, যাচ্ছি মুইফাঙের দিকে। এটি আইজল থেকে প্রায় ৫০ কিমি দূরে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬১৯ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। মিজোরামের অন্যতম শৈল শহর হিসেবে পরিচিত যেখানে শুধুমাত্র এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে দেশ বিদেশের বহু পর্যটক ছুটে আসে। আছে কমলা বাগান,

পার্ক ইডেন ফকল্যান্ড

প্রকৃতির এক অপরূপ নিদর্শন এখানে দেখতে পাওয়া যায়। পাখিদের কলতান, সামান্য জনপদ, ছবির মতো, যতদূর চোখ যায়, হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি আসে যায়। ডান পাশে খাদে মেঘেদের দল, ওরা যেনো হাওয়ায় চেপে এলো সেই ত্রিপুরা থেকে। নেমে যাওয়া পথ ধরে খানিক এগোলেই কাঠের মিজো কটেজ। চিমনি দিয়ে সাদা ধোঁয়া আকাশের গায়ে ঐকতান তৈরি করছে। সবুজ গালিচায় মোড়া প্রশস্ত উঁচুনিচু প্রান্তর। পাহাড়ের বুকে অবস্থিত ছোট ছোট ঘর, যেখানে বাস করে বহু মানুষ। এখানে মেঘ মাঝে মাঝে নিচে নেমে আসে যেনো দেখে মনে হয় মেঘের মধ্যে গোটা শহর গড়ে উঠেছে। মেঘের ওপর ভাসছে এমনই একটি শহর এটি। তবে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এখানকার অরণ্যের অনেকাংশেই মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি এখনও। এখানকার জনবসতি দূরে দূরে অবস্থিত। এই এলাকার সকল মানুষের ভিনদেশের ভ্রমনার্থীদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ প্রকাশ পায়। ভাষা সমস্যা থাকলেও চোখেমুখের আন্তরিকতা সেই সমস্যাটিও মিটিয়ে দেয় ।এই শৈল শহর আইজলের কাছে অবস্থিত। শৈল শহরটি আজও কুমারী বন দ্বারা আবৃত। বনের গাছে গাছে ট্রি হাউস তৈরি করা আছে। সরকারি একটা রেস্ট হাউস আছে, পাশেই আছে একটি ট্যুরিস্ট রিসোর্ট। দেখলাম অনেক সরকারি গাড়ি থেমে আছে। আমরা ফ্রেশ হবো বলে রিসোর্টে ঢুকলাম, একজন পর্যটক মহিলা আমাকে বললেন তোমার কিছু জানতে হলে সামনে অভ্যর্থনা আছে, ওখান থেকে জেনে নিতে পারো। আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে গেলাম, পিছন থেকে বলতে শুনলাম তোমার চুল খুব সুন্দর, আমার পিছেই বিভা ছিল, সে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে এলো। ফ্রেশ হয়ে যখন ফিরে এলাম তখন তাঁদের কাউকে আর পেলাম না। আমরা মুইফাঙ পার্কটিতে অনেকটা সময় কাটালাম। ছবি তুললাম, দোলনায় দুললাম, সবুজ গালিচার উপত্যকায় শুয়ে ছবি তুললাম। ট্রি হাউসে চড়লাম।

লেংপুই বিমানবন্দর আইজল

এতো চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া এই গ্রীষ্মের দাবদাহকে শীতল করে দিয়েছে। ঘাসফুলে ছেয়ে আছে সবুজ গালিচা। একদম আসতে ইচ্ছে করছিল না, মনে হচ্ছিল এখানেই থেকে যাই। কিন্তু ফিরতে যে হবেই। এখানেও ঢুকার সময় একজন চৌকিদারের ঘর আছে, ফেরার পথে স্বপন বিভা গিয়ে প্রবেশমূল্য দিয়ে এলো। এখানে প্রবেশমূল্য কতো সেটা আর জানা হয়নি। পার্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশের দোকান থেকে বিভা স্বপন ওদের পছন্দে কিছু খেয়ে নিলো। আমি চিপস্ আর কোমল পানীয় লিমকা নিলাম। তারপর আইজলের দিকে রওনা করলাম।

ফেরার পথেই স্বপন কেএফসির বিরিয়ানি খাবে, বিভা হোটেলেই খেয়ে নিবে ঠিক হলো। আমরা বেলা ৩টা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। বন্দনার সাথে কথা হলো খাওয়া সেরে আমরা যতটা শহর ঘুরা যায় ঘুরে নিবো, সেভাবে গাড়ি চালককে বলে রাখতে। বিভা হোটেলের রেস্তোরাঁয় চলে গেল, আমি স্বপন গেলাম কেএফসির বিরিয়ানি খেতে। যাইহোক একটা বিরিয়ানি আমরা দু'জনে খেতে পারলাম না। এটাকে কি করে বিরিয়ানি নাম দেওয়া হয়েছে সেটাই ভেবে পেলাম না। আমাদের মিজো খাবার খাওয়া হলো না। কেএফসি থেকে বেরিয়ে রুমে না গিয়ে কিছুটা হেঁটে শহর দেখতে গেলাম, একটা স্ক্যাচার্স এর দোকান থেকে জুতা কিনলাম, স্বপন ওর মেয়ের জন্য একটা ব্যাগ কিনল। এই আমাদের কেনাকাটা মিজোরাম থেকে। কারণ আমাদের ব্যাগ ১৫ কেজি হয়ে গেছে, তাই কিছু কেনা যাবে না। মিজো পোশাক পছন্দ মতো পেলাম না, কেনাও হলো না। ফিরে গেলাম হোটেলে, সাড়ে ৪টায় বের হবো বললাম চালককে।

বের হওয়ার পর প্রথমেই গেলাম পার্ক ইডেন ফকল্যান্ড, কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হওয়াতে সব জায়গা ভেজা। বাচ্চাদের জন্যই পার্কটা। পাহাড়ের উপর হওয়াতে আমরা

আইজল শহরটা এখান থেকে দেখতে পেলাম। কিছু ছবি তোলা হলো, আবারও বৃষ্টি শুরু হবে, ভাবলাম বেরিয়ে পড়াই শ্রেয়। মূল ফটকের পাশেই একটা ফাস্ট ফুডের দোকান, স্বপন সেখান থেকে ভাজা আর কোক খেলো। তারপর বেরিয়ে পড়লাম ফেরার জন্য। ফেরার পথে চালক আইজলের ভিউ পয়েন্টে যেতে বলল, বৃষ্টিতে রাস্তা ভিজে আছে তাই উপরে উঠার সাহস হলো না, ওখানে পাশেই দেখলাম শিখদের গুরুদুয়ারা। উপরে যেতে পারিনি কি হয়েছে রাস্তার পাশে আরেকটা ভিউ পয়েন্টে থামলাম, ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে, অন্ধকার নেমে এসেছে, পুরো আইজল শহরের ভবনগুলোতে আলো জ্বলছে জ্বল জ্বল করে, জোনাকি ভেবে ভ্রম হতেই পারে। এই অপরূপ দৃশ্যকে পিছনে রেখে নিজেকে ক্যামরাবন্দী করলাম। তারপর ফিরে এলাম হোটেলে, রুমে না গিয়ে ভাবলাম কিছু খেয়ে নেওয়া যায় কিনা। একটা রেস্তোরাঁয় দক্ষিণ ভারতের দোসা দেখে অর্ডার করলাম, স্বপন আর আমি খেলাম, বিভা খেলো না। তারপর আমরা রুমে ফিরে এলাম।

সময় স্বল্পতার কারণে দেখা হলো না মিজোরামের প্রধান নদী তিয়াং, রেইক পিক, ফাউংপুই মিজোরামের সর্বোচ্চ চূড়া, সেরলুই নদী, থানজোয়াল মিজো বয়ন শিল্প, লুংলেই, ভানতাং জলপ্রপাত, চাম্ফাই মায়ানমারের পাহাড় দিয়ে ঘেরা একটি উপত্যকা, সার্চিপ, তুইরিহিয়ান জলপ্রপাত, জোখাওথার ভিলেজ, তামডিল লেক, জিয়নস ফ্যামিলি, দাম্পা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, পলক লেক, রিহ লেক, সিবুতা লুং মিজোরামের অন্যতম প্রধান পর্যটন স্থান সাইহা, কোলাসিব, ডর্টল্যাং পাহাড়।

মিজোরাম দুদিনের জন্য নয়, কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাতদিন সময় হাতে নিয়েই মিজোরাম আসার পরিকল্পনা করলে ভালো হতো। যাইহোক ছেড়ে যাওয়া মানে না দেখা নয়, হয়তো পরেরবার এসে দেখা হবে। আবারও আসার একটা তাগিদ থাকবে।

পরদিন সকাল ১০.৪০ এ আমাদের ফ্লাইট আইজল থেকে আগরতলা, আমরা সকালে নাস্তা করে ৮ টার মধ্যেই বেরিয়ে গেলাম। ব্যাগ চেক ইন করে লম্বা লাইনে দাঁড়ালাম, হাতে শুধু বোর্ডিং পাস থাকাতে আমাদের কোনো সমস্যা হলো না। স্বপনের হাতে পাসপোর্ট থাকাতে ওকে নিয়ে গিয়ে আবারও ফর্ম পূরণ করালো মিজোরাম ছাড়ছে এ কারণে। সময় মতো বিমানে উঠতে গিয়ে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমরা ছবি তুললাম। জানি না আবার আসা হবে কিনা। বিমানে বসার কিছুক্ষণ পর বিমান উড্ডয়নের জন্য ভূমিত্যাগ করল। আমার সপ্ত সহোদরার একটি রাজ্যে কাটানো সময়ও ফুরিয়ে গেল।

মক্কা মদিনার পথে

ফকির আকতারুল আলম

আমাদের ফ্লাইট টাইম ছিল ভোর পাঁচটা। আমরা যথারীতি বিমান বন্দরে পৌঁছে গেলাম রাত বারোটার সময়। বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে অবস্থান নিলাম ইউসিবি ইম্পিরিয়াল লাউঞ্জে। হজ্বের ইহরাম পরেছি লাউঞ্জে বসেই। যথারীতি সময় মতো সৌদিয়া এয়ারলাইন্স এর বিশাল জেট বিমানে আরোহণ করলেন ৪৪৫ জন হজযাত্রী। এদিন আবার দেখলাম বাঙালিদের আচরণ। হজ্ব ফ্লাইটে সাধারণত সিট নম্বর নির্দিষ্ট থাকে না। আগে আসিলে আগে পাইবেন ভিত্তিতে আসন গ্রহন করতে হয়। খুলনা- কালনা রুটের বাসের মতো হুড়োহুড়ি করে সবাই আসন নিলেন, মনে হলো দেরি করলে সিট নাও পাওয়া যেতে পারে। ফেরার দিন তো একজন বিজ্ঞ হজযাত্রী কে বলতে শুনেছি, যতো লোক উঠছে এতো লোকের সিট হবেনানে।

যাত্রার দিন দুপুর থেকেই মনে হচ্ছিল আমার শরীরটা ঠিক নেই। আমার স্ত্রী তেইশ বছরের বিবাহিত জীবনে আমাকে অসুস্থ অবস্থায় সেবার সুযোগ পায়নি। মনে হচ্ছে সৌদিআরব গেলেই তার সে সুযোগ মিলবে। বিমানে আরোহণ করেই বুঝতে পারলাম আমি জ্বরে আক্রান্ত। বিমানে যাত্রী অনুযায়ী কম্বল থাকে, কিন্তু আমার জরুরি প্রয়োজনে চেয়েও কম্বল পেলাম না। কেন পেলাম না, সেটা বুঝলাম পরদিন বিমান থেকে নামার সময় দেখলাম অনেক দেশি হজ্বযাত্রী ভাই একটা কম্বল সিটের উপর রেখে বসেছেন, আরেকটা গায়ে চাপিয়েছেন, যার ফলে আমাদের মতো অনেকেই দরকার থাকা সত্বেও কম্বল পাননি। অথচ সবাই কিন্তু হজ্ব করতে যাচ্ছেন যেটা মুসলমানদের ইবাদতের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। হজ্ব যাত্রার সময় অন্যের সমস্যা করে অতিরিক্ত কম্বল আটকে রেখে তারা কি ইবাদত করলেন এটা মিলিয়ন ডলার কোশ্চেন। যাইহোক বাধ্য হয়ে হয়ে কম্বল ছাড়াই বিমান যাত্রা সম্পন্ন হলো।

২

আমাদের দেশে সাধারণত মানুষ জীবনের সব কাজ শেষ করে তারপর হজ্বে যাত্রা করে।যে জন্য আমাদের দেশের মানুষের জন্য হজ্ব যথাযথ ভাবে পালন কষ্টকর হয়ে পড়ে। সৌদি আরবে আমাদের দেশের মতো ভ্যান রিক্সা নেই, ইচ্ছে হলো আর উঠে পড়লাম। কাবা শরীফ থেকে যারা যত দূরে থাকবেন তাদের শারীরিক পরিশ্রম ততো বেশি। এর আরেকটা অর্থ হলো যাদের টাকা যত বেশি তারা কাবাশরীফের ততো কাছাকাছি থাকেন। এজন্য শরীরে বল থাকা অবস্থায় হজ্ব পালন করা উচিত। পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ তরুণ, যুবক অবস্থায় হজ্ব পালন করে, শুধু মাত্র বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের মানুষ শেষ বয়সে হজ্বে যায়। একটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার সব কাজ গুছিয়ে কখনো হজ্ব পালন করা সম্ভব নয়, সেজন্য সময় থাকতেই হজ্ব পালন করা উচিত।

যাহোক এদিন দুপুর নাগাদ জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম আমরা। হজ্জ মৌসুমে জেদ্দা বিমানবন্দরে সব সময় হজ্বযাত্রী বাহী বিমান অনবরত অবতরণ করতে থাকে। এসময় হজ্বযাত্রীদের জন্য বিশেষ ইমিগ্রেশনের ব্যবস্হা করা হয়। এখন অবশ্য ঢাকা বিমানবন্দরেই ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার ব্যবস্হা করা হয়েছে, ফলে জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছে আর ইমিগ্রেশনের মতো বিরক্তিকর একটা বিষয়ের জন্য সময় ক্ষেপণ করা লাগবে না, এটা একটা চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

যাহোক জেদ্দা বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন শেষে লাগেজ হাতে পেলাম, অবশ্য আমার একটা লাগেজ পেতে একটু বেশি সময় লেগেছিল। এরপর অপেক্ষা বাসের জন্য। অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর সব বাস দাঁড়িয়ে আছে হজ্বযাত্রী দের বহনের জন্য, যেটিতে আমরা মক্কা পৌছাব। একসময় আমরাও সুন্দর একটি বাসে আরোহনের সুযোগ

এই চমৎকার বাসগুলোতে হাজি সাহেবরা যাতায়াত করে থাকেন

পেলাম। অসুস্থ শরীর হলেও সুন্দর বাসে চড়ে হজ্ব পালনের আনন্দে শুরু হলো পবিত্র নগরী মক্কার উদ্দেশ্য যাত্রা।

বাসে উঠার আগেই অবশ্য সবার পাসপোর্ট বাস চালকের মাধ্যমে চলে যাবে সৌদিআরব সরকারের জিম্মায়। আর ফেরত পাওয়া যাবে সেই ফেরার দিন বাস চালকের মাধ্যমেই বিমান বন্দরে পৌঁছার পর।

যাইহোক আমাদের বাস চলতে চলতে একসময় থেমে গেল বিরান ফাঁকা এক জায়গায়, জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম একটা গাড়ি দাঁড়ানো তারাই সংকেত দিয়ে গাড়ি থামিয়েছে, কয়েক জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের মানুষ দেখে মনে মনে ভয় পেয়ে গেলাম, না জানি কারা কি উদ্দেশ্য গাড়ি থামালো। ভয় আরো জোরালো হলো কজনকে বড় বড় কার্টুন নিয়ে বাসে উঠতে দেখে। কিন্তু যা ভাবছিলাম তা নয়, তারা বন্ধু হিসেবে হজ্ব যাত্রীদের জন্য উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছে কেক, বিস্কুট, জুস, পানির বোতল সহ প্যাকেট। ভয় কাটলো, সাথে সাথে উপহার পেয়ে মনটা ভালো হয়ে গেলো। এঘটনার পূনরাবৃত্তি ঘটলো আরো কয়েকবার, ফেরার দিন সহ বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার সময় গাড়ি থামিয়ে উপহারের খাবার বিতরণ ততদিনে গা সওয়া হয়ে গেছে। বরং কোন দিন দিতে দেরি হলে আমরা হাসাহাসি করতাম কেইস টা কি, আজ দেরি হচ্ছে কেন?

পৌঁছে গেলাম আরাধ্য মক্কা নগরীতে। সেদিন শুক্রবার পবিত্র জুম্মার নামাজের দিন, এদিন বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় জ্যাম লেগেছিল জুম্মার নামাজের কারণে। হজ্বযাত্রীদের জন্য জুম্মা ও ঈদের নামাজ আদায় জরুরি নয়। আমরা তখন সেটা জানতাম না, ফলে রাস্তায় জ্যামের কারণে বাস দাঁড়িয়ে আছে, মসজিদে জুমার নামাজ আদায় চলছে,

আর আমরা অস্বস্তিতে ভুগছি, অচেনা জায়গায় নেমে জুম্মার নামাজ আদায় করতে পারছিনা। অবশেষে প্রায় দিন শেষে পৌঁছালাম মক্কায় আমাদের আবাস তাকেওয়া টাওয়ারে। এটা ছিল সৌদিআরবের বাদশাহর বাড়ির রাস্তার উল্টোদিকে। এখান হাঁটা পথে পবিত্র কাবা শরীফের দূরত্ব ছিল আটমিনিটের রাস্তা। বাদশাহ আজিজ গেট দিয়ে আমাদের প্রবেশ, বাহির চলতো। আমরা এই হোটেলে বারো দিন থাকার পর গেলাম মহানবী সা যেখানে ঘুমিয়ে আছেন সেই মদিনা নগরীতে। মজার ব্যাপার হলো মদিনা থেকে ফিরে আমরা আবার এই তাকওয়া টাওয়ারে উঠেছিলাম, যেটা ছিল বিরল ঘটনা। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম হজ্ব যাত্রীরা মক্কায় প্রথম যে হোটেলটিতে উঠেন পরে উঠেন অন্য আর একটি হোটেলে। সেই হিসেবে আমাদের বিরল ভাগ্যের জন্য আমাদের হজ্ব এজেন্সির ভূমিকা ছিল যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিষয়।

৩

তাকওয়া টাওয়ারে যখন পৌঁছাই তখন আমি পুরোপুরি জ্বরের কবলে। রুমে চেক ইন করার ফর্মালিটিজ সম্পন্ন করার সময় আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাড়িয়ে। একসময় রুমে প্রবেশের সুযোগ মেলে। প্রথমেই একটা ধাক্কা খাই রুমে ঢুকে। সাধারণ সময়ে যে রুমে দুজন থাকে হজ্বের সময় সেখানে কমপক্ষে চারজন, কোথাও কোথাও ছয়জন। মোটামুটি টাইট ফিটিং অবস্থা। স্বচ্ছন্দে নাড়াচাড়া করা একটু কঠিন, কিন্তু পরে সয়ে গেছে। স্বাভাবিক চোখে এটা অস্বাভাবিক লাগে, যাহোক পরে সেটা সয়ে গেছে।

কোরআন প্রিন্টিং প্রেস

সৌদি আরবের একটা খেজুরের বাগান

যাইহোক জ্বর নিয়ে এমন কাহিল অবস্থা যে ওমরাহ পালন করার মতো শারীরিক অবস্থা ছিল না। সহযাত্রীরা ওমরাহ পালন করছে আর আমি বিছানায় শুয়ে মনো যন্ত্রনায় জ্বলছি। অবস্থা এমন যে খাবার দেখলে মাথায় আগুন চেপে যেতো। মোয়াল্লেম সাহেবকে জানালাম আমার সামনে কোন খাবার যেন না আসে। কদিন ফলমুল, দুধ ইত্যাদি দিয়ে চললো। এরমধ্যে বাংলাদেশ মিশনের মেডিকেল সেন্টারে যাওয়া লাগলো। সেখানে যে অদ্ভুত সেবা পেলাম, আমার ধারণা দেশে যদি এর দশ ভাগের এক ভাগ সেবাও পেত মানুষ তাহলে নিশ্চিত চিকিৎসার জন্য কেউ বিদেশে যেতো না। সত্যিই বাংলাদেশ মেডিকেল সেন্টারে কর্মরত দের ধন্যবাদ না দিলে অন্যায় করা হবে। সেখানে যাবার সাথে সাথে হজ্ব কার্ড রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন, ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ, প্রেসক্রিপশন এবং ওষুধ। অসাধারণ! অথচ এই মেডিকেল সেন্টারের সেবা নিয়ে অনেককেই বিরুপ মন্তব্য করতে শুনেছি। মেডিকেল সেন্টারে আমাকে আরো একদিন যেতে হয়েছিল, এবং সেবার মান অসাধারণ।মদিনাতে ও বাংলাদেশ

হজ্ব মিশনের মেডিকেল সেন্টারে গিয়েছি, সেখানে সেবার মান ভালো, কিন্তু জায়গার পরিমাণ কম ফলে সবার বসে অপেক্ষা করতে অসুবিধা হতো।

দিন পাঁচেক পর অবস্থার একটু উন্নতি হলে উমরাহ পালন করি, কিন্তু তাওয়াফ হেটে করার মতো শারীরিক শক্তি না থাকায় হুইলচেয়ারে করে তাওয়াফ সম্পন্ন করি। প্রথমাবস্হায় অসুস্থ হবার একটা সুবিধা হয়েছিল বাকি সময়ে আর কোন অসুবিধা হয়নি।সব ছিল মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের রহমত। হোটেলে বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

বাথরুমের কল ছাড়লেই গরম পানি বের হয়, আমরা যেটা ব্যবহারে অভ্যস্থ নই, কিন্তু একসময় গা সওয়া হয়ে যায়। আমাদের দলে একুশ জন, পুরুষ মহিলা সহ। ইতোমধ্য সহযাত্রীদের পরিচয় সম্পন্ন হবার পর দলের মধ্যে পারিবারিক আবহাওয়া ফিরে আসলো। আসল মধ্যমনি ছিলেন আমাদের মোয়াল্লেম আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ ফয়সাল আহমেদ।

সৌদিআরব গিয়ে আমাদের দেশের হজ্ব যাত্রীরা প্রথমেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়েন। প্রথমত নতুন পরিবেশ, তাপমাত্রা অনেক বেশি, তবে বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকায় ঘাম হয়না বলে প্রচন্ড গরমেও কষ্ট কম হয়। সৌদিআরবে সব মসজিদেই এসির ব্যবস্থা, বোতলজাত পানির বন্দোবাস্ত থাকে, সেটা যেমন ফ্রিজে থাকে, তার তেমনি নরমাল ও থাকে। আমাদের দেশ থেকে যারা যান তারা প্রথমেই গরমের জন্য বেশি বেশি ঠান্ডা পানি পান করেন, ফলে সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বেশিরভাগ মানুষ ঠান্ডা, কাশি, জ্বরে ভোগেন।

পবিত্র কাবা শরীফ ও মদিনার মসজিদে নববীতে সবসময় জমজমের পানি সরবরাহ করা হয়। পানির পাত্র বেশিরভাগ ঠান্ডা পানি, অল্প কিছু নরমাল পানি। আমার ধারণা প্রতি দশটা পাত্রের মধ্যে নয়টাই ঠান্ডা পানির পাত্র, ফলে সহজ লভ্যতার কারণেই সবাই ঠান্ডা পানি পান করে সমস্যায় ভোগেন। এজন্য আমি সবাইকে প্রথম প্রথম ঠান্ডা পানি পান না করার পরামর্শ দিয়ে থাকি।

আমাদের হোটেলের বিশ গজের দূরত্বে একটা মোড়, সেখানে একটা গাছ, সামান্য ছায়া। সারাদিন সেখানে একটা জীপে বসে একজন পুলিশ অফিসার কে দায়িত্ব পালন করতে দেখতাম। নামাজের সময় হলে তাকে জামাতে অংশ নিতে দেখতাম। আমাদের ঐ মোড়টাতে জামায়াতে নামাজ আদায়ের সব ব্যবস্থাই ছিল। কাবা শরীফের মাইকের সংযোগ ও এখানে ছিল। মজার ব্যাপার হলো এখানের নামাজ পবিত্র কাবা শরীফের জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে বহু মানুষ হাঁটাচলা করে কাবা শরীফে না গিয়ে এখানকার জামায়াতে শরীক হতেন।এমন ও হয়েছে জামায়াত আমাদের হোটেলের সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যেতো, ফলে আমরা সেখানেই জামায়াতে শরীক হয়ে যেতাম। যেহেতু আমাদের জামায়াত প্রধান সড়ক সংলগ্ন ছিল, তখন

দেখতাম নামাজ শুরু হলে মোটরসাইকেল, গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে তারা জামায়াতে শরীক হতেন। কাছাকাছি দোকান থেকে শুধু লাইট বন্ধ করে দোকান খোলা রেখেই সবাই নামাজে শরীক হতো। মোটামুটি সৌদিআরবে নামাজ বাদ দেওয়ার কারো কোন সুযোগ ছিল না।

সৌদিআরবে জোহর এবং আছর নামাজের সময়ের ব্যবধান কম। ফলে জোহর নামাজ আদায় করে মধ্যাহ্ন ভোজ শেষ করে একটু বিশ্রাম নিতে নিতেই আছর নামাজের সময় হয়ে যেতো। এজন্য আমরা বেশিরভাগ সময় আছর নামাজ মোড়ের জামায়াতে অংশ নিতাম। আবার কখনো ফজর, জোহর, কখনো মাগরিব, এশার নামাজ ও আদায় করেছি। প্রথম প্রথম মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি ভাব থাকলেও পরে যখন নিশ্চিত হলাম এটা পবিত্র কাবা শরীফের জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত তখন আর মনের মধ্যে কোন অস্বস্তি ছিল না।

বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হজ্ব যাত্রীরা সাধারণত কাবা শরীফে প্রবেশ বাহিরের সময় পথ হারিয়ে ফেলেন। এটা ঘটে মিনার মাঠে, আরাফাতের মাঠেও। সবার হাতেই নির্দিষ্ট ব্যানড পরানো থাকে, পরিচয়পত্র থাকে তাতে শেষপর্যন্ত হারিয়ে গেলেও খুঁজে পাওয়া যায়। এত বড় মসজিদে হুট করে তাল মেলানো আদতে কষ্টকর। এজন্য সবার উচিত প্রথমেই তাদের আবাসস্থল থেকে কোন গেট দিয়ে প্রবেশ করছে সেটা মনে রাখা। তাতে পথ হারানোর সম্ভাবনা কমে যায়। আমরা যেমন আমাদের আবাসস্থল থেকে বাদশা আজিজ গেট দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতাম, বেরুতাম সাধারণত সেটা দিয়ে। কখনো অন্য কোন গেট দিয়ে প্রবেশ বাহির হলেও মাথায় থাকতো বাদশা আবদুল আজিজ গেট। নিজেদের গেট মনে রাখলে পথ হারানোর সম্ভাবনা কমে যাবে। তাছাড়া বাংলাদেশী সহ প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক আছে যারা হজ্বযাত্রীদের সহায়তা করার জন্য সদা তৎপর। ফলে ভয়ের কিছু নেই।

মক্কায় থাকাকালীন সবার আগ্রহ থাকে মসজিদুল হারামে পান্‌জেগানা নামাজ আদায় করা। খুব সমস্যায় না পড়লে কেউই সে সুযোগ মিস্ করতে চাননা। আমি প্রথম পাঁচ দিন বাধ্য হয়েই হারাম শরীফে নামাজ আদায় থেকে বঞ্চিত হয়েছি। পরে অবশ্য আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন সেটা পুষিয়ে দিয়েছেন। আমরা বেশিরভাগ সময় আসর নামাজের উদ্দেশ্য পবিত্র হারাম শরীফে প্রবেশ করে একবারে এশার নামাজ আদায় করে হোটেলে ফিরতাম। এখানে একটা মজার ব্যাপার বলি।হারাম শরীফ এবং মসজিদে নববীতে বাথরুম সব নিচতলায়।সব বাথরুম শুনেছি খুবই সুন্দর, কিন্তু প্রায় দেড় মাসের মধ্যে আমার একবার ও বাথরুমে যাবার দরকার হয়নি, ফলে বাথরুম আসলে কেমন সেটা আমি বলতে পারবো না।আসর থেকে এশার নামাজ নিয়মিত ভাবে এক অজুতে আদায় করা একমাত্র মহান আল্লাহ্ পাকের রহমত ছাড়া সম্ভব ছিল না। এজন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের প্রতি।

আমিরুল পরিবারে নাস্তার টেবিলে

আমাদের হোটেল তাকওয়া টাওয়ার ছিল সৌদিআরবের বাদশাহর বাড়ির বিপরীতে, সেজন্য আমরা মজা করে দাবি করতাম যে আমরা বাদশাহর আত্মীয়স্বজন। আমরা হোটেল থেকে আট/নয় মিনিটের হাঁটা পথে পবিত্র হারাম শরীফে পৌছাতাম।

সারাবছরই সৌদিআরবে গরম অনেক বেশি। গড় তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রী সেলসিয়াস। কিন্তু বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকায় ঘাম হয়না, সেজন্য গরমটা আমাদের দেশের মতো অসহ্য লাগে না। তবে বাইরে চলাফেরার সময় ছাতা সাথে চলাফেরা অত্যাবশ্যক। কাবা শরীফের যাতায়াতের পথে রাস্তার পাশে অনেক জায়গায় ফ্যান লাগানো, কোথাও কোথাও ঠান্ডা পানি স্প্রে করা হয় যাতে পরিস্থিতি প্রতিকূলে চলে না যায়। বাথরুমে পানি স্বাভাবিক ভাবেই গরম হয়ে থাকে।হুট করে এই পানি ব্যবহার করতে গেলে সমস্যা হতে পারে। এজন্য আগে পানিতে হাত দিয়ে গরমের পরিমাণ বুঝে নিলে ভালো হয়। গোসলের সময় অনেকেই বোতলে ভরে ফ্রিজের পানি মিশিয়ে গোসল করে। খাওয়ার জন্য অবশ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জমজমের পানি সরবরাহ করা

হয়। ২০১৮ দেখেছি এক লিটার পানির দাম ছয় রিয়াল, একলিটার পেট্রোলের দাম ১.৪৫ রিয়াল অর্থাৎ তেলের চেয়ে পানির দাম বেশি।

রাস্তায় বেরুলেই দেখা যায় প্রতি দশগজ অন্তর ক্লিনার হিসেবে দাঁড়িয়ে দেশি ভাই, প্রখর রোদ্দুরের মধ্য খালি মাথায়। আশেপাশে কোথাও তাদের সুপারভাইজার বাজপাখির চোখে তাকিয়ে আছে তার ডিউটি ফাকি ধরতে, এদের বেশিরভাগই হয় পাকিস্তানি না হয় ভারতীয়। একবার সীমানার বাইরে গেলেই এক সপ্তাহ ডিউটি অফ। কি কষ্টে তারা বিদেশে চাকরি করেন তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।এত কষ্ট করে তারা দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায়, তারপর তারা দেশে আসার সময় বিমান বন্দরে তাদের সাথে যাচ্ছেতাই ব্যবহারের শিকার হয়, কষ্ট করে কিনে আনা তাদের জিনিস খাবলে হাতিয়ে নিতে হাঁ করে থাকে তথাকথিত শিক্ষিত ও সরকারি দায়িত্ব পালন করা একশ্রেণীর মানুষ নামের কলঙ্ক। আমার ধারণা এরা যদি স্বচক্ষে একবার এদের দূর্দশা দেখতো তবে জীবনেও এদের জিনিসে হাত দিতো না।

কাবা শরীফে যাওয়া আসার সময় রাস্তার দু'পাশের দোকানে চমৎকার জুস, আইসক্রিম বিক্রি হয়। সেসব জুসের মান নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই, সেগুলোর রং দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে, দাম ও খুব বেশি নয় গড় পাঁচ রিয়াল। আমাদের দেশের মতো খাবারে ভেজালের কথা সেখানে চিন্তাও করা যায় না। সৌদিআরবে তেমন খাদ্য উৎপাদন হয়না, কিন্তু খাবার অপচয়ের দিক থেকে সম্ভবত পৃথিবীর সবার উপরে। হাজি সাহেবদের যে খাবার দেওয়া হয় তাও পরিমাণে অনেক বেশি, এবং প্রতিনিয়ত তা নষ্ট হয়, কিন্তু কিছু করার নেই। আমাদের এসব দেখে খুব খারাপ লাগলেও সেটা বন্ধ করতে পারিনি।

সৌদি আরবের মানুষ হাজী সাহেবদের বিভিন্ন উপহার দেওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকে। নামাজ থেকে ফেরার সময় প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য বিস্কুট জুস, কেক, পানি এমনকি আইসক্রিম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো স্রেফ বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে দেওয়া হয়, কিন্তু অনেক নাক উঁচু বাংলাদেশি সেগুলো নিতে অস্বীকার করে সামনে, কিন্তু আড়ালে আবডালে ঠিকই নেয়।প্রকাশ্যে বন্ধুত্বের মর্যাদা দিতেও আপত্তি। সৌদিআরবে বর্তমানে কর্মরত নিু পদের বাঙ্গালীদের আয় খুবই কম, তা দিয়ে নিজেদের চলাই কঠিন। দেশি-বিদেশি হাজি সাহেবদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বখশিশ ই তাদের মুল আয় এটা বলা যায়। অথচ দেশে আত্মীয়-স্বজন সবাই তাদের মুখ চেয়ে থাকে তারা বিদেশে কতই না সুখে আছে। কেউই তাদের এই কষ্টের জীবনের কথা শুনতেও চায়না, মানতে ও চায়না।

বাঙ্গালী চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যায় না। আমি নিজেও একজন বাঙালি সে হিসেবে আমিও এর বাইরে নই। আমাদের দেশে এমনিতেই পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তারপরও সে গুলো যারা ব্যবহার করতে

জেদ্দায় প্রবাসী আমিরুল ইসলামের পরিবারের সাথে

প্রবেশ করেন তাঁরা কেউই ভাবেন না এরপর কেউ এতে প্রবেশ করবেন, ব্যবহার করবেন। ফলে পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এতটাই অমনোযোগী থাকেন যে পরের জন নিতান্ত বাধ্য না হলে তাতে প্রবেশ করতে চাইবেন না। আমি সাধারণত বিমানে টয়লেট ব্যবহার এড়িয়ে চলতে চাই। হজ্ব যাত্রার সময় জেদ্দা যাওয়ার সময় একান্ত বাধ্য হয়ে টয়লেটে ঢুকে যা দেখলাম তাতে পারলে লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। দেশি ভাইয়েরা এটাকে ফাঁকা মাঠের 'টাট্টি' মনে করে সর্বত্র টয়লেট পেপার এমন ভাবে ছড়িয়ে রেখেছেন যে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে মেঝেতে গড়াতে শুরু করেছে, টয়লেট ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। আমার মনে হয় হজ্ব যাত্রীদের প্রশিক্ষণের সময় এ ব্যাপারে কিছু শেখানো দরকার।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও ভ্রমণ লেখক খায়রুজ্জামান হীরা আমার একটা পর্বের লেখার মন্তব্যে লিখেছেন মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার পথে পাবলিক টয়লেট গুলো দেশি ভাইয়েরা ব্যবহারের অনুপযোগী করে রেখেছিলেন।

হজ্ব যাত্রার প্রাক্কালে অনেকেই খাবার নিয়ে আতংকিত থাকেন, কি খাবেন, কি খেতে দেবে এসব নিয়ে। এমনকি আমাকেও অনেকেই খাবার নিয়ে বিভিন্ন অযাচিত উপদেশ দিয়েছেন যার কোন দরকার ছিল না। খাবার নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।কারণ খাবার সরবরাহ করার দায়িত্ব আমাদের দেশের লোকদের উপর থাকে,

ফলে খাবার সব দেশি।ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, ডাল, সবজি সব পাবেন, এবং তা পর্যাপ্ত পরিমাণে। ফলে খাবার নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা করার কোন দরকার নেই। তাছাড়া প্রচুর খাবার পাওয়া যাবে উপহার হিসেবে, কিনতে পাওয়া যাবে সব কিছু। কিছু লোক না জেনে শুনেই শুধু শুধু ভয়ের কথা ছড়িয়ে থাকেন। যাদের খাবার সরবরাহ মোয়াল্লেমের উপর তাঁরা ঘরে বসেই সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার, ও রাতের খাবার পাবেন কোন ঝামেলা ছাড়াই। আমরা ফজর নামাজ পড়ে এসে আবার ঘুম দিতাম এর মধ্যেই দরজায় টোকা, হাজি সাহেবরা সকালের নাস্তা, দুপুরে জোহর নামাজ শেষে ফিরে এসে আমরাই লিফটের গোড়া থেকে খাবার নিয়ে যেতাম, এশার নামাজ থেকে ফিরে রাতের খাবার একই ভাবে পেয়েছি। কখনো আমাদের এসব নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি। মোয়াল্লেম ভালো হলে খাবার নিয়ে একদম নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

হজ্ব পালন সামর্থবান মুসলমানদের ফরজ। ফলে হজ্ব পালন করতে গিয়ে সবার মানসিকতায় একটা মানবিক পরিবর্তন আনা জরুরি হলেও অনেকেই সেটা মনে রাখেন না। ফলে সামান্য বিষয় নিয়ে সহযাত্রীদের সাথে, অন্য হজযাত্রীদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন যা হজ্বের পালনের সাথে একদম যায়না। এজন্য হজ্বের নিয়ত করার সাথে সাথে মানসিকতা পরিবর্তনের চেষ্টা করা উচিত। নাহলে শুধু অর্থ ব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম করাই সার হতে পারে। এটা মনে রাখলে হজ্ব পালন যথার্থ হবে ইনশাআল্লাহ।

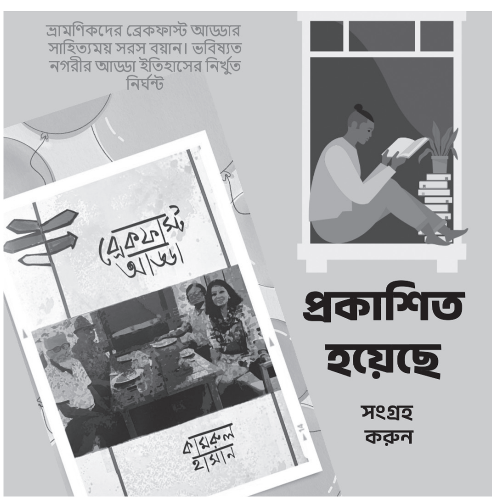

ঈদের দিনে দ্বীপের দেশে

ফরিদুর রহমান

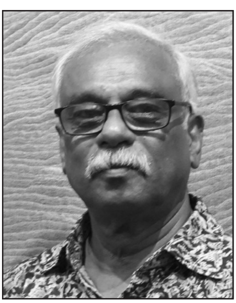

মালদ্বীপের ভেলানা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নামলাম ঈদের দিন বেলা সাড়ে বারোটার দিকে। আমাদের দেশে ঈদ একদিন পরে হলেও মালদ্বীপের মানুষ উৎসবের আয়োজন করে ফেলেছে। এয়ারপোর্টে সোনালি রূপালি চাঁদ তারার ঝিকিমিকি, কিছু ঝোলানো ঝালর আর ইংরেজিতে ঈদ মোবারক লেখা ছোট আকারের ফেস্টুন ছাড়া কোথাও ঈদের কোনো আনন্দ ফূর্তি না দেখে একটু হতাশই হলাম। শতকরা ছিয়ানব্বইজন মুসলমানের দেশে এ কেমন ঈদ!

বিমান বন্দর থেকে সমুদ্রের ভেতর দিয়ে তৈরি ছয় কিলোমিটার কৃত্রিম সড়ক ধরে হুলহুমালেতে আমাদের হোটেলে পৌঁছাতে হবে। ট্যাক্সি অথবা নির্ধারিত রুটের বাসে চেপে হুলহুমালেতে পৌঁছানো যায়। তবে বাসের ভাড়া শুনলে পিলে চমকে যেতে পারে। মাত্র ছয় কিলোমিটারের বাস ভাড়া আঠারো ডলার বা বাংলাদেশী টাকায় দুই হাজার টাকা। আমাদের অবশ্য

বাস ধরার কোনো ব্যাপার ছিল না। আগে থেকে বুক করা হোটেলের প্রতিনিধি নাম লেখা বোর্ড হাতে অপেক্ষা করছিল। ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমসের দরজা পেরিয়ে বাইরে বোরোতেই দেখা গেল অসংখ্য হোটেলের নাম লেখা কার্ড হাতে নিয়ে দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে আছে হাস্যোজ্জ্বল তরুণ তরুণী। এদের মধ্যে থেকে নিজের নাম বা হোটেল খুঁজে বের করাটাও সহজসাধ্য নয়। বুঝলাম মালদ্বীপের মালামাল যা আসে তা এই পর্যটন ব্যবসা থেকেই। অর্থাৎ দেশটি মূলত হোটেল সর্বস্ব দ্বীপ রাষ্ট্র।

আমাদের পথ প্রদর্শক আরো একজন যাত্রীর অপেক্ষায় ছিলেন, তিনি কোনো একটি দ্বীপ থেকে এয়ারপোর্টে আসবেন এবং সেখান থেকে একই গাড়ির যাত্রী হয়ে হোটেলে যাবেন। মালের ভেলানা এয়ারপোর্টটা ছোট, কিন্তু বেশ গোছানো, ছিমছাম। আমরা একটা ওয়েটিং এলাকায় বসেছিলাম, সেখানে বড়ো পর্দায় ফুটবল খেলা চলছিল। আমাদের ফুটবল দেখায় মন নেই, দেড়টা বাজতে চললো, যতো তাড়াতাড়ি হোটেলে পৌঁছানো যায়! মিনিট পনের পরে হোটেলের ছেলেটি এসে জানালো তোমাদের দেশি ভাই, মাফুশি থেকে যার আসবার কথা ছিল তার সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে তিনি এবেলা আসবেন না। অতএব আমরা চারজন দীপু, খোকন, হেনা এবং আমি একটা ছয় সিটের গাড়িতে চেপে দুপাশের নীল সমুদ্রে চোখ রেখে মিনিট পনেরর মধ্যেই পৌঁছে গেলাম হুলহুমালে।

সংযোগ সড়ক থেকে শহরে ঢুকে পড়ার পরে চোখে পড়ে জনবিরল সুদৃশ্য শহর। ঝকঝকে দালান কোঠা, বাণিজ্যিক ভবন এবং বসত বাড়ি মিলিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট আধুনিক জনপদ। আমাদের বাহন মূল সড়ক থেকে ডাইনে মোড় ঘুরে এগোতে শুরু করলে বাঁ হাতের দিকে যতো দূরে চোখ যায় কেবলই সমুদ্র, গাঢ় নীল জলের সমুদ্র থেকে ছোট ছোট ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। এক চিলতে বেলাভূমিতে কিছু সবুজ গাছপালা ছাড়া জায়গায় জায়গায় ওয়াটার স্পোর্টসের বিপনি বিতান নানা ধরনের জলক্রীড়ার সামগ্রী সাজিয়ে বসে আছে। ডান দিকে সারি সারি হোটেল রেস্টুরেন্ট আর পান্থনিবাস। এ সব হোটেলের সাগরমুখি ব্যালকনিতে বসে সারাদিন সাগরের ঢেউ গোণা যায়। আবাসিক হোটেলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে স্থানীয় অধিবাসিদের কিছু বাড়ি ঘরও নিশ্চয়ই আছে। তবে পর্যটক চাহিদার কাছে মার খেয়ে তারা পিছু হটে হোটেলগুলোর পেছনে গলির ভেতরে ঠাঁই নিয়েছে।

আমাদের হুভান বিচ হোটেলের সামনের অংশ রেস্তোঁরা আর রিসেপশন পেছন দিকে। ছোট্ট রিসেপশন কাউন্টারে বসা ছেলেটা ইংরেজিতে পাসপোর্ট চাইবার পরে পরিস্কার বাংলায় বললো, 'এখানে আমাদের বাংলায় কথা বলায় নিষেধ আছে, তারপরেও দেশের মানুষের সাথে কথা না বলে তো পারা যায় না৻ পাসপোর্ট স্ক্যান করার পরে যে বেলবয়কে লাগেজ নিতে ডেকে পাঠালো সেও বাংলাদেশী। জিজ্ঞেস করে জানা গেল শুধু এই হোটেলে নয়, প্রায় সবগুলো হোটেল রেস্টুরেন্টের কর্মকর্তা কর্মচারিদের শতকরা সত্তুর ভাগই বাংলাদেশী। কুমিল্লা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, মাদারিপুর,

রাজধানী মালে- সমুদ্র তীরের মসজিদ

মুনশিগঞ্জ সব এখানে একাকার। বাংলাদেশের পরেই শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান এবং নেপালের জনশক্তি মালদ্বীপের বিভিন্ন সেক্টরের চাকা সচল রেখেছে। ভারতীয়েরা যে নেই তা নয়, তবে তারা একটু উচ্চ পদস্থ, তাদের সংখ্যাধিক্য হোয়াইট কলার জবে।

বিদেশে বেড়াতে এসে ঘরে শুয়ে বসে সময় কাটানোটা খুব কাজের কথা নয়। কাজেই সিদ্ধান্ত হলো বিকেল চারটার দিকে নগর দর্শনে বেরিয়ে পড়বো। মাত্র চার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের হুলহুমালে কোনো প্রাকৃতিক দ্বীপ বা সমুদ্রে জেগে ওঠা প্লাবন ভূমিও নয়। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, তবে সত্যিটা হলো সমুদ্রে বালি ঢেলে মানুষের তৈরি কৃত্রিম এই দ্বীপ দৈর্ঘ্যে আড়াই কিলোমিটারের কম এবং প্রস্থে এক কিলোমিটার। এইটুকু শহর তো পায়ে হেঁটেই পাড়ি দেওয়া যায়। প্রতিদিন সকালে রমনা পার্কে আমাদের একটি পূর্ণাঙ্গ চক্কর আড়াই কিলোমিটারের মতো। ফলে আমার চরণ যুগল যথেষ্ট অসহযোগিতা করলেও সাহস করে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গেলেও হুলহুমালের সূর্য যে পশ্চিম আকাশে তীব্র তাপ ছড়িয়ে অবস্থান করছে তা আমাদের হিসাবের বাইরে ছিল। ফলে প্রায় ঠা ঠা রোদের মধ্যে প্রথমে সাগরের তীর ধরে, তারপরে বাঁয়ে ঘুরে শহরের প্রধান সড়ক ধরে হাঁটতে শুরু করলাম।

প্রশস্ত রাস্তার দুপাশে ফুটপাথে সবুজ গাছপালা এবং বিপনি বিতান, কফিশপ, রেস্টুরেন্ট, ছোট ছোট স্টেশনারি দোকান এবং লন্ড্রিসহ সব ধরনের কেনাকাটার ব্যবস্থা চোখে পড়ে। কিছু দোকান অবশ্য ঈদ উপলক্ষে দরজায় ছুটির নোটিশ দিয়ে বন্ধ করে রাখা। আমরা সবুজ বড়ো পাতাওয়ালা গাছের ছায়ায় সামনে এগোতে থাকি। জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি সামনেই হাই ফাই প্লাজা থেকে বাঁয়ে ঘুরে গেলে সেন্ট্রাল পার্ক

মিনিট দশকের পথ। রাস্তায় খুব স্পষ্ট করে জেব্রাক্রসিং আঁকা। পথচারিকে জেব্রায় পা রাখতে দেখলেই পথে চলাচলকারি গাড়ি এবং মোটর বাইক থেমে যাচ্ছে অথবা তাদের গতি কমিয়ে পথচারিকে পার হয়ে যাবার সুযোগ দিচ্ছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হাইফাই প্লাজায় পৌঁছে দেখলাম এটা হাইফাই নয়, আসলে হাই ফাইভ! তবে শপিং কম্প্লেক্স না বলে এটাকে একটা বাজার বলা যায়। বাইরের অংশে দীর্ঘ সারিতে ফলমূল সবজির সাজানো দোকান আর ভেতরের দিকে জামা জুতা পোশাক পরিচ্ছদ খেলাধুলার জিনিস, ছাতা লাঠি ব্যাগ ঘড়ি এবং ইলেক্ট্রনিকস সামগ্রী। মাঝে দুটো ওষুধের ফার্মেসি একটা বেকারি এবং কয়েকটা খাবারের দোকান। বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতেই পেয়ে গেলাম কাঙ্ক্ষিত এটিএম বুথ।

একটা পর্যটন শহরে এটিএম বুথ থাকবেনা এটা ভাবাই যায় না। আমাদের লাঞ্চ ডিনার সবই ভ্রমণ প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে নগদ টাকা পয়সার তেমন প্রয়োজন মনে করিনি তবে প্রথম দিন রাতের খাবার এবং চা কফি, সুভ্যেনিয়ারসহ টুকটাক কেনাকাটার জন্যে হাতে কিছু রুপাইয়া থাকা দরকার। ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া, ভারত এবং পাকিস্তানে রূপি মালদ্বীপে এসে একটু দীর্ঘ উচ্চারণে হয়ে গেছে রুপাইয়া। তা তো হতেই পারে, কারণ রুপিয়া এবং রূপির চেয়ে রুপাইয়ার দাম বেশি। দুর্মূল্য ডলারের বিনিময়ে রুপাইয়া সংগ্রহ না করে এটিএম বুথে কার্ড ঢুকিয়ে বোতাম টিপে দিলাম, পাঁচশ রুপাইয়ার দুটি ঝকঝকে নোট বেরিয়ে এলো। কিন্তু মেশিন থেকে যে প্রিন্টেড রিসিট পেলাম তাতে স্পষ্ট লেখা একহাজার একশ রুপাইয়া! এক হাজার একশ রুপাইয়ার মধ্যে হাতে পেলাম এক হাজার কিন্তু আমার এ্যাকাউন্ট থেকে ডেবিট হয়ে গেল সাতাত্তর দশমিক সাত পাঁচ ডলার! অর্থাৎ প্রায় নয় হাজার দুশ টাকা।

ঈদ শোভাযাত্রায় নারিকেল পাতার মাছ হুলহু মালে

আমি যখন এটিএম বুথে টাকা তোলায় ব্যস্ত তখনই মনে হচ্ছিল লাউডস্পিকারে হিন্দি গান বাজছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে রাস্তায় যাবার জন্যে দীপু খোকন আমাকে ডাকাডাকি করছে। আহত পা টেনে যতো দ্রুত সম্ভব রাস্তায় উঠে দেখলাম নারিকেল পাতায় তৈরি দীর্ঘ এক মাছ নিয়ে, মাছ ধরার পলোর মতো পাতার টোপর মাথায় দিয়ে সারা গায়ে সাদা অথবা কালো রং মেখে আবার কেউ কেউ মাথায় বা শরীরে নারিকেল পাতার ঝালর বেঁধে আনন্দ শোভাযাত্রায় মেতে উঠেছে। শোভাযাত্রার সামনে একটা খোলা ট্রাকে লাউডস্পিকারে বাজছে সেই গান, যে গানের মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝলেও মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে 'ঈদ মোবারক'। আমি যাকে হিন্দি মনে করেছিলাম তা আসলে মালদিভিয়ান ভাষা, গানের সুরের কারণে হিন্দি বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।

ঈদের আনন্দ মিছিল একটা আবাসিক এলাকা থেকে বেরিয়ে সম্ভবত মূল সড়ক ধরে এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছিল। আমরা কয়েকজনসহ আরো অনেক কৌতূহলী পর্যটক এবং স্থানীয় মানুষ রাস্তার মোড়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিল এই দৃশ্য। এই সময় দেখলাম হাই ফাইভ এবং হাউজ বিল্ডিং করপোরেশন এইচডিসি ভবনের মধ্যবর্তী সড়কে প্রস্তুতি নিয়ে থাকা সাদা কালো রং মাখা ছেলের দল এবং সাদা কাপড়ে মোড়া মেয়েরা লম্ফঝম্ফ দিয়ে মিছিলে যোগ দিতে যাচ্ছে। নতুন দল যোগ দেবার পরে মাইকে গান বন্ধ রেখে এবং পাতার তৈরি দীর্ঘ কুমির অথবা মাছ নিচে নামিয়ে যারা অপেক্ষা করছিল তারা দ্বিগুণ উৎসাহে আবার শোভাযাত্রা নিয়ে এগোতে শুরু করলো। আবার শুরু হলো সেই গান যার মাঝে মাঝে একমাত্র বোধগম্য শব্দ ঈদ মোবারক!

আনন্দ মিছিলের পেছনে খানিক দূর হাঁটার পরে শোভাযাত্রা ঘুরে উল্টো দিকে যাত্রা করলে আমরা এগোতে থাকলাম সেন্ট্রাল পার্কের দিকে। পার্কের পথে আরো অনেক নারী পুরুষ শিশুকেই দেখা গেল একটা উৎসব উৎসব ভাব নিয়ে সকলেই ছুটছে। মেয়েদের বেশিরভাগ কালো বোরকায় আবৃত হলেও সবারই মুখ খোলা। পাশাপাশি জিনস, টপস পরা উচ্ছ্বল তরুণীদের মাথায় হিজাব! তরুণদের মুখে দাড়ির আধিক্য থাকলেও টুপি নেই, আলখাল্লা বা জুব্বাও চোখে পড়েনি!

সেন্ট্রাল পার্কের ভেতরে সবুজ শ্যামল প্রকৃতি, নানা ধরনের বৃক্ষলতা এবং ফুলের সমারোহের পাশাপাশি সুদৃশ্য আধুনিক স্থাপনা স্থানীয় মানুষ এবং পর্যটকদের জন্য চারিদিকে সমুদ্র ঘেরা শহরে ভিন্ন ধরনের অবকাশ যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই পার্কে ঢুকবার জন্যে কোনো প্রবেশ মূল্য নেই, এখানে আছে হেঁটে বেড়াবার ওয়াকওয়ে, ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইজ কর্নার, শিশুদের জন্য বিনোদন ব্যবস্থা এবং বাঁধানো জলাধার। আশেপাশে রেস্টুরেন্ট এবং আইসক্রিম পার্লারও আছে কয়েকটা। শুধু জিমে ঢুকে শরীর চর্চার জন্যে নির্ধারিত মূল্য দিতে হয়, বাকি সবই ফ্রি। মাত্র চার বর্গ কিলোমিটারের একটি শহরে এতো বড়ো দৃষ্টি নন্দন একটি উদ্যানের কথা আমরা

ভাবতেও পারি না। ঈদের দিন বলেই হয়তো আজ উদ্যানে ছুটির আমেজ, বিপুল সংখ্যক নারী পুরুষ শিশুর কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছে বিকেলের সেন্ট্রাল পার্ক। অনেকটা পথ হাঁটার পরে আমরা একটা বসার জায়গা খুঁজছিলাম, কিন্তু বেশিরভাগই বেঞ্চ আগে থেকেই দখল হয়ে আছে। ঘাসের বুকেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন অনেকেই। আমরাও কষ্ট করে ঘাসেই বসে পড়বো কিনা ভাবছিলামি, এই সময়েই একটা বেঞ্চ খালি পেয়ে বসে পড়লাম।

দুজন বেঞ্চে বসে থাকি আর দুজন এদিক সেদিক ঘুরে আসি, নয়তো বেঞ্চের দখল চলে যেতে পারে। এ ভাবেই কৃত্রিম পাহাড়ে শিশুদের আরোহন অবরোহন আর বাঁধানো ছোট্ট জলাধারে গুটিকয় কচ্ছপের জলক্রীড়া দেখে এবং কাঠের সাঁকোতে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে বেঞ্চে এসে কিছুক্ষণ বসে ফিরতি পথ ধরলাম। এবারে হাই ফাইভ থেকে একটু এগিয়ে যেখানে রাস্তার কোনায় তিনতলা একটা ভবনের মাথায় বিশাল একটা মুরগির রোস্ট ঝুলছে সেখান থেকে সোজা চলে গেলাম সমুদ্র তীরে। সেখান থেকেই যে বেলাভূমির শুরু তার নাম হুলহুমালে পাবলিক বিচ! এখানে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতের অনেকটাই হোটেল ব্যবসায়ীদের দখলে। সেই কারণে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত সৈকতের পরিচিতি সংরক্ষণও জরুরি।

সাগরের মৃদু গর্জন শুনতে শুনতে আমরা বেলাভূমি ধরে হাঁটতে থাকি। বেলা পড়ে এসেছে বলে সাগরের জলে ভাসা মানুষের চেয়ে তীরে ঘুরে বেড়ানো মানুষের সংখ্যা বেশি। কয়েকটা জেট স্কি গোঁ গোঁ শব্দ তুলে পেছনে সাদা জলরাশি আর দুপাশে তরঙ্গ তুলে ছুটে বেড়াচ্ছে। দুটি জেট স্কি মনে হলো পরস্পরের সাথে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। কখন যে একটার সাথে আরেকটা টক্কর খেয়ে উল্টে যায় কে জানে! অবশ্য স্কির যাত্রীরা সকলেই লাইফ জ্যাকেট পরে আছে। তাছাড়া সাঁতার জানা না থাকলে জেট স্কি চালাতে দেবার নিয়ম নেই। এই বিশাল সমুদ্রে নৌকা উল্টে পানিতে পড়লে মহা সাঁতারুর পক্ষেও জল কেটে তীরে ফেরা কঠিন হবে। কায়াকিং এর নৌকাগুলো অবশ্য ধীর লয়ে দাঁড় টেনে চলাচল করছে। ওদের গতি নেই, ব্যস্ততা নেই, তীরে ফেরার তাড়াও আছে বলে মনে হয় না। আমরাই বরং সাগরের তীর ধরে ধীরে ধীরে হোটেলের পথে এগিয়ে যাই।

চলার পথে মাঝে মাঝেই নারিকেল গাছ ছাড়াও অন্যান্য গাঢ় সবুজ পাতা গাছের দেখা মেলে। কেয়া ফুলের একটা বিশাল ঝোপ দাঁড়িয়ে আছে অনেকটা জায়গা জুড়ে। বেলাভূমির পর্যটকদের বিশ্রামের জন্য কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরি কয়েকটা চৌচালা চোখে পড়ে একটা চৌচালার পাটাতন জুড়ে নারী পুরুষ শিশু মিলিয়ে পনের কুড়িজন শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। বোঝা যায় এটা একই পরিবারের অথবা ঘনিষ্ঠজনদের সমাবেশ। চৌচালার কাছাকাছি তীরের বালিতে কালো বোরকায় আবৃত তিনজন নারী এবং সাথে দুজন কিশোর ফুটবল খেলছে। অবশ্য ফুটবলে লাথি মারার তুলনায় ছোটাছুটি এবং হৈ চৈ বেশি।

মাফুশি দ্বীপে ঈদের রংখেলা

কিছু পরপরই একটা দুটো ওয়াটার স্পোর্টসের দোকান। জেট স্কি, বানানা বোট, কায়াকের নৌকা, লাইফ জ্যাকেটসহ আরও অনেক রকম সরঞ্জাম এ সব দোকান থেকে ভাড়া নেয়া যায়। বাইরে দীর্ঘ মূল্য তালিকায় নাম এবং দাম লখা আছে। একটু এগিয়ে পাওয়া গেল আকারে খুব ছোট হলেও এটা একটা সত্যিকারের চিড়িয়াখানা। অবশ্য চিড়িয়া মানে যদি পাখি হয় তাহলে তাহলেই এটাকে চিড়িয়াখানা বলা যায়। খাঁচার ভেথরে ময়ূর আর বাইরে গোটা কয়েক রঙিন লেজঝোলা কাকাতুয়া দাঁড়ে বসে ডানা ঝাপাটাচ্ছে। ওদের উড়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, সবার পায়ে শেকল বাধা। বড় আকারের রঙিন পাখিগুলোর সাথে অনেকেই ছবি তোলে। আমরা কিছুক্ষণ পাখিদের চেঁচামেচি শুনে পাখির সাথে ছবি তুলে বালির পথ ছেড়ে বাধানো রাস্তায় নেমে এলাম।

পরদিন ভোরে ব্রেকফাস্টের আগেই হুভান বিচ হোটেলের সামনের রাস্তাটুকু পেরিয়ে চলে গেলাম সমুদ্রের কাছাকাছি। সামনে প্রায় নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্র আর বেলাভূমি জুড়ে ঝকঝকে রোদের সকাল। আমার সফরসঙ্গীরা নারিকেল গাছের সারি আর নাম না জানা বড় বড় পাতার কয়েকটা সবুজ গাছের ফাঁকে ফাঁকে বালিতে পেতে রাখা আসনে বসে আমি বহুদূর বিস্তৃত সমুদ্র আর কূলে এসে ছুঁয়ে যাওয়া ছোট ছোট ঢেউ দেখি। ক্রমেই দূরের সাগর তীরে সবুজ ঝোপের দিকে এগিয়ে যাওয়া আমার সফর সঙ্গীদের একজনের নাম ধরে জোরে চিৎকার করে বললাম, 'আর দূরে যেও না। ব্রেকফাস্টের পরে মাফুশি যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

হুলহু মালে সাগরতীরে নারিকেল গাছের সারি

সম্ভবত আমার বাংলায় করা চিৎকার আমাদের মতোই সমুদ্র তীরে হেঁটে বেড়ানো এক তরুণের কানেও পৌঁছেছিল। তিনি ধীর পায়ে হেঁটে এসে আমার কাছাকাছি দাঁড়ালেন। কথা শুরু হলো আমরা পশ্চিম বাংলা থেকে এসেছি কিনা দিয়ে। তারপর যখন জানলেন ঢাকা থেকে তখন স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পুরুষের ভিটেমাটি থেকে তাঁর কাহিনি শুরু হলো। তরুণ প্রকৌশলীর ঠাকুরদা ময়মনসিংহের আর ঠাকুরমা বিক্রমপুরের। কলকাতার বাসায় বাবা মা এখনো পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলেন... ইত্যাদি। কথায় কথায় জানা গেল, তিনি মালে থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার দূরের একটি দ্বীপে বড় একটি নির্মাণ কাজের তদারক করছেন। গতকাল কলকাতা থেকে মালদ্বীপে এসেছেন, আজই তাঁর কর্মক্ষেত্রে চলে যাবেন। কথপোকথনের এক পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানতে চাইলেন। বললাম, 'নতুন করে বলার কিছু নেই। দেশে উন্নয়নের পাশাপাশি ঘুষ-দুর্নীতি, মন্ত্রী শান্ত্রীদের লুটপাট, ব্যাংক থেকে টাকা পাচার এইসব ভালোমন্দ মিলিয়ে চলছে। মানবাধিকার বাকস্বাধীনতা এসব বললে অনেক কথা বলা যায় তবে আসল কথা দেশের মানুষ খেতে পাচ্ছে, গরীব মানুষের জন্য বিভিন্ন ভাতা চালু করছে সরকার, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব ভালো না হলেও দ্রব্যমূল্য মোটামুটি স্থিতিশীল।' 'দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল হলেও সরকার কী স্থিতিশীল? আপনার কি মনে হয়?' জানতে চান প্রকৌশলী। 'আওয়ামী লীগ চতুর্থ বারের মতো সরকার গঠন করেছে। কে ভোট দিয়েছে না দিয়েছে সেটা বিবেচ্য নয়, গত জানুয়ারিতে একটা নির্বাচন হয়েছিল এবং দেশে

একটা শক্তিশালী নির্বাচিত সরকার আছে।' 'আপনি কি নিশ্চিত? বাংলাদেশে বোধহয় শিগগিরই একটা বড় রকমের পরিবর্তন হতে যাচ্ছে।'

'তাই নাকি? আমরা দেশে থেকে জানি না, আপনি এ খবর কোথায় পেলেন?' 'কলকাতায়। কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর আড্ডায়...'

তিনি হয়তো আরও কিছু বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দীপু খোকন হেনা ইতিমধ্যেই তাদের বেলাভূমি পরিদর্শন শেষে ফিরে এসেছে, পরবর্তী গন্তব্যে যাবার সময় হয়ে এসেছে। প্রকৌশলীর শেষ কথা আর শোনা হলো না, অবশ্য তাঁর কথায় আমি কোনো গুরুত্বও দিইনি। নাম না জানা প্রকৌশলীর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে হুভান বিচ হোটেলের রেস্টুরেন্টে নাস্তা করে রুমে ফেরার কিছুক্ষণ পরেই রিসেপশান থেকে ফোন করে জানালো, গাড়ি এসে গেছে। 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, দিতে হবে সমুদ্র পাড়ি...' অতএব আমরা নিচে নেমে লাগেজসহ গাড়িতে উঠে বসলাম এবং সমুদ্র সৈকতে বসে ভারতীয় তরুণ প্রকৌশলীর বলা কথাগুলো পুরোপুরি ভুলে গেলাম।

২.

মালদ্বীপ নামের দেশটিতে দ্বীপের সংখ্যা বারশ'র মতো। নব্বই হাজার স্কয়ার কিলোমিটার আয়তনের দেশটির বেশির ভাগই জল। দেশের সাড়ে নিরানব্বই শতাংশেরও বেশিবিস্তৃত সাগরের নীল সবুজ জলের ভেতর এখানে সেখানে একটুখানি মাটি বা সামান্য ভূখণ্ড মাথা তুলে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। তবে তিনশ বর্গ কিলোমিটারেরও কম আয়তনের বিপুল সংখ্যক দ্বীপভূমির মধ্যে মানুষের বসবাস মাত্র একশ পঁচাশিটি দ্বীপে। ভাবতে অবাক লাগে এই রাজধানীর সাথে কিংবা এক দ্বীপের মানুষের সাথে আরেক দ্বীপের বাসিন্দাদের যোগাযোগ, নিত্য দিনের প্রশাসনিক বা দাপ্তরিক কাজকর্ম, পড়াশোনা, ব্যবসা বাণিজ্য বা বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ ব্যবস'া চালু রাখা কীভাবে সম্ভব!

যে কোনো দ্বীপে যাবার জন্যে জলপরিবহনের প্রধান টার্মিনাল ভেলেনা বিমান বন্দরের সাথে যুক্ত। মালদ্বীপে একটি বা দুটি দ্বীপ থেকে ঘুরে না এলে এদেশে আসার কোনো মানেই হয় না। মাফুশি, গুলহি, বারোস, দ্বিগুরাহ, আলিমাথা এমন অসংখ্য জনপ্রিয় দ্বীপের মধ্যে আমরা বেছে নিয়েছিলাম দূরত্বের দিক থেকে কাছাকাছি এবং তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল মাফুশি আইল্যান্ড।

বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তাটুকু পার হলেই সাগরের তীর ধরে দীর্ঘ নৌযানের সারি। বিশ্বের যে কোনো বিমান বন্দরের বাইরে যেমন সারি সারি ট্যাক্সি যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে অনেকটা তেমনি সমুদ্রের স্বচ্ছ নীল জলে ভাসছে স্পিডবোট। মূল টার্মিনাল থেকে কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি বোর্ডিংব্রিজ সমুদ্রের জলে খানিকটা এগিয়ে গেছে। বিভিন্ন গন্তব্য থেকে ভেসে আসা স্পিডবোটগুলো টার্মিনালের বোর্ডিংব্রিজে এসে যাত্রী নামিয়ে দিচ্ছে, কিংবা থেমে থাকা স্পিডবোট

এসে ভিড়ছে বোর্ডিংব্রিজে। যাত্রীদের নামার পরে ওঠা শেষ হলেই ছুটছে নতুন গন্তব্যে, কোনো একটি দ্বীপে। মাফুশি দ্বীপের হোটেল এ্যারিনার নিজস্ব নৌযান ঘাটে এসে ভিড়লে আমরা একই হোটেলের যাত্রীরা একে উঠে বসলাম স্পিবোটে। প্রথমে একটু আস্তে ধীরে যাত্রা করলেও মুহূর্তের মধ্যেই পূর্ণোদ্যমে ছুটতে শুরু করলো আমাদের নৌযান।

একাধিক ইঞ্জিনের একটানা গোঁ গোঁ শব্দ, দুপাশ দিয়ে মাঝে মধ্যেই ছলকে ওঠা জলের ঝাপটা আর স্পিডবোটের পেছনে বিপুল জলরাশির ক্রমাগত পেছনে ছোটা দেখতে দেখতে কূল কিনারা বিহীন বিশাল সমুদ্রে প্রায় চল্লিশ মিনিট একটানা ছুটে চলার পরে স্পিডবোটের গতি কমতে থাকে। একটা পাথুরে টি বাঁধ হাতের বাঁয়ে রেখে ধীরে ধীরে ঘাটের দিকে এগিয়ে যায় আমাদের জলযান। চোখে পড়ে বড় ইংরেজি হরফে লেখা মাফুশি আর তার পেছনে সড়ক পথে টেম্পো বা পিকআপ ভ্যানের মতো দু চারটি ছোট যানবাহন। ঘাটে নোঙর করা সারি সারি নৌযানের ভেতরে জায়গা করে নিয়ে থেমে যায় আমাদের স্পিডবোট। একে একে সকলে নেমে পড়লে হোটেল এরিনার প্রতিনিধি ‘ফলো মি’ বলে বাঁ দিকে হাঁটতে শুরু করে। লাগেজ কীভাবে হোটেলে পৌঁছাবে তা নিয়ে অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ততোক্ষণে একটা পিকআপে লাগেজ লোড করা শুরু হয়ে গেছে। জানা গেল মালপত্র গাড়িতে করে হোটেলের লবিতে পৌঁছে যাবে, আর আমাদের যেতে হবে পায়ে হেঁটে। অবশ্য ছেলেটি আমাদের আশ্বস্ত করে বললো, মাত্র মিনিট পাঁচেকের পথ।

আমরা অপ্রশস্ত পথ ধরে দু পাশের ওয়াটার স্পোর্টসের আউটলেট এবং রেস্টুরেন্টগুলো দেখতে দেখতে সামনে এগোচ্ছি। হঠাৎ দেখা গেল একদল কিশোর হাতে রবারের গোলকে ভরা রঙ নিয়ে হৈ হৈ করে ছুটতে ছুটতে পরস্পরের প্রতি রঙ ছুঁড়ে দিচ্ছে। অনেকটা আমাদের দেশে দোলযাত্রার দিনে হোলি খেলার মতো জামা কাপড়ে, চোখে মুখে, সারা শরীরে রঙ মেখে ছোটাছুটি করতে দেখে বুঝলাম নিশ্চয়ই কোনো একটা উৎসব চলছে। ওরা পথচারি বা পর্যটকদের কারো গায়ে রঙ ছুঁড়ে মজা করতে আসেনি, বরং আমরাই এগিয়ে দুই একজনকে পাকড়াও করে জানতে চাইলাম এই আনন্দ উৎসবের কারণ কী? ওদের ভাষ্য থেকে যা জানা গেল তাতে তো আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। এই রঙখেলা আয়োজন পবিত্র ঈদ উল আজহা উপলক্ষে! ওদেরকে বাংলায় বললাম, ‘বৎসগণ! গতকাল হুলহুমালে শহরের আনন্দশোভাযাত্রা ও ভূতনৃত্য আর আজকের এই হোলিখেলা মালদ্বীপে চালিয়ে যাও ভালো, ভুলেও বাংলাদেশে এভাবে ঈদের আনন্দ দেখাতে যেও না। মুমিন মুসলমানদের কিল কিন্তু একটাও মাটিতে পড়বে না।’ মাছ শিকারি জেলে সমাজের পুরোনো দিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখা এই কিশোর কিশোরীর দল কী বুঝলো আল্লামালুম। দীপুর আহবানে ওরা লাইন ধরে আমাদের সাথে ছবি তুলতে দাঁড়িয়ে গেল।

মাফুশির রাস্তায় জলক্রীড়া সামগ্রীর দোকান

মাফুশি দ্বীপের চারিদিকেই সমুদ্র বলে বেশিরভাগ হোটেলই সাগরতীরে। আমরা পায়ে চলা পথ ধরে এরটি বড় হোটেল পার হতেই পরপর তিনটি ভবনে এরিনা গ্রুপের তিনটি হোটেল। আমাদের জায়গা হলো শেষপ্রান্তে একেবারে নতুন এরিনা বিচ হোটেলে, যার নির্মাণ কাজই এখনো শেষ হয়নি। ওয়েলকাম ড্রিংকসের পরে চেকইনের ফর্মালিটি শেষ করতেই আড়াইটা বেজে গেল। আমি রিসেপশনে জিজ্ঞেস করলাম, 'লাঞ্চ আওয়ার ক'টা পর্যন্ত?' সে অম্লান বদনে জানালো তিনটা পর্যন্ত। 'আমাদের খাবার ব্যবস্থা না করে যদি শোবার ব্যবস্থা করো, তাহলে তো দুপুরে শেষ পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে হবে।'

এই কথার পরে রিসেপশন থেকে রুম বরাদ্দ না করে একন বেলবয়সহ আগে আমাদের রেস্টুরেন্টে পাঠিয়ে দিল। রেস্টুরেন্ট বলতে হোটেলের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভবনের মুখোমুখি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে একসাথে অন্তত দুশজনের বুফে খাবারের ব্যবস্থা। প্রথম সাত আট সারি টেবিলের মাথার উপরে আচ্ছাদন থাকলেও বাইরে আরও কয়েক সারি টেবিল রেস্টুরেন্টের ছাদের সীমানা ছাড়িয়ে সাগরের দিকে এগিয়ে গেছে। আমরা সমুদ্র সান্নিধ্যে এগিয়ে যাবার পরিবর্তে প্লেটে খাবার তুলে সার্ভিস টেবলগুলোর কাছাকাছি বসে পড়লাম। পৌনে তিনটায় রেস্টুরেন্টে ঢুকে সবগুলো ডিশ পরিপূর্ণ থাকবে অথবা শিগগিরই রিফিল করা হবে এমনটা আশা করা যায় না। তারপরেও বিচিত্র রূপরস স্বাদগন্ধের উপাদেয় খাবারের কমতি ছিল না। লাঞ্চ শেষে রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে সোজা উর্ধ্বলোকে নিজেদের ঘরে ঢুকে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

আমাদের কক্ষটা সাগরমুখি না হলেও ব্যালকনিতে বের হলে সমুদ্র চোখে পড়ে। দেখলাম এই অবেলাতেও স্নানার্থীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। আমাদের সমুদ্র স্নানের ইচ্ছে না থাকলেও বেলাভূমিতে বালিতে চরণ চিহ্ন রাখার ইচ্ছেটা প্রবল। তাই বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হবার আগেই বেরিয়ে পড়লাম। হোটেল এলাকার শুরু থেকেই পথের ডাইনে সমুদ্র আর বাঁ দিকে হোটেল রেস্টুরেন্ট এবং সরু সরু গলি পথ চলে গেছে অপরিসর মাফুশি শহরের ভেতরে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে সামনে এগোলে দেখা যায় সমুদ্র তীর আর মাফুশি দ্বীপের মূল সড়কের মাঝখানে জলক্রীড়া ব্যবস্থাপনার ছোট বড় দোকান। এ সব দোকানে উচ্চস্বরে বেজে চলেছে হিন্দি অথবা ইংরেজি গান। দুটি দোকানের মাঝ দিয়ে বিস্তৃত বালির নাতিদীর্ঘ চত্বর পেরোলেই নীল সমুদ্র। বেশ কয়েকজনকে দেখা গেল জেট স্কি চালিয়ে সাগরের নীল জলে ছুটে বেড়াচ্ছে। মোটরযানের মতো কমলা রঙের জলযান ভাসছে সাগরে, দূরে কায়াকিংএর কয়েকটা নৌকায় দুজন করে যাত্রী বৈঠা মেরে চলে যাচ্ছে দূরে। কয়েকজন শিশু কিশোর কূলের কাছাকাছি পানিতে নেমে হুটোপুটি করছে।

সূর্যাস্তের খুব বেশি দেরি নেই। দুপাশে বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে বাঁধানো একটা বাঁধ সমুদ্রের ভেতরে চলে গেছে। পাথুরে মাটির ভেতর দিয়ে ছোট ছোট নারিকেলের চারা আর নাম না জানা লতাগুল্ম মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সেই বাঁধের শেষ প্রান্তে এবড়ো থেবড়ো পাথরের মধ্যোনিকটা জায়গা বের করে বসে পড়লাম। আমাদের পায়ের নিচেই ছোট ছোট ঢেউ দোলা দিয়ে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের বেশি দেরি নেই। পশ্চিমের পুরো আকাশ লাল রঙের মেঘে ছেয়ে আছে। দূরে ভেসে যাচ্ছে একটা দুটো বড় জাহাজ। জেট স্কিগুলো তাদের ঘণ্টাচুক্তির মেয়াদ শেষ করে কূলে এসে ভিড়ছে। কায়াকের নৌকাগুলোও ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। একটা নৌকা থেকে হঠাৎ করেই একজন যাত্রী পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৌকাটা একহাতে ধরে সাঁতার কেটে তীরের দিকে আসছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই বোধহয় আসলে জলজ প্রাণি!

অন্ধকার হয়ে এসেছিল। একের পর এক অনেগুলো গানের পরে দীপু শেষ গান ধরলো 'আঁধার আমার ভালো লাগে...' মাফুশির সমুদ্র তীরের এই আঁধার ভালো লাগলেও আমাদের জন্যে তা কতোটা নিরাপদ তা তো আমাদের জানা নেই। ইতিমধ্যেই হোটেলগুলোর শীর্ষে নিয়ন সাইন জ্বলে উঠেছে, ঈদ উৎসবের ঝলমলে আলো সজ্জায় সেছে মাফুশির হোটেল রেস্টুরেন্ট এবং বিপনী বিতানগুলো। পথের পাশে ওয়াটার স্পোর্টসের আউটলেটগুলোও বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। অতএব এখন ঘরে ফেরার সময় হয়েছে...

নিপ্পন ॥ মামার দেশে যাই

বিশ্বজিত বড়ুয়া

জাপান দেশটার সাথে আমার সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ। বলতে পারেন, জাপান আমার কাছে একরকম মামাবাড়ি-ই আবার শ্বশুরবাড়িও। কিভাবে তা জানাচ্ছি। তার আগে পুরানো কিছু কথা বলি...

চট্টগ্রামের রাউজানে আমার মামাবাড়িতে আমার দাদু 'বিশুদ্ধানন্দ মহাথের' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'অগ্রসার অনাথালয়' নামে একটা অনাথআশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্যক্তিগত উদ্যোগে। কালের বিবর্তনে সেই ছোট অনাথআশ্রম এখন বিরাট বড় একটা প্রতিষ্ঠান। দাদু ২০০৫ সালে সমাজ সেবায় একুশে পদক (মরণোত্তর) পেয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে। এখন অনাথআশ্রম এর সাথে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, গার্মেন্টসসহ অনেক কিছুই হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল ডোনার জাপানের সরকার ও সাধারণ নাগরিকরা। জাপান থেকে তাই প্রতি

বছর বিভিন্ন বয়সের ও পেশার অনেক জাপানিজ এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে আসেন। ছোটবেলা থেকেই চাকরিতে ঢোকার আগ পর্যন্ত, পারিবারিক দায়িত্ব হিসেবে জাপানি অতিথিদের অনেককেই, আমার সময় দিতে হতো। এয়ারপোর্টে রিসিভ করা, প্রতিষ্ঠান ঘুরিয়ে দেখানো, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ওদেরকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো এইসব। সেই সূত্রে আমার জাপানিজ বন্ধুও অনেক।

আবার, আমার তিন মামাই পড়াশোনা করেছেন জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি ও কিয়োটো ইউনিভার্সিটিতে। আমার মা-ও জাপানের কিয়োটো শহরে ছিলেন বেশ কিছুদিন। সেটা ১৯৭৯ সালের দিকে। আমার মেজমামা তখন পিএইচডি করছেন কিয়োটো ইউনিভার্সিটিতে। পরে ৯০ এর দশকে আমার সেজমামা ও ছোটমামা ও টোকিও ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন মনোবুশো স্কলারশিপ নিয়ে। তারপর যাওয়া শুরু করল আমার কাজিনরা। এইচএসসির পর আমারো জাপানে পড়াশোনা করতে যাওয়া অলমোস্ট ফাইনাল হয়ে গিয়েছিল। ওখানে জাপানিজ স্কুলে আমার এডমিশন হয়ে গিয়েছিল, ল্যাংগুয়েজ কোর্সও শেষ করেছিলাম। কিন্তু কিছু পারিবারিক জটিলতার কারণে আমি অভিমান করে শেষ পর্যন্ত আর ভিসা এপ্লিকেশন সাবমিট করিনি। আমার মা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন এই ব্যাপারটায়। তার ইচ্ছে ছিল ভাতিজা-ভাতিজি, ভাগ্নে-ভাগ্নির মতো তার ছেলেরাও জাপানে পড়াশোনা করে সেখানে সেটেল করবে। তখন যাওয়া না হলেও, আমি ঠিক করেছিলাম আমি বড় হয়ে বাবা-মা কে নিয়ে জাপানে বেড়াতে যাব। মাকে সাথে নিয়ে কিয়োটোর সেই জায়গাগুলো থেকে আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো। মা সেই সুযোগ না দিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ২০১৬ সালে। এর পর কয়েকবার প্ল্যান করেও শেষ পর্যন্ত জাপানে আর যাওয়া হয়নি। আমাদের সেই বহু প্রতীক্ষিত জাপান ভ্রমণ অবশেষে আলোর মুখ দেখে ২০২৪ এর এপ্রিলে।

জাপান ও তার ইতিহাস

আমাদের জাপান ভ্রমণের পেছনের ইতিহাস তো শুনলেন, এবার চলুন জাপানের ইতিহাস নিয়েও একটু বলি। আমি নতুন কোনো দেশে যাওয়ার প্ল্যান করলে ইন্টারনেট ঘেঁটে সেই দেশের ইতিহাস আর বর্তমানটা একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি। আমার মনে হয় এতে ঘোরাঘুরির সময় মাথার ভেতরে থাকা ইতিহাস, বর্তমান আর চোখের দেখাটা মিলিয়ে ভ্রমণটা আরো বেশি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। জাপান ঘুরতে যাওয়ার আগে ইন্টারনেট, উইকিপিডিয়া আর কিছু বই পত্রের বদৌলতে যতটুকু জেনেছি তার কিছুটা আপনাদের জন্য তুলে ধরছি।

জাপানে বিদেশিদের প্রথম আগমন ঘটে ১৫৪৩ সালে এক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে। চীন অভিমুখী একটি পর্তুগিজ জাহাজ ঝড়ের কবলে পড়ে জাপানের তানেগাশিমা দ্বীপে নোঙ্গর করে এবং জাপান সম্পর্কে জানতে পারে। এর পর থেকে পর্তুগিজরা জাপানের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু করে এবং তাদের পথ ধরে ইয়োরোপের অন্য দেশগুলোও আসতে

ইয়ামাশিতা পার্কে আমি আর বাবা-যেন বড় ফুল বাবা ছোট ফুল আমি

শুরু করে। এবং জাপানে আগ্নেয়াস্ত্র, তামাক, এবং অন্যান্য পণ্য আনা শুরু করে। সেই সময়কার জাপান নিয়ে শোগুন (Shōgun) নামের অসাধারণ একটা টিভি সিরিজ শুরু হয়েছে সম্প্রতি।

যদিও জাপানি জাতি আজ শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল, এবং উন্নত জাতি হিসেবে সুপরিচিত, কিন্তু, তাদের ইতিহাসের একটি অধ্যায় সাম্রাজ্যবাদী নীতি, সামরিক আগ্রাসন ও নিষ্ঠুরতার জন্য তাদের কলঙ্কিত করে রেখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং চলাকালে চীন ও কোরিয়াসহ এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে জাপানের নানা যুদ্ধাপরাধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘন আজও ইতিহাসে জাপানের জন্য কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে রয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় তাদেরকে একটি শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে পুনর্গঠিত করে এবং আগ্রাসী মনোভাব থেকে অনেক দূরে নিয়ে আসে।

জাপানের আসল নাম হলো 'নিপ্পন' বা 'নিহন'। এর অর্থ হলো 'সূর্যোদয়ের দেশ', যা প্রাচীন চীনা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসেছে। জাপানের অবস্থান ছিল চীনের পূর্ব দিকে, যেখানে আগে সূর্য ওঠে। এই নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে ব্যবহার শুরু হয়। এখনো দুটো নামই সরকারিভাবে ব্যবহৃত হয়। আর 'জাপান' নামটি এসেছে মূলত ইউরোপীয়দের কাছ থেকে। এটি আসলে 'নিপ্পন' নামের বিকৃত চীনা উচ্চারণ। 'মার্কো পোলো' তাঁর ভ্রমণকালে চীনা বণিকদের সূত্রে জাপানকে 'জিপাং' (Zipangu) নামে উল্লেখ করেন। তিনি 'নিপ্পন' নামটি শুনেছিলেন চীনা উচ্চারণে, যা 'জিপাং' বা 'জিপাংগু' হিসেবে তার ডায়েরিতে লিখেছিলেন। এরপর, পর্তুগিজ ও স্প্যানিশ বণিকরা যখন জাপানে আসা শুরু করে, তখন তারা এই

নামটিকে নিজেদের ভাষায় রূপান্তর করে 'জাপান' নামে পরিচিত করে তোলে। ধীরে ধীরে ইউরোপজুড়ে এই নাম প্রচলিত হয়।

বসন্তের সাকুরা ও শরৎকালের মোমিজি জাপানের ঋতুচক্রের সৌন্দর্য

বছরের বিশেষ দুটি ঋতু, বসন্ত ও শরৎকালের জাপান প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। বসন্তের সাকুরা (চেরি ব্লসম) এবং শরৎকালের মোমিজি (রেড লিফ) জাপানি সংস্কৃতির অংশ এবং বিশ্বের পর্যটকদের কাছে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

প্রতিটি বসন্তে পুরো জাপানে চেরি গাছগুলি যখন গোলাপি ও সাদা ফুলে ঢেকে যায়, পুরো দেশ তখন এক স্বর্গীয় রূপ ধারণ করে। এই সময় জাপানিজরা পরিবার, বন্ধু, সহকর্মীরা সবাই মিলে একসাথে সাকুরা গাছের নিচে পিকনিক করে এবং ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করে। এটা 'হানামি', অর্থাৎ ফুল দেখা উৎসব নামে পরিচিত। জাপানে সাকুরা দেখার জন্য মাউন্ট ফুজি ও হিরোসাকির সাকুরা উৎসব খুব বিখ্যাত। এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় পার্ক।

শরৎ এসে হাজির হলে জাপানের রূপ আবারও বদলে যায়। এই সময়ে গাছের সব সবুজ পাতা লাল, হলুদ এবং কমলা রং হয়ে যায়। জাপানিজরা একে বলে মোমিজি। বসন্তে যেমন সাকুরা দেখার জন্য হানামি পালন করা হয়, শরতের মোমিজি দেখার জন্যও মানুষ 'মোমিজিগারি' পালন করে। মোমিজি দেখার জন্য কিয়োটো'র আরাশিয়ামা ও নিক্কোর তোশোগু মন্দিরের চারপাশের পাহাড় খুব বিখ্যাত।

আমি ঠিক করেছিলাম সাকুরার সময়ই বাবাকে নিয়ে জাপানে যাব। তাছাড়া ২০২৪ সালে সাকুরা আর আমাদের দেশের ঈদ-উল-ফিতরের ছুটি কাছাকাছি সময়ে হওয়ার বেশ সহজ হয়েছিল অফিসে ছুটি ম্যানেজ করাটা। জাপানিজরা কিন্তু সাকুরা ও মোমিজির ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস, প্রতিবছর তারা ফোরকাস্ট আপডেট দেয়, কবে থেকে কবে কোনো রিজিওনে পিক টাইম থাকবে। জাপানে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলে আগেই ইন্টারনেটে খোঁজখবর নিয়ে গেলে আপনার ট্যুর প্ল্যান সাজাতে সহজ হবে।

জাপানের টুরিস্ট ভিসা

প্ল্যান অনুযায়ী সব কাগজপত্র গুছিয়ে বাপ বেটায় ভিসার জন্য আবেদন করলাম বাংলাদেশের জাপানি দূতাবাসে। জাপান দূতাবাস বাংলাদেশীদের জন্য কোনো ভিসা ফি নেয় না। কাগজপত্রও খুব বেশি লাগে না। আমার লেগেছে অফিসের NOC, অফিস আইডি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, গত তিন বছরের ট্যাক্স সার্টিফিকেট, এনআইডি কপি এইসব। আর আমার বাবার রিটায়ারমেন্টের কাগজপত্র (বাবা যেহেতু সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন)। সব ডকুমেন্ট নোটারাইজড করে দিতে হয়। সমস্যা একটাই, ভিসা ইন্টারভিউ। কেন জাপান যেতে চান আর আপনি ঘোরাঘুরি শেষে দেশে ফিরে

আসবেন এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ভিসা অফিসার আপনাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলবেন। আমাদের ভিসা ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন এক বাংলাদেশী ভিসা অফিসার আপু। উনি মূলত জানতে চেয়েছিলেন, আমার আইটেনারিতে আমি জাপানের অনেক জনপ্রিয় কিছু টুরিস্ট ডেসটিনেশান কেন রাখিনি। আমি বলেছি এই ট্রিপ প্ল্যান করা হয়েছে আমার মা যেসব জায়গায় থেকেছেন এবং বেড়াতে গিয়েছেন সেইসব জায়গাকে কেন্দ্র করে। তাছাড়া বাবার হাঁটাহাঁটিতে ইদানিং একটু সমস্যা হচ্ছে, তাই বেশি হাঁটাহাঁটি করতে হবে এমন সব ডেস্টিনেশান আমরা বাদ দিয়েছি। আমাদেরকে আর কোনো প্রশ্ন করেননি উনি। কিন্তু অন্য কয়েকজন এপ্লিকেন্টের ভিসা ইন্টারভিউ দেখলাম, তাদের মোটামুটি নাকের পানি, চোখের পানি আর কপালের ঘাম এক করে দিয়েছিলেন ভিসা অফিসাররা। এই ভিসা ইন্টারভিউ উৎরাতে পারলেই পাবেন জাপানের টুরিস্ট ভিসা। টুরিস্ট ভিসার জন্য এপ্লাই করলে আপনাকে অবশ্যই এর আগে বেশ কয়েকটা দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থাকতেই হবে। আমরা ভিসা এপ্লিকেশন জমা দেওয়ার ঠিক ৭ দিন পরেই ভিসাসহ পাসপোর্ট ফেরত পেয়ে গেলাম। একটা টিপস, অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় এম্বেসির ভেতরে। সাথে ব্যাগ, মোবাইল, স্মার্ট ওয়াচ বা কোনো গেজেট নেওয়া যায় না। তাই হাতে করে বইপত্র নিয়ে গেলে সময়টা বেশ কাটবে। সম্প্রতি জাপানও অবশ্য তাদের ভিসা প্রসেসিং ভিএসএফ গ্লোবালকে দিয়ে দেবার কথা। ভিএসএফ গ্লোবালে চলে আসলে ভিসা ইন্টারভিউর আর প্রয়োজন হবে না মনে হয়।

এয়ার টিকিট ও যাত্রা

খুব ইচ্ছে ছিল বাংলাদেশ বিমানে করেই জাপানে যাব। কিন্তু বিধি বাম। বিমান ঢাকা নারিতা ঢাকার রাউন্ড টিকিট এর রেগুলার দাম রাখার কথা ৮৫ হাজার টাকা। সেই টিকিট এর দাম দেখাচ্ছে ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা তাও এক মাস পরের ট্রাভেল ডেট। এটার সত্যিকারের কারণ আমি জানি না কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম জাপানে প্রচুর নেপালি লোকজন আসাযাওয়া করে। নেপাল থেকে জাপানের অন্যান্য ফ্লাইটের দামও অনেক বেশি তাই নেপালিদের কাছে বিমানের টিকিটের চাহিদা একটু বেশিই, যার কারণে টিকিটের ডিমান্ড হাই আর এয়ারলাইনস এর নিয়মই হলো ডিমান্ড বেড়ে গেলে দাম ও অনেক বেড়ে যায়। তাই অন্য অপশনে যেতে হলো। অনেক ঘাটাঘাটি করে কম ট্রানজিট আওয়ারের ও সবচাইতে কম দামে যেই ফ্লাইটটা পেলাম, সেটা হলো চায়না সাউদার্ন এর ফ্লাইট। ঢাকা থেকে নারিতা যাবে, কিন্তু আসার সময় হানেদা থেকে আসবে, মাঝখানে ৪ ঘণ্টার ট্রানজিট চীনের গুয়াংজু শহরে। ভাড়াও অনেক কম। পার হেড ৬৯ হাজার টাকায় রাউন্ড টিকিট পেলাম ডিসকাউন্টের পর।

ঢাকা থেকে আমাদের ফ্লাইট ৫ এপ্রিল রাত ১১ টায়। এয়ারপোর্টে পৌঁছতে পৌঁছতে ৮ টা বেজে গেল। বাবার ইদানীং হাঁটুতে সমস্যা হচ্ছে। সিঁড়িতে উঠতে-নামতে আর

কিয়োটোর কোমা নদীর পারে বাবা আর আমি

বেশিক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতে কষ্ট হয়। বাবার জন্য সবসময় তাই হুইলচেয়ার সার্ভিস নিয়ে নেই আমি এয়ার টিকিটের সাথে। এটা বেশিরভাগ এয়ারলাইন্সই বিনামূল্যে দেয়। এতে একটা বাড়তি সুবিধা ও আছে এয়ারপোর্টে সব জায়গায় প্রাইওরিটি সার্ভিস পাওয়া যায়।

ইমিগ্রেশন শেষ করে ইবিএল স্কাই লাউঞ্জে হালকা ডিনার শেষে জাপানে আমাদের অপেক্ষায় থাকা সেজ মামা আর মামির সাথে ফোনে কথা বলে বাসার ঠিকানাটা নিয়ে নিলাম যেটা জাপানের ইমিগ্রেশনে এম্বারগেশান কার্ড ফিলাপ করার সময় আমাদের লাগবে।

চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইনস

বোর্ডিংয়ের সময় যথারীতি সবার আগে আমাদেরকেই প্লেনে নিয়ে গেলেন এয়ারলাইনস স্টাফরা। খুবই আন্তরিক সেবা পেয়েছি। বাবাকে দুজন এয়ার হোস্টেজ অনেক খাতির যত্ন করে আমাদের সিটে নিয়ে গেলেন। তিনজনের বসার সিট, কিন্তু বাবা ছিলেন বলে আমাদের সাথে আর কাউকে সিট দেওয়া হলো না, বাবার যেন অসুবিধা না হয়। আমাদের এয়ারক্রাফট বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার বেশ ঝা চকচকে। ফ্লাইট অন-টাইমেই ছাড়ল। সিটের ডিসতে ফ্লাইটের সব ইনফরমেশন, লাইভ লোকেশান ম্যাপ-এ দেখাচ্ছে, সেখানেই দেখলাম আমাদের প্লেন চট্টগ্রাম পর্যন্ত সোজা এসে বামে

টার্ন নিয়ে গুয়াংজুমুখি হলো। ফ্লাইট ছাড়ার কিছুক্ষণ পরেই এয়ার হোস্টেজদের ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল খাবার পরিবেশনে।

প্লেনে খেতে হবে বলে লাউঞ্জে আমি বেশি কিছু খাইনি। প্লেনের সবকিছুই চেখে দেখতে হবে। এই প্রথম চাইনিজ প্লেনে উঠেছি, কি খেতে দেয় খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছি। ডিনারে দুটো অপশন দিয়েছে। একটাতে স্ক্রাম্বল্ড এগ, চিকেন সসেজ, চেরি টমেটো, আর সটেড ভেজিটেবল আর আরেকটাতে বীফ স্পেগেটি। দুটোর সাথেই আছে একটা করে চীজ ক্রসন্ত, ইয়োগার্ট, আর ফ্রুট সালাদ। ড্রিংক্স হিসেবে যথারীতি তিন রকমের ফ্রুট জুস ও রেড এবং হোয়াইট ওয়াইন। এলাহি ব্যাপার। দুজনের জন্য দুটো অপশনই নিলাম। বাবা ডিনারে সাধারণত খুবই অল্প খান। উনি যা খাওয়ার লাউঞ্জেই খেয়ে নিয়েছেন। প্লেনে আর কিছু খাবেন বলে মনে হচ্ছে না।

বাবাকে ইন্সপায়ারড করার চেষ্টা করলাম এই বলে:

– আমরা এখন ট্যুরে আছি... ট্যুর হচ্ছে নিয়ম, রুটিন আর বিধিনিষেধ ভাঙার জন্য আদর্শ সময় ও স্থান।

বাবা এই কথায় কনভিন্সড হলেন কিনা জানি না, তবে অল্প সবজি, ফ্রুট সালাদ আর ইয়োগার্ট খেয়েই বললেন

– 'আর পারব না। বাকি সব তোর।'

ছোটবেলা থেকেই মা আমাদেরকে কখনো খাওয়ার নষ্ট করতে দিতেন না। আমি তাই কখনো কোনো অবস্থাতেই খাওয়ার নষ্ট করি না। যতটুকু খেতে পারব ততটুকুই নেই। বাবা পাশের সিটে বসে ঘুমানোর চেষ্টা করছেন আর আমি বাবা মার দোয়া মাথায় নিয়ে একটার পর একটা খাবার সাবাড় করতে থাকলাম। প্যাকেট করা ক্রসন্ত দুটো অবশ্য খাইনি। ব্যাগে রেখে দিয়েছিলাম পরে কাজে লাগবে বলে।

চাইনিজ ট্রানজিট

স্থানীয় সময় রাত ২টায় আমরা পৌঁছালাম চীনের গুয়াংজু শহরের বাইয়ুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। একজন চাইনিজ ভদ্রমহিলা হুইলচেয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছেন বাবাকে রিসিভ করতে। খুবই পোলাইট, হেল্পফুল, কিন্তু উনি ইয়েস, নো, স্টপ আর বোদিং কা (বোর্ডিং কার্ড) ছাড়া আর কোনো ইংরেজি ওয়ার্ড জানেন বলে মনে হচ্ছে না। সিকিউরিটি চেকিং শেষ করে টার্মিনালে ঢুকে আমরা যে লাউঞ্জে যাব সেটা কিছুতেই উনাকে বোঝাতে পারলাম না। এক ডিউটি ফ্রি শপের চাইনিজ সেলস স্টাফের হেল্প নিয়ে উনাকে ট্রানস্লেট করে দিতে হলো। লাউঞ্জ যেটা খুজে পেলাম তার নাম প্রিমিয়াম লাউঞ্জ। স্লিপিং সোফা, মাসাজ চেয়ার সবই আছে। আমাদের নেক্সট ফ্লাইট ৩ ঘণ্টা পর। বাবার রেস্ট দরকার, তাকে স্লিপিং সোফায় সেট করে ঘুম

পাড়িয়ে আমি ওয়াইফাই এক্সেস এর জন্য কাউন্টারে গেলাম। সেখানে বলল লাউঞ্জের আলাদা কোনো ইন্টারনেট নেই। পুরো এয়ারপোর্টেই ইন্টারনেট আছে। সেজন্য কাউন্টারের পাশে রাখা স্ক্যানারে আমার পাসপোর্ট স্ক্যান করতে হবে। পাসপোর্ট স্ক্যান করার পরই একটা টোকেনে প্রিন্ট হয়ে এলো আইডি ও পাসওয়ার্ড। এটা দিয়ে আমি ৩ ঘণ্টার জন্য ইন্টারনেট পাব। ইন্টারনেটে কানেক্টেড হয়েই বুঝতে পারলাম আমি একটা ছোট ভুল করে এসেছি বাংলাদেশ থেকে আসার সময়। আমার ফোনে ভিপিএন এক্টিভ করে আসিনি। চীনে গুগল, ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ কিছুই চলে না। অফিসের কয়েকটা ইমেইল দেখা ছাড়া এই বিকলাঙ্গ ইন্টারনেট আমার কোনো কাজেই আসলো না।

ফ্লাইট টু নারিতা

পৌনে ৫টার দিকে ঐ ভদ্রমহিলা আবার লাউঞ্জে এলেন হুইলচেয়ার নিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যেতে। আমাদের নারিতা যাওয়ার এয়ারক্রাফটটা একটু ছোট। এয়ারবাস এ৩২০। এখানেও যথারীতি সবার আগে আমাদেরকে প্লেনে নেওয়া হলো। বাইরে আবহাওয়া বেশ খারাপ। অনেক ঝড়বৃষ্টি, এর মধ্যেই প্লেন টেক অফের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের এই ফ্লাইটের ক্যাপ্টেন ছিলেন একজন ভদ্রমহিলা। এভারেজ চাইনিজদের চাইতে উনার ইংরেজি উচ্চারণ অনেক পরিষ্কার, খুব সুন্দর ফ্লাইট এনাউন্সমেন্ট করলেন। সবচাইতে বড় কথা এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও উনি বেশ স্মুথ টেক অফ করলেন কোনো টারবিউলেন্স ছাড়াই।

চায়না সাউদার্ন এয়ারলাইনস আমাদের কাছে বেশ ভাল লেগেছে খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, খাওয়ারের মানও বেশ ভাল। টেক অফের একটু পরেই খাওয়ার চলে এলো। একটা অপশন স্টিকি রাইস উইথ পর্ক আরেকটা চিকেন উইথ রাইস নুডলস, দুটোর সাথেই কমন একটা করে ফ্রুটস সালাদ, চীজকেক আর ইয়োগার্ট। ড্রিংকস হিসেবে তিনরকম ফ্রুট জুসের অপশন এবং সেই সাথে এই সাত সকালেও ওয়াইন আর বিয়ার দিচ্ছে চাইলে। বাবা একটু রাইস, চিকেন আর ফ্রুটস ছাড়া আর কিছু মুখে দিলেন না। রাতের ঘুম ঠিকমতো না হওয়ায় বাবাকে বেশ টায়ার্ড লাগছে।

নারিতা বিমানবন্দর

টোকিওর দুই পাশে দুইটা বিমানবন্দর। হানেদা ও নারিতা। স্থানীয় সময় সকাল ৯ টায় ল্যান্ড করলাম নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। নারিতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর জাপানের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ১৯৭৮-এ প্রতিষ্ঠিত এই বিমানবন্দরটি টোকিও থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। এখানেও ঝড়বৃষ্টি। হুইলচেয়ার প্যাসেঞ্জারদের প্লেনে ওঠানোর সময় সবার আগে ওঠালেও, নামানোর সময় কিন্তু সবার শেষেই নামায়। আমি জানি জাপানে এসে নতুন এবং অদ্ভুত অনেক কিছুই দেখব,

সেটা শুরু হলো প্লেন থেকে নেমেই। বাবার জন্য যেই হুইলচেয়ার আনা হয়েছে সেটা পুরোটাই কাঠের এবং সেটা ফোল্ড করা অবস্থায় হাতে নিয়ে এক শ্রীলংকান মেয়ে বাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। বাবাকে দেখে মুহূর্তেই সেটা রেডি হয়ে গেল। উনি সম্ভবত এয়ারলাইনসের স্টাফ না। এয়ারপোর্টের স্টাফ ছিলেন। উনিও খুব আন্তরিক। আমাদেরকে প্রথমে নিয়ে গেলেন ইমিগ্রেশনে। সেখানেও লাইনে দাঁড়াতে হলো না, আমাদের জন্য প্রাইয়রিটি কাউন্টার। দুজন ইমিগ্রেশন অফিসার আমাদের পাসপোর্ট স্ক্যান করে বায়োমেট্রিক নিয়ে আমাদের পাসপোর্টে একটা স্টিকার আর একটা সীল দিয়ে দিলেন বিনা বাক্য ব্যয়ে।

লাগেজ বেল্ট এ গিয়ে দেখলাম এয়ারপোর্টের স্টাফরা লাগেজ বেল্ট থেকে নামিয়ে ট্যাগ অনুযায়ী গুছিয়ে রেখেছে আগেই। লাগেজ কালেক্ট করে ওয়াশরুমে গিয়েই খেলাম সেকেন্ড ধাক্কা। এ তো পুরাই ডিজিটাল অত্যাধুনিক ওয়াশরুম। কোনো পুশ শাওয়ার নেই। যা করতে হবে বাটন টিপে টিপে করতে হবে। আইকন, জাপানি টাইটেল আর ইংরেজি টাইটেল দেওয়া প্রতিটা বাটনের সাথে। এক পাশে অনেকগুলো ছোট ছোট বাটন, কিন্তু তার আশেপাশে কোনো ইংরেজি লেখা নেই। সব হিজিবিজি জাপানি। কি মুশকিল! ইংরেজি লেখা আইকনগুলোর মধ্যে সবচাইতে ইন্টারেস্টিং আইকন হলো প্রাইভেসি আইকন, মিউজিকের আইকন দেওয়া, ভলিউম বাড়ানো কমানো যায়। মানে টয়লেটে ইউজ করার সময় আপনি মিউজিক ছেড়ে দিতে পারবেন। আর আরেকটা আইকন হলো ফোয়ারার। এইটা দিয়ে ঐ কাজটাই হয়। হ্যাঁ, আপনি যেটা ভাবছেন সেটাই, পুশ শাওয়ারের কাজ হয় এই বাটনে। কমোডটা বেশ ওয়ার্ম এবং পানিটাও। এই শীতে এমন একটা এক্সপেরিয়েন্স ভালই লাগল।

আমি দেশের বাইরে ট্রাভেল করার সময় এখন একটা গ্লোবাল-সিম-কার্ড ব্যবহার করি। এই সিম কার্ডটা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ১২৪টা দেশে ব্যবহার করা যায় কোনো ঝামেলা ছাড়াই। শুধু যাত্রা শুরুর আগে প্রয়োজন মতো ডাটা, কল বা এসএমএস কিনে নিলেই হয়। আমি ১০ জিবি ডাটা আর ১০ মিনিট কল কিনে রেখেছি। এখন তো সব যোগাযোগ হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার আর টিমসেই হয়ে যায়। মিনিটটা আসলে প্রয়োজন হবে না, তারপরেও ইনকেইস-অফ-ইমার্জেন্সির জন্য কিনে রেখেছি। মামাকে ফোন দিয়ে জানালাম আমরা নিরাপদে পৌঁছেছি। মামা বললেন ৪৫ বছর আগে আমার মা যখন জাপানে এসেছিলেন তখন এই নারিতা এয়ারপোর্ট দিয়েই এসেছিলেন। নারিতা তখন সবেমাত্র চালু হয়েছিল। এখন আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে এক্সপ্রেস ট্রেনে করে যেতে হবে মামার বাসার দিকে।

জাপানে ট্যাক্সি ভাড়া অকল্পনীয় রকমের ব্যয়বহুল। এখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হিসেবে সবচাইতে বেশি ব্যবহার হয় ট্রেন। বাসও আছে তবে ট্রেনের সংখ্যাই বেশি। ট্রেনের মধ্যেও অনেক ক্যাটাগরি আছে। বুলেট ট্রেন বা শিনকানসেন খুবই এক্সপেন্সিভ।

প্লেন ভাড়ার সমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশিই। এক্সপ্রেস ট্রেনের ভাড়াও অনেক বেশি। তাই লোকাল ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় হয় রাশ আওয়ারে। রীতিমতো দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না। লোকাল ট্রেনের মধ্যে আবার কিছু বগি আছে দোতলা, যেগুলো গ্রীনকার বলে, গ্রীনকারে আপনি সিট রিজার্ভ করে বসে যেতে পারবেন সেটার জন্য আলাদা ভাড়া দিতে হবে। এয়ারপোর্টের সাথেই অনেক বড় আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন স্টেশন। বিভিন্ন রকমের অনেক ট্রেন আসা যাওয়া করছে। আমরা এখান থেকে নারিতা এক্সপ্রেস নামের ট্রেনে করে যাব ওফুনা স্টেশনে। সেখানে মামা আসবেন আমাদেরকে রিসিভ করতে।

টিকিট কাটব আর সাথে কিছু ক্যাশ রাখব বলে এটিএম থেকে কিছু ইয়েন তুললাম। ১০ হাজার আর ১ হাজারের কচকচে নোটে ইয়েন বেরিয়ে এলো। জাপানের ইয়েন আর বাংলাদেশের টাকার মান প্রায় কাছাকাছি। ১০০ ইয়েনের বিপরীতে পাবেন ৭৭ টাকা। ধাতব হোক বা কাগজের হোক, পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের মুদ্রায় তারা তাদের দেশের সাবেক, বর্তমান রাজা, রানী, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রীদের ছবি ছাপায়। জাপান এই ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম। অবাক করার মতো ব্যাপার হলেও, তাদের ইয়েনে জাপানের কোনো রাজা-রানীর ছবি নেই, আছে তাদের দেশের বিখ্যাত সব বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, ডাক্তার ও সাহিত্যিকের ছবি। এবং এরা নির্দিষ্ট সময় পর পর এই ছবি গুলো পরিবর্তন করে। এখানে কাগজের নোট হয় তিনটা, এক হাজার, পাঁচ হাজার আর দশ হাজার। কয়েন হয় এক, দশ, পঞ্চাশ, একশ আর পাঁচশ ইয়েনের। এর মধ্যে পাঁচ আর পঞ্চাশ ইয়েনের কয়েন দুইটা ফুটা পয়সা। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি ফুটা পয়সার কোনো দাম নাই, জাপানে দেখি দাম আছে।

জে-আর এক্সপ্রেসের আলাদা কাউন্টার। সেখান থেকে নারিতা এক্সপ্রেসের টিকিট নিলাম। দুজনের জন্য টিকিটের দাম পড়েছে মোট ৯ হাজার ৮ শ ইয়েন।

টিকিট নিয়ে প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত যেতে হবে হেঁটে, কারণ এয়ারপোর্টের হুইলচেয়ার সার্ভিস এখানেই শেষ। উনি বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। আমি বাবার জন্য রেল স্টেশনের কাউন্টার থেকে আরেকটা হুইল চেয়ার আনতে চাইলাম, বাবা রাজি হলেন না, বললেন, অল্প একটু পথ উনি হাঁটবেন। বেশিক্ষণ হুইলচেয়ারে বসলে পা জড় হয়ে আসে এবং নিজেকে নাকি খুব অসহায় অসহায় লাগে। যেহেতু ব্যাপারটা ফিজিক্যালের চাইতে বেশি সাইকোলজিক্যাল, আমি আর বেশি জোর করলাম না বাবাকে এই নিয়ে। যদিও এই লম্বা জার্নি করে বাবা খুব টায়ার্ড।

আমি এক হাতে দুটো কেবিন সাইজের ট্রলি ব্যাগ, একটা ডাফল ব্যাগ আর পিঠে একটা ব্যাকপ্যাক নিয়ে আরেক হাতে বাবাকে ধরে ধরে হাঁটছি গুটি গুটি পায়ে। হঠাৎ এক বয়স্ক জাপানি ভদ্রলোক আমাদের কাছে এসে আমার কাছ থেকে দুটো ট্রলি ব্যাগ নিজের কাছে নিয়ে নিতে চাইছেন। আর জাপানি ভাষায় যা বললেন, তার মানে

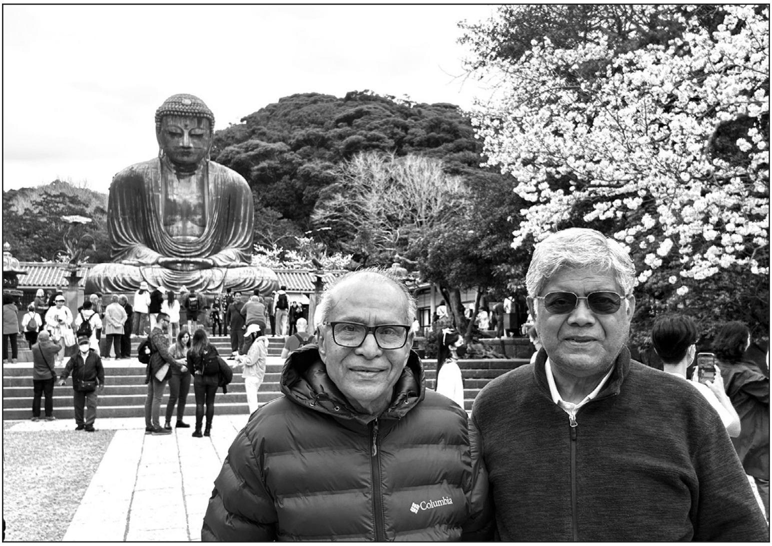

কামারা বুদ্ধের সামনে বাবা ও সেজ মামা

হচ্ছে 'তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে হাঁটতে, আমি তোমাদেরকে এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে চাই' অনেক আগে বেসিকস শিখেছিলাম বলে জাপানি ভাষা আমি একটু আধটু বুঝতে পারি, দু'একটা শব্দ আর একটুআধটু বাক্যও বলতেও পারি। একজন বয়স্ক লোকের কাছে হেল্প নেবো এই ব্যাপারটা ইচ্ছে করছিল না। আমি বিনয়ের সাথে না করলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই মানলেন না। আমার হাত থেকে লাগেজ দুটো প্রায় কেড়ে নিয়েই আমাদের সাথে হাঁটা শুরু করলেন। আমাদের প্ল্যাটফর্মে এসে ওয়েটিং লাউঞ্জে বাবাকে বসালাম। ভদ্রলোক মাথা নিচু করে (বাও করে) ধন্যবাদের উত্তর দিয়েই দৌড় দিলেন উল্টো দিকের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ধরার জন্য। তখনি বুঝলাম উনি আমাদের সাথে যে পথটা এসেছেন সেটা তার জন্য পুরো উল্টো ছিল।

বাবা এই ঘটনায় বেশ অবাক হলেও, আমার কাছে এই ঘটনাটা মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না, জাপানিজরা এমনই, অনেকদিন ধরে জাপানিদের সাথে মেলামেশা আর কাজ করাতে এদের সম্পর্কে আমার বেশ ভাল ধারণা আছে।

এক্সপ্রেস ট্রেন টু ওফুনা

ট্রেন আসতে আরো ২০ মিনিট বাকি। টোকিওতে বেশ ঠাণ্ডা পরেছে। ঢাকায় ছিল ২৮ ডিগ্রি আর এখন দেখাচ্ছে ১১। ডাবল ব্যাগে করে আসলে এনেছি আমার আর বাবার জন্য জ্যাকেট। জ্যাকেট দুটো বের করে পরে নিলাম আর ডাবল ব্যাগ ভাঁজ করে ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে একটা লাগেজ কমিয়ে ফেললাম। ওয়েটিং লাউঞ্জের পাশেই দেখি ড্রিংক্সের একটা ভেন্ডিং মেশিন। কাছে গিয়ে দেখি এখানে বোতলজাত গ্রীন টি

আছে যেটা গরম। ১১০ ইয়েনে দুই ধরনের দুইটা গ্রীন টি নিলাম। বোতল দেখতে আমাদের দেশের ফ্রুট জুসের বোতলের মতো। দূর থেকে বাবা দেখে আমাকে হালকা বকাই দিলেন। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বললেন:

-এই ঠাণ্ডার মধ্যে তুই আমাকে জুস খাওয়াচ্ছিস কেন?

আমি মুচকি হেসে চা'র বোতলটা হাতে দিতেই বাবার চেহারা চেঞ্জ হয়ে গেল, এই ঠাণ্ডায় গরম গরম চা পেয়ে বাবা বেশ খুশি হলেন। গরম চায়ের বোতলটা আমার নিজেরই হাতে ধরে রাখতে খুব আরাম লাগছে। প্লেনের খাবারের সাথে দেওয়া ক্রসন্তগুলো রেখে দিয়েছিলাম যখন খিদে পাবে, কিন্তু খাবার পাওয়া যাবে না সেই সময় খাব বলে। ক্রসন্তের সাথে গরম গরম গ্রীন টি, খারাপ লাগল না।

ট্রেন এলো একদম অন টাইমে, এই ট্রেনটা মাত্র ৫ টা স্টেশনে থামবে এবং ১০০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার স্পিডে যাবে। সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ট্রেন নারিতা থেকে টোকিও গিয়ে ভাগ হয়ে যাবে। ১ থেকে ৬ নাম্বার বগি যাবে ওফুনা। আর ৭ থেকে ১২ চলে যাবে ওমিয়া। আমরা যেহেতু ওফুনা যাব, আমাদের সিট পড়েছে ৪ নাম্বার বগিতে। এয়ারপোর্টের আন্ডারগ্রাউণ্ডে ছিল রেল স্টেশন। আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে বাইরে বের হতেই সকালের মিষ্টি রোদ ঝলমলিয়ে উঠল। দেখলাম দুপাশে ধান ক্ষেত আর ছোট ছোট পাহাড়, ঠিক যেমনটা আমাদের চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে রেললাইনের পাশে দেখা যায়। বাইরে দেখে মনে হচ্ছে বাংলাদেশেই আছি, শুধু ট্রেনের ভেতর জাপান। অনেকক্ষণ যাওয়ার পর আস্তে আস্তে ঘরবাড়ি আর বড়সড় বিল্ডিং শুরু হলো। রেসিডেন্সিয়াল এলাকাগুলো দেখলাম বেশ গোছানো। প্রতিটি বাড়ির আশেপাশে যথেষ্ট গাছপালা আছে। আর রংবেরঙের ফুলের গাছ ভর্তি চারদিকে। জাপানের কিছু জিনিস খুব ভাল লেগেছে। এরা বাড়ির চাপাশে রংবেরঙের ফুল গাছ লাগিয়ে রাখে এবং খুব যত্ন নেয়। প্রচণ্ড ব্যস্ত রাস্তা দেখেছি টোকিও আর কিয়োটোতে, আমাদের গুলিস্তান, ফার্মগেটের মতোই ব্যস্ততা, ভিড়, কিন্তু কোনো আওয়াজ নেই আর চারপাশটা ফুল আর অন্যান্য গাছে ভর্তি।

ট্রেনের সিট বেশ আরামদায়ক। সামনে অনেক বড় লেগ স্পেস। বড় লাগেজ রাখার জন্য প্রতিটি বগির দরজার পাশে আলাদা স্টোরেজ আছে। প্রতিটি বগিতে ডিসপ্লেতে লোকেশান আপডেট দেখাচ্ছে কোথায় আছি। আর প্রতিটি স্টেশনের আগেই এনাউন্স করছে। ওফুনা স্টেশনে নেমেই দেখি আমরা যে দরজা দিয়ে নামছি মামা ঠিক সে দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ করে আরেকটি লোকাল ট্রেন ধরে ২০ মিনিটেই বাসায় পৌঁছে গেলাম।

মামার বাড়ি? নাকি শ্বশুর বাড়ি?

আমার সেজমামার বাসা সুজিদোর ট্রেন স্টেশনের একদম পাশেই। সেখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন মামা, মামি। দুজনেই খুব এক্সাইটেড বাবাকে

নিয়ে এসেছি বলে। আমিও এক্সাইটেড মামার বাড়িতে থেকে জাপান দেখা হবে। তার চাইতে বড় কথা টোকিওতে আমাদের হোটেল নিতে হবে না, জাপানে হোটেলও অনেক এক্সপেনসিভ। মামার বাসা একটা বড় এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ। নিচে কোনো গার্ড নেই, কোনো লোক নেই। লবি পার হয়ে বাইরে থেকে পিন নাম্বার দিয়ে মেইন গেট খুলতে হয়। লবিতে প্রতিটি এপার্টমেন্টের আলাদা লেটার বক্স। এই বিল্ডিংয়ের ভেতরে, বাইরেও প্রচুর গাছ। আর পাশেই বিশাল একটা পার্কভর্তি চেরি ফুলের গাছ। বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত সুন্দর একটা দৃশ্য দেখলাম। নিচে চেরি ফুলের বিশাল বাগান আর দূরে মাউন্ট ফুজি।

আমাদের বুড্ডিস্ট কমিউনিটিতে একটা রীতি হচ্ছে বিয়ের পর মেয়েদেরকে তার যেকোনো একজন মামা শ্বশুরকে অফিসিয়ালি বাবা ডাকতে হয়। আমার মা সেজমামাকেই আমার ওয়াইফের বাবা হিসেবে নমিনেট করে গিয়েছিলেন, তাই আমার সেজমামা আর মামি হয়ে গেল আমার ওয়াইফের নতুন বাবা, মা। সেই হিসেবে টেকনিক্যালি আমার সেজমামা আর মামি এখন আমার শ্বশুর আর শাশুড়ি এবং জাপানের এই বাসাটাও আমার শ্বশুর বাড়ি।

আমার সেজমামা ডা. সুমন বড়ুয়া জাপানে পরিচিত 'বাবু সান' হিসেবে। মামা মূলত একজন ডাক্তার, আবার পিএইচডি-ও করেছেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দীর্ঘদিন জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) হয়ে অনেক দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ শেষে রিটায়ার করে এখন জাপানের নামকরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অসম্ভব ব্যস্ত মানুষ। এত ব্যস্ততার মধ্যেও মামা আর মামি (স্মৃতি বড়ুয়া) তাদের সময় বের করে আমাদের জন্য ট্রাভেল আইটেনারি করেছেন, যাতে সবাই একসাথে ঘুরতে পারি।

বাসায় পৌঁছেই শাওয়ার নিয়ে লাঞ্চ করতে বসলাম আমরা। পর্ক রিবস ভুনা, এসপারাগাস, আভোকাডো, আর কয়েকরকম সুশি আর প্লেইন রাইস দিয়ে লাঞ্চ সেড়ে বাবা ঘুমাতে গেলেন। আর আমি লাঞ্চের সব প্লেট ধুয়ে মুছে টেবিল পরিষ্কার করে বারান্দায় এক মগ কফি নিয়ে পার্কের চেরি ফুল আর মাউন্ট ফুজির দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছি। বাইরে টেম্পারেচার ১০-এর মতো। বাসায় মামা মামি সব কাজ ভাগ করে করেন। ধোয়া মোছা মামার কাজ আর রান্নাবান্না মামি করেন। আমি ঘোষণা দিয়েছি, আমি যে কদিন বাসায় আছি রান্নাবান্না আর ধোয়া মোছা আমিই করব। মামা তো মহা খুশি, বললেন পিনা, পিউ (আমার মামাতো বোনেরা, একজন অস্ট্রেলিয়ায়, আর আরকজন কানাডা থাকে) ছুটিতে জাপানে এলে তাই করে।

একটু পর মামি এসে জিজ্ঞেস করলেন, উনি বাজারে যাবেন কেনাকাটা করতে আমি বের হব কিনা? আমি রেডি হয়ে মামির সাথে বেরিয়ে পড়লাম। মামির সাথে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করছি আর আশেপাশে কি আছে দেখছি। বাসার নিচেই অনেক

মামার বাসার বারান্দা থেকে মাউন্ট ফুজি আর চেরিবাগান

পুরানো একটা সাইকেলের দোকান। দোকান ভরা বিভিন্ন ধরনের সাইকেল। একদম অত্যাধুনিক সাইকেল থেকে শুরু করে অনেক পুরানো মডেলের সাইকেল-ও সেখানে আছে। শতবর্ষী এক ভদ্রলোক সাইকেল মেরামত করছেন। মামির কাছ থেকে জানলাম এটা উনারই দোকান। একলাই অনেক বছর ধরে এই দোকানটি চালাচ্ছেন। জাপানে সাইকেল খুব জনপ্রিয়, প্রায় সবারই মনে হয় একটা করে সাইকেল আছে। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে জাপানে নাকি প্রচুর সাইকেল চুরি হয়। জাপানিজরা চুরি করতে পারে এটা কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। তখন মামি বললেন জাপানে এসে তাঁর প্রথম সাইকেলটিই কেনার দুদিন পরেই চুরি হয়ে গিয়েছিল!

জাপানের বাজার সদাই

আজকে শনিবার, এখানে উইকএন্ড। আশেপাশে বেশ কয়েকটা কনভেনিয়েন্স স্টোর, সুপারশপ আছে। আর আছে আমার প্রিয় সেভেন ইলেভেন। সেভেন ইলেভেন প্রায় ১০০ বছরের পুরানো একটা আমেরিকান কনভেনিয়েন্স স্টোর চেইন। ১৯ টা দেশে এদের ৮৪,০০০ এরও বেশি আউটলেট আছে। বাসার পাশেই একটা সেভেন ইলেভেন আর এক ব্লক পরেই সুজিদোর বিখ্যাত ট্যারেস মল। সব নামি-দামি ব্র্যান্ডের আউটলেট সেখানে। আর নিচতলায় অনেক বড় একটা সুপারশপ। মামির সাথে সেখানেই যাচ্ছি। উইকএন্ড হওয়াতে আজকে বেশ ভিড়। শাকসবজি ফলমূল সবই ফ্রেশ পাওয়া যাচ্ছে। মাছ-মাংস সুন্দর করে কেটে 'রেডি টু কুক' প্যাকেটে বিক্রি হচ্ছে। 'রেডি টু ইট' খাওয়ারও অনেক ধরনের আছে। আমার সুশি খুব পছন্দ, মামি তাই সুশি কর্নার থেকে বড় একটা সুশি প্ল্যাটার নিলেন ডিনারের জন্য। কিছু

শাকসবজি, আর ফলমূল, ব্রেড আর চিজ নিলাম ডিনার আর ব্রেকফাস্টের জন্য। আমি মামার জন্য একটা কফি নিলাম। মামাও আমার মতো কফি ফ্রিক। আমি একটু ঘুরে ফিরে রেকি করে নিলাম, যেন যাওয়ার আগের দিন প্রয়োজনীয় কেনাকাটা করতে পারি। দেশে ফেরার সময় ছোটদের জন্য চকলেট, আর বড়দের জন্য সাকে নিয়ে যেতে হবে। এখানে দেখলাম ড্রিংক্সের দামই তুলনামূলক অনেক কম। বাকি সব কিছুরই দাম অনেক বেশি। সকালে উঠে অনেক দূরে যাওয়ার প্ল্যান। তাই তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলাম, অবশ্য আকাশটাও একটু মেঘলা ছিল।

সুইকা কার্ড

জাপানে পকেটে যদি একটা রিচার্জেবল আইসি কার্ড থাকে তাহলে লাইফটা অনেক সহজ হয়ে যায়। কয়েক ধরনের আইসি কার্ডের মধ্যে 'সুইকা' সবচাইতে জনপ্রিয় এখানে। কার্ডে ইয়েন রিচার্জ করে নিলে এটা ট্রেন, বাস, সুপারশপ, ভেন্ডিং মেশিন সব জায়গাতেই ব্যবহার করা যায়। এই কার্ড না থাকলে প্রতি স্টেশনে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনতে হবে। আর সুইকা কার্ড থাকলে গেটে পাঞ্চ করে ট্রেনে উঠব আর নামার সময় যেই স্টেশন এ কার্ড পাঞ্চ করে বের হব, ঐ দূরত্বের দাম কার্ড থেকে কেটে নেবে। প্রতিবার পাঞ্চ করলে গেটের ডিসপ্লে-তে ব্যালেন্স দেখাবে। আমার দুই মামাতো বোন কেউ জাপানে থাকে না। ছুটিতে আসে। ওদের সুইকা কার্ড মামা আমার জন্য আর বাবার জন্য বের করে দিলেন। সকালে ট্রেন স্টেশনে গিয়ে ব্যালেন্স চেক করে কার্ডগুলো রিচার্জ করে নিতে হবে। আমরা যে কদিন জাপানে আছি, এই কার্ড দুটো ব্যবহার করব।

জাপানি ট্রেন ও জেআর পাস

জাপানে যাতায়াতের সবচেয়ে সহজ ও সুলভ মাধ্যম ট্রেন। জাপানিরা গাড়ির চাইতে ট্রেন বা সাইকেলকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। ট্রেন লাইনের কয়েকটা কালার আছে। কোন কালারের লাইন কোনদিকে গেছে আর কোন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে এটি বুঝে গেলেই আর কোনো চিন্তা নেই। নাহলে জাপানের ট্রেন স্টেশন একটা গোলকধাঁধা, একই সময় একই সাথে কয়েকটা ট্রেন ছেড়ে যায় বিভিন্ন দিকে। এখন অবশ্য লাইফ অনেক ইজি। গুগল ম্যাপই বলে দেবে, কোথায় যাওয়ার জন্য কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে কোন কালারের/লাইনের ট্রেন লাইন ধরতে হবে। কিছু মোবাইল এপসও আছে। আর প্ল্যাটফর্মে ও ট্রেনে ইংরেজিতেও এনাউন্সমেন্ট করে। পুরো সিস্টেমটা বুঝতে আমার দুদিন লেগেছে। জাপানে আরো আছে পাতাল রেল ও বুলেট ট্রেন। এদের স্টেশন আবার আলাদা আলাদা। আমরা টোকিও থেকে কিয়োটো গিয়েছিলাম বুলেট ট্রেনে করে। সেই গল্প একটু পরেই বলছি।

সিংগাপুর আর ব্যাংককে আমি যতবার গিয়েছি ওদের দেশের টুরিস্ট পাস কিনেছি। ব্যাংককে এই পাস দিয়ে শুধু MRT ব্যবহার করা গেলেও, সিংগাপুরে এই পাস দিয়ে MRT, বাস, রেল সব যায়গায় আনলিমিটেড এক্সেস করা যায়।

জাপান রেলওয়েও 'জেআর পাস' নামে টুরিস্টদের জন্য একটা পাস বিক্রি করে যেটা দিয়ে পুরো জাপানে ঘোরা যায়। এটা জাপানে আসার আগে অনলাইনে কিনতে হয়। তারপর জাপানে পৌঁছে একটিভ করতে হয়। এই পাস দিয়ে জাপানের বুলেট ট্রেনসহ বেশিরভাগ ট্রেন আনলিমিটেড টাইম একসেস করা যায়। ৭/১৪/২১ দিন এই তিনটি মেয়াদের পাওয়া যায় এই পাস। যেহেতু বুলেট ট্রেনসহ আছে, তাই এটার দাম একটু বেশি। আগে দাম অনেক কম ছিল। ২০২৩ এর নভেম্বরে জাপান রেলওয়ে এটার দাম তিনগুণ বাড়িয়েছে। তারপরও যদি লং ডিসটেন্সে অনেক ঘোরাঘুরি করার প্ল্যান থাকে, তাহলে এই পাস কিনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ধরুন আপনি টোকিও থেকে কিয়োটো, ওসাকা, হিরোশিমা সব জায়গায় যাওয়ার প্ল্যান করেছেন। তাহলে জেআর পাস নেওয়াটাই আপনার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ টোকিও থেকে হিরোশিমার বুলেট ট্রেনে রাউন্ড ট্রিপের ভাড়ার চাইতে ৭ দিনের জেআর পাসের দাম অনেক কম। আমি এই পাস কিনিনি তার কারণ হচ্ছে বাবার হেলথ কন্ডিশন। আমাদের প্ল্যানগুলো বার বার চেঞ্জ করতে হচ্ছে। এই পাসটি একবার একটিভ করে নিলে আপনি ইউজ করেন আর না করেন নির্দিষ্ট সময় পর ইনভ্যালিড হয়ে যাবে। যেহেতু আমরা দুটি সুইকা কার্ড পাব তাই আর জেআর পাস কিনিনি। পুরো জাপানের কাভারেজ ছাড়াও জেআর পাস এরিয়াভিত্তিকও কিনতে পাওয়া যায়। সেটির দাম আবার অনেক কম। জাপান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে।

'উশিকো দাইবাতসু' বিশ্বের বৃহত্তম দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তি

টায়ার্ড থাকায় রাতে ঘুম খুব ভাল হলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি মামা আমার জন্য কফি বানিয়ে রেখেছেন। কফি খেতে খেতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভোরের আলোয় মাউন্ট ফুজির আরেক রূপ দেখলাম। অসাধারণ দৃশ্য। বাবাও উঠে গেছেন। ঘুম ভাল হওয়াতে বাবাকেও বেশ ফ্রেশ লাগছে। মামার আইটেনারি অনুযায়ী আজকে আমাদের 'উশিকো' যাওয়ার প্ল্যান।

'উশিকো দাইবাতসু' জাপানের ইবারাকি প্রদেশের উশিকো শহরে অবস্থিত, বিশ্বের বৃহত্তম দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্তি এটি। এই বিশাল ব্রোঞ্জের মূর্তিটি উচ্চতায় ১২০ মিটার (৩৯৩ ফুট), যার মধ্যে ১০ মিটার ভিত্তি এবং ১০ মিটার পদ্মফুলের মতো স্তম্ভ রয়েছে। ১৯৯৩ সালে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল জাপানের বিখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 'শিনরান' এর স্মরণে, যিনি ১২শ শতকে জাপানের জোদো শিনশু বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি

স্থাপন করেন। উশিকো দাইবাতসু ঘিরে রয়েছে অনেক বড় একটা চেরি বাগান। আমাদের সাকুরা দেখাও হবে, দাইবাতসু দেখাও হবে।

আমরা সবাই তাড়াতাড়ি শাওয়ার নিয়ে ব্রেকফাস্ট করে রেডি হয়ে নিলাম। ৯ টায় বাসা থেকে বের হয়ে পাশের ট্রেন স্টেশনে গেলাম। আমার আর বাবার জন্য সুইকা কার্ডে দশ হাজার ইয়েন রিচার্জ করলাম। দেখা যাক, ক'বেলা যায়...

মামা বললেন আজকে রবিবার, ট্রেনে ভিড় থাকবে না। গ্রীন কার নেওয়ার দরকার নেই, নরমাল বগিতেই বসে যাওয়া যাবে। এই ট্রেনের বগিগুলো আমাদের মেট্রোরেলের বগির মতো। এক ঘণ্টা দশ মিনিট পর আমরা উশিকো ট্রেন স্টেশনে পৌঁছালাম। এখান থেকে বাসে করে উশিকো পার্কে যাওয়া যায়। ট্যাক্সিও আছে। আমরা আসার দু মিনিট আগেই বাস চলে গেছে। পরের বাসের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, তাই ট্যাক্সি নিয়ে নিলাম। আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভারের বয়স মিনিমাম ৭০-এর ওপরে হবে। বেশ স্মার্ট। পনের মিনিটের মধ্যে উনি আমাদের পার্কের গেটে পৌঁছে দিলেন। এই ২০ কিলোমিটার যাত্রায় আমাদের ট্যাক্সি ভাড়া আসলো ৬২০০ ইয়েন, টাকায় ৫১০০ টাকার মতো। পার্কে ঢোকার লাইন অনেক লম্বা। কিন্তু ৮০০ ইয়েনের পার হেড টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে বেশি সময় লাগল না আমাদের। খুব সুন্দর করে ক্রাউড কন্ট্রোল করছে ৪ জন স্টাফ। দুটো কাউন্টার। ভেতরে ঢুকেই চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। কি সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ। অনেক বড় বড় চেরি ফুলের গাছ ফুলে ফুলে ভরে আছে আর তার নিচে নানা রঙের ফুল গাছ আর মাঝখানে বেশ বড় একটা দীঘি। আর, একপাশে অনেক বড় একটা গ্রেভ-ইয়ার্ড। সেজমামি এখানে অনেকবার এসেছেন। কোন পয়েন্ট থেকে কোন ভিউতে সবচাইতে ভাল ছবি তোলা যায় সব মামির নখদর্পণে। তাই আজকের গাইড আমার মামি। আর, আমরা ওনাকে ফলো করছি। মামি প্রথমবার এখানে এসেছিলেন ১৯৯৩ সাথে উশিকো দাইবাতসু উদ্বোধন হওয়ার আগে আগে। সেই হিসেবে বলা যায়, এখানে ভিজিট করা প্রথম বাংলাদেশী আমার মামি।

ঘুরতে ঘুরতে মুল বুদ্ধ মূর্তির সামনে চলে এলাম। এখানে দশ ইয়েন দিয়ে ধূপকাঠি পাওয়া যায়। বিক্রি করার জন্য কেউ বসে নেই। এক পাসে ধূপকাঠি সাজানো আছে আর তার পাশে একটা কয়েন বক্স। সবাই কয়েন বক্সে ইয়েন দিয়ে ধূপকাঠি নিয়ে নিচ্ছে। আমরাও ৪টা নিলাম। পাশেই একটা অনেক বড় ঘণ্টা। বাবা আর মামি ঘণ্টা বাজালেন। আরকটু সামনে এগোতেই একটা পুকুর পেলাম। পুকুর ভর্তি কার্প মাছ। মাছ দেরকে অনেকেই খাওয়ার দিচ্ছে। আমরা বুদ্ধ মূর্তির দিকে এগিয়ে গেলাম।

বিশাল ব্রোঞ্জের এই বুদ্ধ মূর্তির ভেতরে একটা বিল্ডিং আছে যেটি ৮৫ মিটার উঁচু। এর মধ্যে আছে টেম্পল, মিউজিয়াম, আর মেডিটেশন হল। জুতা খুলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। ঢোকার সময় জুতা ক্যারি করার জন্য ব্যাগ দিয়ে দিয়েছে। মামা ওপরে

যাবেন না, নিচে চেরিগাছ তলায় বসে বিশ্রাম নেবেন বলে ঠিক করেছেন। মামাও আগে অনেকবার এসেছেন এখানে। আমরা তিনজন লিফটে উঠে গেলাম। লিফটের সাইজ আমাদের বাসার মাস্টার বেডরুমের চাইতেও অনেক বড়। কমপক্ষে ৭০/৮০ জন লোক একসাথে উঠতে পারবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা সব মিলিয়ে ১২ জন আছি লিফটে। মামি বললেন আমরা সকাল সকাল আসায় ভিড় কম। একটু পরেই অনেক ভিড় বেড়ে যাবে। আমরা টেম্পল, মিউজিয়াম, মেডিটেশন হল সব ঘুরে ঘুরে দেখলাম। একদম ওপরের তলার কয়েকটা জানালা দিয়ে নিচের পুরোটা ভিউ দেখা যায়। অসাধারণ ভিউ। ঘণ্টা দেড়েক পর নিচে নামার সময় দেখলাম ভিড় কাকে বলে। লিফটে ওঠার জন্য লম্বা লাইন, সেই বিশাল লিফটের ভেতরে ভর্তি মানুষ। একটু দূরেই মামা এক চেরি গাছের নিচে ঘাসের ওপর বসে আছেন। পার্কের ভেতর পিচ ঢালা একটা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা বেরিয়ে এলাম। বেশ কিছুক্ষণ ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করে না পেয়ে বাসের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাসে সুইকা কার্ড ব্যবহারের নিয়মও একই। ওঠার সময় পাঞ্চ করবেন, নামার সময়ও পাঞ্চ করবেন, ডিসটেন্স অনুযায়ী ভাড়া কেটে নেবে। উশিকো স্টেশনের পাশেই একটা শপিং মল। সেখানে এক নেপালি রেস্টুরেন্টে আজকে লাঞ্চ করার প্ল্যান আমাদের। নেপালি থালি, নুডলস স্যুপ, স্যান্ডউইচ এইসব দিয়ে লাঞ্চ সাড়া হলো। তারপর ট্রেনে করে ঘরে ফেরা।

সুজিদোতে পাড়া বেড়ানো

আজ প্রচুর হাঁটাহাটি হয়েছে। আমার স্মার্ট ওয়াচ বলছে সকাল থেকে আমি এখন পর্যন্ত ৯ কিলোমিটার হেঁটে ফেলেছি। আমার জন্য এটা কোনো ব্যাপার না হলেও ৭০+/- আমার তিন বয়ঃজ্যেষ্ঠর জন্য এটা অনেক বেশি। তিনজনই বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন। মামি বললেন আজ আর বের হবেন না। আমি একটু রেস্ট নিয়ে আবার পাড়া বেড়াতে বের হতে চাই। মামি বললেন বের হলে ডিনারে স্পেশাল কিছু খেতে চাইলে সুপার শপ থেকে নিয়ে আসতে।

তথাস্তু।

আমি এক মগ কফি নিয়ে টিভিতে কয়েকটা জাপানি চ্যানেল দেখার চেষ্টা করলাম। কফি শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম সুজিদোর এই রেসিডেনশিয়াল এরিয়াতে চক্কর দিতে। গোছানো এলাকা। তিনটে কনভেনিয়েন্স স্টোর আছে আশেপাশে। একটা ফিটনেস সেন্টার আছে, যার ভেতরে সুইমিং পুল, টেনিস কোর্টও আছে। আর আছে একটা হাসপাতাল।

আমি ডায়াবেটিসের রোগী। নিয়ম করে তিন বেলা ঔষধ খেতে হয়। আসার সবময় আমি ভুল করে দুই সপ্তাহের জন্য সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা আমার পুরো ঔষধের প্যাকেট ঢাকায় ফেলে এসেছি। তাই পাশের হাসপাতালের গেলাম প্রেসক্রিপশন

দেখিয়ে আমার ঔষধগুলো নিতে। কিন্তু এরা জাপানিজ প্রেসক্রিপশন ছাড়া আমার কাছে ঔষধ বিক্রি করবে না। ঔষধ কিনতে হলে আগে আমাকে জাপানিজ ডাক্তার দেখাতে হবে, যা অনেক ব্যয়বহুল। দেখি দিন দশেক ঔষধ ছাড়া সারভাইভ করা যায় কিনা। বেশি খারাপ লাগলে তখন না হয় ডাক্তার দেখাব। আর ঘরেই তো একজন ডাক্তার আছেন। নো টেনশন।

আপাতত শপিংমলের দিকেই যাই। শপিং মলে ঘুরে কিছু কেনাকাটা করলাম। যেহেতু সাথে কেউ নেই, দরকারি কেনাকাটা এখনি সেরে ফেলি, পরে যদি সময় না পাই। ছোটদের জন্য অনেক রকম চকলেট আর জাপানিজ কিছু খাবার কিনলাম। এবার বড়দের পালা। সাকে নিতে হবে। এলকোহলের সেকশানে গিয়ে তো আমার মনে হলো আমি স্বর্গে এসে পড়েছি। এখানে বিক্রি হচ্ছে ছোট ছোট টেট্রা প্যাকেটে। মানে আমাদের দেশে জুসের প্যাকেট আছে না? সেজান জুস, আড়ং এর জুস ঐ রকম ছোট ছোট প্যাকেট। প্যাকেটের সাথে আবার গ্লু দিয়ে স্ট্র এটাচ করা। ট্রলি ভরে ছোটদের আর বড়দের কেনাকাটা সারলাম। এর পর গেলাম মামির ফরমায়েশ অনুযায়ী কিছু সবজি, ফলমূল আর ডিনার আর ব্রেকফাস্টের জন্য খাওয়ার নিতে।

আইটেনারি অনুযায়ী পরদিনের প্ল্যান কামাকুরা আর ইয়োকোহামা পোর্ট দেখার। মামি কাল আমাদের সাথে যেতে পারবেন না, ওনার কাজে যেতে হবে। বাসায় ফিরে ডিনার শেষ করে সবাই তাই তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেলাম।

বাবার সাথে আমাদের ট্যুর হিস্ট্রি

যেহেতু বাবাকে সাথে নিয়ে এসেছি, আমাদের ট্যুর ডেস্টিনেশানগুলো আমরা প্ল্যান করেছি যেসব জায়গায় মা ছিলেন বা বেড়াতে গিয়েছিলেন সেইসব জায়গা আর বিখ্যাত টেম্পলগুলোতে। বাবার শরীর তেমন একটা ভাল যাচ্ছে না। মনের জোরেই চলাফেরা করছেন। আমরা তাই ঠিক করেছি বেশি হাঁটাহাঁটি করতে হবে এমন কয়েকটা জায়গা আমরা আইটেনারি থেকে বাদ দেব। কিয়োটোতে বাবার অনেক হাঁটাহাঁটি করতে হবে, এর পর টোকিও ফিরে এসে বাবার আর সেই এনার্জি থাকবে না এসব জায়গায় যাওয়ার। আসলে গত বছর পর্যন্ত ও বাবা বেশ শক্ত ছিলেন, মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কা ঘুরে এসেছি ২০২৩ এর মার্চে, তখনো এতো খারাপ অবস্থা ছিল না বাবার। মালদ্বীপে বাবা প্যারাসেইলিং করেছেন।

আমার মা দীর্ঘ ১৩ বছর অসুস্থ ছিলেন। ট্রাভেল করতে পারতেন না। শেষের ৫ বছর তো প্যারালাইজড অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। আর শেষ ৬ মাস তো পুরোটাই হাসপাতালে কাটিয়েছেন। এই ১৩ বছর বাবা মাকে ফেলে কখনো বেড়াতে যাননি। ২০১৬ তে মা চলে যাওয়ার পর থেকে আমরা যতবারই ঘুরতে বেরিয়েছি বাবাকে ফেলে কোথাও যাইনি। ২০১৭ জানুয়ারিতে বাবা তার বন্ধুদের সাথে মিয়ানমারে বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলো ঘুরতে গিয়েছিলেন। প্রায় এক মাস ছিলেন মিয়ানমারে। ২০১৭

শিজুকা থেকে ফুজিসান ও বুলেট ট্রেন সিনকানশেন

এর জুনে আমরা সবাই মিলে গেলাম নেপালে। সেখানে পোখারায় বাবা প্যারাগ্লাইডিং করেছেন। ২০১৯ এ আমরা যাই পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতা আর বিহারের বুদ্ধগয়ায়। বুদ্ধগয়া আমাদের বৌদ্ধদের জন্য সর্বোচ্চ তীর্থস্থান। সেখানে আমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করেছিলাম। ফেরার পথে কোলকাতায় দুর্গাপূজা দেখে আসি। এর পর তো কোভিডের জন্য কোথাও যাওয়া হয়নি। ২০২২ এ আমরা সবাই মিলে ঘুরতে গেলাম সিংগাপুর আর থাইল্যান্ডে। ২০২৩ এ মালদ্বীপ আর শ্রীলঙ্কায়। ক্রিটিনিন বেড়ে যাওয়ার কারণে বাবার খাওয়া-দাওয়ায় অনেক রেস্ট্রিকশন চলে এসেছে আর কিছুদিন আগে হাঁটতে গিয়ে পড়ে পায়ে ব্যথা পাওয়ার পর ডাক্তার লাঠি ধরিয়ে দেওয়ায় বাবা মানসিকভাবে বেশ দুর্বল হয়ে গেছেন। আমি আর আমার ভাই তাই একটু তাড়াহুড়ো করেই বাবাকে জাপানে নিয়ে এসেছি যদি এরপরে বাবা ফ্লাই করার মতো আর ফিট না থাকেন।

কামাকুরা বুদ্ধ

কামাকুরা বুদ্ধ জাপানের আইকনিক টুরিস্ট ডেসটিনেশনগুলোর মধ্যে অন্যতম। কামাকুরা বুদ্ধ নিয়ে অনেক মিথ আছে। ১৪ মিটার উঁচু ব্রোঞ্জের এই বুদ্ধ মূর্তিটি স্থাপিত হিয়েছিল ১২৫২ সালে। মূর্তিটি প্রথমে কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এটি ব্রোঞ্জ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এই বুদ্ধ মূর্তিটি খোলা আকাশের নিচে রাখা আছে। কারণ যতবারই ছাউনি দিয়ে বা টেম্পল বানিয়ে মূর্তিটি আচ্ছাদিত করার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই এই এলাকায় ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে। ১৩৩৪ ও ১৩৬৯ সালে টাইফুনে ও ১৪৯৮ সালের সুনামিতে এই কামাকুরা বুদ্ধের

টেম্পল পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে শুধু বুদ্ধ মূর্তিটির কিছু হয়নি। তার পর থেকে এই বুদ্ধ মূর্তিটি খোলা আকাশের নিচেই আছে এবং এখানে আর কোনো দুর্যোগ হয়নি।

বাসা থেকে বেরিয়ে প্রথমে ট্রেনে করে তিনজন গেলাম ফুজিসাওয়া স্টেশনে। সেখান থেকে বাসে করে কামাকুরা। অনেক দেশ থেকে টুরিস্ট এসেছে। এখানেও চারিদিকে চেরি ফুলের গাছ ফুলে টইটম্বুর। আমি খেয়াল করলাম চেরি গাছ ছাড়াও এখানে আশে পাশে অন্য অনেক গাছ আছে। মামা বললেন জাপানের সব পার্কেই নাকি এমনভাবেই গাছ লাগায় যেন বসন্তের সাকুরা এবং শরৎকালের মোমিজি বা রেড লিফের সময় রঙে ভরপুর থাকে। কামাকুরা থেকে আমরা রওনা দিলাম ইয়োকোহামা পোর্ট এর দিকে।

আমরা দেশে আসার পর মামা জানিয়েছিলেন, শুধু ২০২৪ এর মার্চ-এপ্রিলে সাকুরা দেখার জন্য জাপানে ৩০ লক্ষেরও বেশি পর্যটক এসেছিল। এইবছর সাকুরা ওয়েদারের কারণে যেসময় ফোরকাস্ট করা হয়েছিল, তার দুই সপ্তাহ পরে ফুটেছে। আমাদের জন্যই মনে হয়। ঈদের ছুটির সাথে মিলিয়ে আমাদের এর আগে আসা সম্ভব ছিল না। সাকুরাও মনে হয় আমাদের জন্য অপেক্ষায় ছিল। মামি সেটাই আমাদের বারবার বলছিলেন আমরা ভীষণ লাকি, আমরা আসার আগেরদিন থেকে চেরী ফুলগুলো ফুটতে শুরু করেছিল। আমরা একদম পীক টাইমে এসেছি।

ইয়োকোহামা পোর্ট - জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার

প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ের ইয়োকোহামা পোর্ট জাপানের অন্যতম বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এবং সেই সাথে জাপানের আধুনিক ইতিহাসেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার মাধ্যমে জাপান প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে আধুনিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। ইয়োকোহামা পোর্টের আধুনিক ইতিহাস মূলত শুরু হয় ১৮৫৩ সালে ৪টি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে মার্কিন নৌ কমোডোর ম্যাথিউ পেরির জাপান আগমনের মধ্য দিয়ে। এই ঘটনাকে জাপানের আধুনিক যুগের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কারণ দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর এই সময় থেকেই জাপান আবার বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে শুরু করে। ১৯৫৪ সালে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যেটিকে বলা হয় কানাগাওয়া চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমে ইয়োকোহামা বন্দর আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত হয়। পশ্চিমা দেশগুলির সাথে বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়, এবং এই সময়ে পশ্চিমা প্রযুক্তি, শিল্প এবং আধুনিকতা জাপানে প্রবেশ করতে থাকে। ইয়োকোহামার বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবহনের পাশাপাশি নতুন ধরনের ধারণা এবং চিন্তাভাবনা জাপানে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

ইয়োকোহামার পোর্টের পাশেই ইয়ামাশিতা পার্ক। এই পার্কটি ১৯২৩ সালের গ্রেট কান্তো ভূমিকম্পের পর নির্মিত হয় এবং এটি ইয়োকোহামার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

পার্কের পাশ দিয়ে অনেক পুরানো জাহাজ নোঙর করা রয়েছে। পার্কের মধ্যেই টিউলিপ বাগান, সেখানে ফুটে আছে নানা রঙের টিউলিপ। এখানে অনেক ছবি তুললাম আমরা। আমার বড় মামা ছিলেন অনেক বিখ্যাত একজন ফটো সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার। অনেক আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফি পুরস্কার তাঁর ঝুলিতে ছিল। আমার সেজমামাও কম না। সেজমামার ফটো সেন্স খুব শার্প। তার তোলা ছবিতে অনেক মেসেজ থাকে। পোর্টে আসার পথে ছোট একটি চার্চ চোখে পড়ল। একপাশে ছোট পানির ফোয়ারা আর উঠোনে বটগাছের মতো একটা চেরি ফুলের গাছ। এমনভাবে ফুল ফুটেছে গাছ আর ডালপালা দেখা যাচ্ছে না।

পার্কে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আমরা বাসে করে আবার ফুজিসাওয়া ফিরে এলাম। এখানেই লাঞ্চ করব। লিয়েরে নামের একটা শপিংমলের ফুড কোর্টে ঢুকে পড়লাম। তিনজন তিন রকমের নুডলস স্যুপ নিলাম। বীফ, ভেজিটেবল আর পর্ক। খেয়ে দেয়ে ফুজিসাওয়া স্টেশনে গেলাম বুলেট ট্রেনের টিকিট কাটতে। আগামীকাল সকালে আমরা তিনজনই কিয়োটো যাব। মামা আমাদের সাথে যাবেন। কিয়োটোতে ঘুরে বিকেলের ট্রেনেই চলে আসবেন। তার পরদিন মামার ইউনিভার্সিটিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ আর মিটিং আছে। আমরা দু'দিনের জন্য কিয়োটো থেকে যাব। ফুজিসাওয়া স্টেশনে গিয়ে দেখি বুলেট ট্রেনের কাউন্টারে অনেক লম্বা লাইন। মামা বললেন আমরা তাহলে সুজিদো থেকেই টিকিট কাটি। ওখানে কম ভিড় হয়।

সুজিদো গিয়ে দেখি এখানে আরো বেশি ভিড়। একটা হাই স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসেছে বুলেট ট্রেনের টিকিট কাটতে, তাদের স্কুলের প্রোগ্রামে ওসাকা যাবে। আমরা হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে কাউন্টারের ভেতর থেকে একজন অফিসার বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন আমাদের কোনো সাহায্য লাগবে কিনা। মামা সব খুলে বললেন। উনি মামাকে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। দশ মিনিট পর মামা বিজয়ী বেশে বের হয়ে আসলেন টিকিট হাতে নিয়ে। সুইকা কার্ড বুলেট ট্রেনে কাজ করবে না। তাই আলাদা প্রিন্টেড টিকিট। আমাদের তিনজনের টোকিও থেকে কিয়োটোর রাউন্ড টিকিটের জন্য খরচ পড়েছে ৭২ হাজার ইয়েন, বাংলাদেশি টাকায় ৬০ হাজার টাকা। বাসায় ফিরে কিয়োটোর জন্য হোটেল খুঁজতে বসে গেলাম। আমার মা যে এলাকায় থাকতেন তার নাম হাকুমামবেন ক্রসিং। একটা রেল ক্রসিংয়ের পাশে। সবচেয়ে কম বাজেটে যা পেলাম সেটি ঠিক হোটেল না, হোস্টেল। হোটেল সব পার নাইট ১৫ হাজার ইয়েনের উপরে। এই হোস্টেলটাও খারাপ না। মামা বললেন এই হোস্টেলে তিনি আগে একবার ছিলেন একটা রুম নিলাম টুইন বেড, কিচেন, ডাইনিং, ওয়াশরুম আর টয়লেট শেয়ারড। পার নাইট সাড়ে ১১ হাজার ইয়েন। নিয়ে নিলাম দুদিনের জন্য। বুলেট ট্রেনে চড়ব– এই এক্সাইটমেন্ট নিয়ে ঘুমাতে গেলাম।

শিনকানসেন (বুলেট ট্রেন)

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখি প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি আর সাথে দমকা হাওয়া। মন খারাপ হয়ে গেল। এই ওয়েদারে বাবাকে নিয়ে বের হওয়া যাবে না। ব্রেকফাস্ট শেষ করে মামা বলেন তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিতে। ওয়েদার রিপোর্ট বলছে একটু পরেই বৃষ্টি থামবে। আমি আশা নিরাশার দোলাচলে রেডি হচ্ছি, ১৫ মিনিট পর সত্যি সত্যি বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশ যদিও মেঘলা এখনো। মামা বললেন এখানে ওয়েদার রিপোর্ট বেশিরভাগ সময়ই একুরেট থাকে। আমরা সবাই রেডি হয়ে বের হয়ে পড়লাম। মামি কাজে যাবেন আর আমরা তিনজন কিয়োটো। বুলেট ট্রেনের স্টেশন সুজিদো থেকে তিন স্টেশন পরে ‘ওদাওয়ারা’তে। সেখানে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে আগে লোকাল ট্রেনে করে ঐ স্টেশন এ যেতে হবে। সুজিদো থেকে ট্রেনে উঠার পর পরই আবার শুরু হলো বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়া। ট্রেন বন্ধ করে দিল। প্ল্যাটফর্ম আর ট্রেনে এনাউন্সমেন্ট করছে ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির জন্য আপাতত ট্রেন বন্ধ থাকবে। প্রায় আধাঘণ্টা পর বৃষ্টি, হাওয়া বাতাস সব বন্ধ হয়ে আকাশ পরিষ্কার হওয়া শুরু করল। ওদায়াওয়ারা ট্রেন স্টেশন থেকে বুলেট ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে যেতে কিছুক্ষণ হাঁটতে হলো।

বুলেট ট্রেনের স্টেশনে ঢুকে তো মনে হলো এয়ারপোর্টে ঢুকে পড়েছি। ডিউটি ফ্রি শপ ছাড়া সবই আছে এখানে। আমি একটা সেভেল ইলেভেনে ঢুকে কিছু খাওয়ার কিনে নিলাম। লম্বা ট্রেন জার্নি, খিদে লাগবে। তিনটে স্যান্ডউইচ, সালাদ আর বীফ পাস্তা নিলাম। সাথে তিনটে চা। আমি অবশ্য বাসা থেকে আমার জন্য থার্মাল ফ্লাস্কে করে কফি নিয়ে এসেছি। কিয়োটো তে নাকি বেশ ঠাণ্ডা পড়ে।

আমাদের বুলেট ট্রেনের নাম ‘হিকারি’ টোকিও থেকে ছেড়ে দিয়েছে। আর ১০ মিনিটের মধ্যেই এখানে পৌঁছাবে। আমরা অন্য সবার মতো লাইনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মামা আগে দাঁড়ালেন। উনি আগে উঠে সিট ধরবেন। যদি ভিড় হয় একসাথে তিনজনের সিট পাওয়া যাবে না। ট্রেন এলো। আশ্চর্য, পুরো ট্রেনই খালি। আমাদের বগিতে সব মিলিয়ে ১০ জন লোকও নেই। যাই হোক, আমরা ডান পাশে পছন্দমতো সিট নিয়ে বসলাম। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এ পাশ থেকে মাউন্ট ফুজি খুব কাছ থেকে ভালোভাবে দেখা যায়। মামা বললেন ঝড়বৃষ্টির জন্যেই নাকি প্যাসেঞ্জার কম। নাহলে সিট পাওয়াই টাফ হয়ে যেত। ট্রেন চলতে শুরু করল। আমি জিপিএস স্পিডোমিটার দিয়ে ট্রেনের স্পিড মাপছি দেখে মামা তার মোবাইলেও ইন্সটল করে দিতে বললেন। দুটো মোবাইলই জানালায় পাশাপাশি রাখলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফুল স্পিডে উঠে গেল ট্রেন। ঘণ্টায় ২৮০ থেকে ২৯০ কিলোমিটার স্পিডে এ চলছে। এতো স্পিডে যাচ্ছি কিন্তু বিকট কোনো আওয়াজ নেই, ঝাঁকুনিও নেই।

মামা বললেন আমার মা যখন এসেছিলেন ৪৫ বছর আগে, সেজ মামার সাথে টোকিও থেকে কিয়োটো গিয়েছিলেন বুলেট ট্রেনে চড়ে।

– ৪৫ বছর আগে বুলেট ট্রেন ছিল?

– আমার প্রশ্ন শুনে মুচকি হেসে মামা জানালেন, জাপানে বুলেট ট্রেন চালু হয় আজ থেকে ৬০ বছর আগে, ১৯৬৪ সালে।

স্থানীয়ভাবে 'শিনকানসেন' নামে পরিচিত বুলেট ট্রেন শুধুমাত্র দেশটির পরিবহন ব্যবস্থার নয়, বরং জাপানের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও অর্থনৈতিক শক্তির এক উদাহরণ। ১৯৫০ এর দশকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হেরে যাওয়া জাপান দেশ পুনর্গঠনের এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেক প্রকল্প হাতে নেয় যার একটি ছিল দেশটির প্রধান শহরগুলোর মধ্যে যাতায়াতের সময় কমানোর জন্য একটি উচ্চগতির রেলসেবা। ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকের সময়, তোকাইডো শিনকানসেন নামে বিশ্বের প্রথম বুলেট ট্রেন সেবা চালু করা হয় জাপানে যা পুরো পৃথিবীতে হৈচৈ ফেলে দেয়। জাপানের এসে যদি শিনকানসেনে না চড়েন, তাহলে আপনার জাপান ভ্রমণ অপূর্ণ থেকে যাবে। বুলেট ট্রেনের প্রযুক্তি দিনে দিনে আরও আধুনিক হচ্ছে। 'ম্যাগলেভ' প্রযুক্তির মাধ্যমে শিনকানসেন ট্রেনগুলো ঘণ্টায় ৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিতে চলতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কিয়োটো স্টেশন ও কিয়োটো টাওয়ার

কিয়োটো জাপানের ব্যস্ততম স্টেশনগুলোর মধ্যে অন্যতম। স্টেশনের আকারও অনেক বড়। স্টেশনেই সবকিছু আছে। এমনকি ফাইভ স্টার হোটেলও। স্টেশনের পাশেই কিয়োটো টাওয়ার। এটি কিয়োতোর সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং এবং কিয়োটোর আইকনিক ল্যান্ডমার্ক। টাওয়ারটি ১৯৬৪ সালে উদ্বোধন হয়েছিল, একই বছর শিনকানসেন চালু হয় এবং টোকিও অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

স্টেশন থেকে বের হয়েই টের পেলাম এখানে ঠাণ্ডাটা একটু বেশিই, ৬ ডিগ্রি। বাবাকে মাফলার আর হাতে গ্লাভস পরিয়ে দিলাম। এরপর ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গিয়ে কিউতে দাঁড়ালাম। ট্যাক্সি হিসেবে আসছে অডি, বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজের মতো বিলাসবহুল গাড়ি। আমরা পেলাম টয়োটা ক্রাউন, ড্রাইভার একজন ভদ্রমহিলা, বয়স ৬৫ হবে। মামার সাথে গল্পজুড়ে দিলেন। আমরা কেন কিয়োটো এসেছি সেটা শুনে উনিও একটু ইমোশনাল হয়ে গেলেন। বাসে না গিয়ে ট্যাক্সি নিয়েছি কারণ, বাস অনেক সময় নেবে আর আমাদের হাতে সময় কম। মামাকে আজকেই ফিরতে হবে। আমরা এখন সোজা চলে যাব হাকুমামবেন ক্রসিংয়ে। ওখানে গিয়ে ঐ বাসাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব যেখানে মা আর মামারা থাকতেন। আর যাবো কামো নদীর পাড়ে। যেখানে মা আর মামা মামি আমার দাদুরা প্রায়ই বিকেলে হাঁটতে যেতেন।

কিয়ো-তো আর তো-কিয়ো, জাপানের দুটি রাজধানীর গল্প

জাপানের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে দুটি শহরের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যার একটি হলো বর্তমান রাজধানী টোকিও, আরেকটি হলো প্রাচীন রাজধানী কিয়োটো। এই দুটি শহর জাপানের ইতিহাসের দুই ভিন্ন যুগের প্রতীক, যেখানে একদিকে কিয়োটো ঐতিহ্য ও সামন্তবাদী জাপানের প্রতিচ্ছবি, অন্যদিকে টোকিও আধুনিকতা ও প্রযুক্তিগত উন্নতির এক উদাহরণ। কিয়োটো কে বলা হতো 'পশ্চিমের রাজধানী' আর 'টোকিও' শব্দের অর্থ 'পূর্বদিকের রাজধানী'।

ঐতিহ্যের শহর কিয়োটো জাপানের প্রাচীন রাজধানী, প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশটির সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে এই শহরটি।

কিয়োটো প্রথমে হেইয়ান-কিও নামে পরিচিত ছিল এবং এটি ৭৯৪ সালে জাপানের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। হেইয়ান যুগকে জাপানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ বলা হয়। রাজধানী কিয়োটো থেকে টোকিওতে চলে গেলেও কিয়োটো এখনো জাপানের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবেই রয়ে গেছে।

টোকিওর আগের নাম ছিল 'এদো'। এদো শহরটি ১৬০৩ সালে টোকুগাওয়া শোগুনাতের অধীনে জাপানের রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। টোকুগাওয়া শোগুনরা জাপানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিয়ন্ত্রণ চালাতেন এবং এদোতে তাদের প্রশাসন গড়ে তোলেন। যদিও সম্রাট তখনও কিয়োটোতে অবস্থান করতেন, এদো ছিল শোগুনদের সামরিক এবং রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রবিন্দু।

১৮৬৮ সালে মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় কিয়োটো শহর থেকে তোকুগাওয়া রাজবংশ ক্ষমতাচ্যুত হয়, শোগুনাতের পতন ঘটে এবং জাপানের রাজধানীকে এদোতে সরিয়ে নেওয়া হয়। ঐ বছরেই শহরটির পুরানো নাম 'এদো' থেকে বদলে 'টোকিও' রাখা হয়। তখন থেকেই জাপানের আধুনিকায়নের সূচনা হয় এবং দেশটিতে পশ্চিমা প্রযুক্তি, শিল্প এবং সামাজিক সংস্কার প্রবেশ করতে থাকে।

হাকুমামবেন ক্রসিং

একটা রেল ক্রসিং, তার পাশেই আবাসিক এলাকা। এখান থেকে আমার মেজমামার ক্যাম্পাস কিয়োটো ইউনিভার্সিটি খুব কাছে হওয়ায় এখানেই বাসা নিয়েছিলেন মেজ মামা। এই বাসায় প্রথম উঠেছিলেন মেজমামা আর মামি। পরে আমার মা এলেন, আমার দাদু এসেছেন বেশ কয়েকবার। দিদিমাও ঘুরে এসেছিলেন একবার। সেজমামাও কিছুদিন এখানে ছিলেন প্রথম প্রথম জাপানে এসে। তারপর উনি টোকিওতে চলে যান। আর, মেজমামাও জাপান থেকে আমেরিকার আরিজোনায় চলে যান ১৯৮৫ সালে। এরপর অবশ্য সেজ মামা কিয়োটোতে অনেকবার এলেও

হাকুমামবেনে আর কখনো আসেননি। আজকে এখানে আমাদের সাথে সেজ মামার আসাটা তাঁর জন্যও অনেকটা নস্টালজিক। প্রথমে আমরা রেল ক্রসিংয়ের ওখানে গেলাম। ওখান থেকেই বাসাটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। এই এলাকাটি ৪০/৪৫ বছরে অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। কিছুই আগের মতো নেই। সেজ মামা চিনতেই পারছেন না। বাসার সাথে লাগোয়া একটা স্কুল ছিল, সেই স্কুলটা খোঁজার চেষ্টা করলাম। এলাকাটা একদমই নিরিবিলি, রাস্তাঘাটে কাউকে পেলাম না যে একটু জিজ্ঞেস করব। অনেক খুঁজেও স্কুলটা পেলাম না। পুরো এলাকা ঘণ্টাখানেক চষে ফেলেও আমরা বাসাটা লোকেট করতে পারলাম না। মামা সম্ভাব্য দুইটা বাসার কথা বলেছেন যে সেটা হতে পারে। কিন্তু তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না। আসলে এতো কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে।

হয়তো সেই বাসার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। হয়তো সেই বাসার সামনে দিয়েই হেঁটে এসেছি, কিন্তু চিনতে পারিনি। মিশ্র একটা অনুভূতি নিয়ে মেঘলা আকাশ পানে ভেজা চোখটা বন্ধ করে আমার মায়ের দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দিলাম।

কামো ও তাকানো নদীর মোহনায়

কিয়োটোর বুকের মাঝখান দিয়ে কামো ও তাকানো নদী বয়ে গেছে। এই দুই নদী এসে মিশেছে হাকুমামবেনের পাশেই একটা মোহনায়। নদী দুটো অগভীর হলেও বেশ খরস্রোতা। নদীর পার ধরে হাঁটার প্রশস্ত রাস্তা, সেখানে সারি সারি চেরি ফুলের গাছ আর নানার রঙের ফুল গাছ। নদীর ওপর তিনটে ব্রিজ আর ওপারে বড় একটা পার্ক। এইখানে তোলা মার বেশ কিছু ছবি আমি দেখেছি বাসার ফটো এলবামে। এই জায়গাটা খুব একটা চেঞ্জ হয়নি। মামাও তাই বললেন। আমরা বেশ কিছুক্ষণ হাঁটলাম, ছবি তুললাম। নদীর ধারে একটু বসলাম। মামাকে চলে যেতে হবে। এখন রওনা না দিলে সময় মতো বাসায় পৌঁছাতে পারবেন না। মামাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আমরা আমাদের হোস্টেলের দিকে চলে গেলাম। বাবার রেস্ট দরকার।

হাকুমামবেন গেস্ট হাউস

আমাদের হোস্টেল ছোটখাটো ৪ তলা একটা বিল্ডিং, খুব পরিপাটি। গেস্ট হাউস চালান মা আর মেয়ে মিলে। দোতলায় দুই পাশে দুইটা টুইন বেড রুম। মাঝখানে লাইব্রেরি, কমন কিচেন, ডাইনিং, বাথরুম আর টয়লেট। বাকি দুই ফ্লোরে সব বাংক বেড আর নিচতলায় ছোট একটা বার। বাবা শাওয়ার নিয়ে রিলাক্স মুডে ঘুমাতে গেলেন, আর আমি আবার বের হলাম, একটু ঘুরব আর আসার সময় ডিনারের আর ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত করব। গেস্ট হাউস থেকে বের হয়েই দেখলাম আশে পাশে সব রেস্টুরেন্ট। সেভেন ইলেভে ছাড়াও আরো দুইটা বেশ বড় কনভেনিয়েন্স স্টোর

শিমোগামো শ্রেরাইনে আমি আর বাবা

আছে রাস্তায় ওপারে। পাশেই অনেক বড় একটা টেম্পল, চিওন-জি। কালকে ওখানে যাবো বাবাকে নিয়ে।

আবার নদীর মোহনায়

আমি সেভেন ইলেভেন থেকে ২৫০ এমএল এর সাকের টেট্রাপ্যাক নিলাম। হাঁটতে হাঁটতে নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেলাম। পার্কে অনেকেই এসেছে। সিংগেল, কাপল, ফ্রেন্ডস গ্রুপ। কাউকে কাউকে দেখলাম ঘাসের ওপর চাদর বিছিয়ে শুয়ে আছে। এক বয়স্ক কাপল দেখলাম গল্পে বিভোর। ভালো লাগল। একটা বড় গ্রুপও এসেছে 'হানামি' (পিকনিক) করতে। এদের সবার হাতে ওয়াইনের গ্লাস আর সামনে কয়েকটা ওয়াইনের আর সাকের বোতল। আমি এগিয়ে একদম মোহনায় চলে গেলাম। কলকল শব্দে নদীর পানি বয়ে যাচ্ছে। পাশেই ব্যস্ততম রাস্তা কিন্তু কোনো হর্ণের আওয়াজ নেই। চারদিকে শুধু নদীর আওয়াজ। আমি মোহনার একদম মুখে বসে পড়লাম। এখানে বসেই সাকেটা শেষ করলাম। সাকে শেষ করার পরই টের পেলাম যে এটা সাইজে ছোট হলেও এটার ইমপ্যাক্ট অসাধারণ। একদম জেঁকে ধরেছে আমাকে। আমি আরো কিছুক্ষণ বসলাম, ভালই লাগছে, আকাশ একটু মেঘলা, সূর্য ডুবে গেছে। ব্রিজের, রাস্তার আর পার্কের সব লাইট জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই আলোয় চেরী গাছগুলোকে অন্যরকম সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করে আমি আবার সেভেন ইলেভেনের দিকে গেলাম। রাতের ডিনারের জন্য নিলাম

টুনার পাস্তা, অক্টোপাস আর ব্রকলির সালাদ, সুসি প্লাটার আর ব্যাকআপ হিসেবে একটা স্যান্ডউইচ, যদি বাবা এসবের কিছু খেতে না চায় তাহলে স্যান্ডউইচ দিয়েই ডিনার সারবেন। ব্রেকফাস্টের জন্য চারটা ডিম, চারটা কলা, আর দুটো নুডলস বোল। একটা জাপানিজ সানতোরি সুই জিন এন্ড টনিকের একটা ক্যান। হোস্টেলে ফিরে শাওয়ার নিয়ে ডিনারের আয়োজন করলাম ডাইনিং টেবিলে। যা ভেবেছিলাম তাই, বাবা স্যান্ডউইচ ছাড়া আর কিছুই খেলেন না। সুসি বাবা পছন্দ করেন না, সি ফুডও না। আমি ভেবেছিলাম অন্তত পাস্তাটা খাবেন, তাও খেলেন না।

কাল আমাদের প্ল্যান, চিওন-জি টেম্পল, শিমিগামো-শ্রাইন, কিয়োটো ইমপেরিয়াল প্যালেস, কিনকাকুজি, কিয়মিজু, হনগানজি আর সামুরাই মিউজিয়ামে ট্রেডিশনাল সামুরাই ড্রেস পরে সামুরাই এক্সপেরিয়েন্স নেওয়া। আমি আর বাবা সামুরাই ড্রেস পরে সোর্ড হাতে নিয়ে অ্যাকশান পোজ দিচ্ছি, ভাবতেই মজা লাগছে।

কিয়োটোতে ঘোরাঘুরি শুরু - চিওন-জি টেম্পল

সকালে উঠে ডিম সেদ্ধ, বোল নুডলস আর কলা দিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম। এই হোস্টেলের কিচেনে চা আর কফি আছে। আপনাকে বানিয়ে খেতে হবে। বাবার জন্য এক মগ রোস্টেড গ্রীন টি আর আমার জন্য এক বালতি (!) কফি বানালাম (আমি অনেক কফি খাই)। তারপর বাপ-বেটায় বের হয়ে পরলাম কিয়োটো দর্শনে। প্রথমে গেলাম পাশের চিওন-জি টেম্পল এ। ৭৯৪ সালে বানানো এই টেম্পলটি পুরোটাই কাঠের তৈরি। শুধু টেম্পল না। আশেপাশের যতো স্ট্রাকচার আছে সব কাঠের। বাবাকে ভেতরে নিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ বসলাম ভেতরে। অদ্ভুত একটা ফিলিংস হয় এই ধরনের স্ট্রাকচারে ঢুকলে। অনেক উঁচু ছাদ, কাঠের ঝকঝকে ফ্লোর, বিশাল বিশাল কাঠের কলাম, অনেক বড় হলরুম। আমার মা আর মামা-মামিরা এই টেম্পলেই সবসময় আসতেন বাসার কাছে হওয়ায়। আজকে অনেক জাপানিজ ও বিদেশী টুরিস্ট এসেছেন দেখলাম। আমরা বেশ কিছুক্ষণ থেকে বেরিয়ে পরলাম শিমিগামো-শ্রাইনের দিকে।

শিমিগামো-শ্রাইন

নদীর পার ধরে কিছুদূর হেঁটেই পৌঁছে গেলাম শিমিগামো-শ্রাইনে। শ্রাইন হচ্ছে শিন্তো ধর্মাবলম্বীদের টেম্পল। অনেক বড় এরিয়াজুড়ে এই টেম্পল। ৬ষ্ঠ শতকে বানানো এই টেম্পলটাও পুরোটা কাঠের তৈরি। শিন্তো জাপানের প্রধান ধর্ম। দেশটির ৮০% মানুষ বিভিন্ন ভাবে শিন্তো রীতিনীতি পালন করে কিন্তু আদমশুমারির সময় খুব অল্প সংখ্যক লোক নিজেদেরকে শিন্তো ধর্মানুসারী বলে পরিচয় দেয়। আসলে, জাপানে শিন্তো একটি পরম্পরাগত ব্যাপার। এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শিন্তো ধর্মাবলম্বী হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার নেই যা অন্য সব ধর্মেই আছে। কিছু প্রথাগত বিশ্বাস

এবং তার ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রাইনগুলোতে শিন্তো ধর্মানুসারীরা জমায়েত হয়। আকাশে কড়া রোদ কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা বাতাস চারিদিকে। এইসময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। বাবা জানালেন, তার একটু খারাপ লাগছে। আমি বাবাকে এক পাশে বসালাম। বাবার চোখ মুখ ফ্যাকাশে লাগছে। একটু জিরিয়ে নিয়ে, ট্যাক্সি ডেকে সোজা হোস্টেলে নিয়ে গেলাম বাবাকে। আমাদের ইম্পেরিয়াল প্যালেস, বাকি টেম্পল গুলো আর সামুরাই এর ওখানে আর যাওয়া হলো না।

সুজিদোতে ফেরা

বাবা একটু স্ট্যাবল হওয়ার পর বাবাকে নিয়ে কিয়োটো স্টেশনে চলে গেলাম। আমাদের বিকেলেরটোকিওগামী বুলেট ট্রেনের নাম 'কোদামা এক্সপ্রেস'। বাবা বাসার বাইরে স্যান্ডউইচ ছাড়া কিছুই খাচ্ছেন না, বাবার জন্য তাই নিলাম আর তার প্রিয় জাপানিজ গ্রীন টি। আমি নিলাম সি উইডে র‍্যাপ করা স্টিকি রাইসের রোল, দুই ধরনের সালাদ, বেকড ফিশ পাস্তা আর সেই জাপানিজ সানতোরি সুই জিন এন্ড টনিকের একটা ক্যান। এই ক্যানড ককটেল ড্রিংকসগুলো আমার খুব ভাল লেগেছে। আরো অনেক ধরনের ককটেল ছিল, দামও অনেক কম। এই ৫০০ এমএল এর ক্যানের দাম মাত্র ১৬০ ইয়েন, ১৩০ টাকার মতো। ভাবা যায়?

মাউন্ট ফুজি

মামা মামিকে জানালাম আমরা রওনা দিয়েছি কিয়োটো থেকে। মামা বললেন আজকে আকাশ একদম ক্লিয়ার, শিজুকা স্টেশন পার হলে মাউন্ট ফুজি অনেক কাছ থেকে দেখা যাবে। আসার সময় ঝড় বৃষ্টি আর মেঘের জন্য দেখা যায়নি। বাবা পুরো রাস্তাটাই ঘুমিয়ে আসলেন। শুধু মাউন্ট ফুজি দেখার জন্য ডেকে দিয়েছিলাম। শিজুকা পার হওয়ার পর মনে হলো আমরা মাউন্ট ফুজির কোল ঘেঁষেই যাচ্ছি। অনেক কাছে। মাউন্ট ফুজি (ফুজিসান) শুধু জাপানের সবচেয়ে উঁচু পর্বতই নয়, এটি এটি জাপানের প্রতীক। ৩,৭৭৬ মিটার (১২,৩৮৯ ফুট) উঁচু এই সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখটি বছরের অধিকাংশ সময়ই বরফে ঢাকা থাকে বলে দেখতে খুব সুন্দর লাগে। ১৭০৭ ও ১৭০৮ সালে এখানে সর্বশেষ অগ্নুৎপাতের ঘটনা ঘটে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে এটি ভবিষ্যতে আবারও সক্রিয় হতে পারে। রাজধানী টোকিও থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার পশ্চিমে হনশু দ্বীপে মাউন্ট ফুজি অবস্থিত। মাউন্ট ফুজি শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত নয়, বরং এটি জাপানিদের কাছে গভীর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক অর্থও বহন করে। মামার বাসার বারান্দা থেকে প্রতিদিন দেখি। কিন্তু এখন এত কাছ থেকে দেখে অন্যরকম লাগছে।

প্রাচীনকাল থেকে ফুজিকে একটি পবিত্র পর্বত হিসেবে দেখা হয়েছে। শিন্তো ধর্মে মাউন্ট ফুজিকে 'কামি' বা দেবতার বসবাসস্থান হিসেবে মনে করা হয়। হাজার

বছর ধরে শিন্তো পুণ্যার্থীরা ফুজি পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করে, দেবতাদের সম্মান জানাতে এবং আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্য। বৌদ্ধ ধর্মে ফুজি পর্বতকে আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক জাগরণের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। বৌদ্ধ সাধকরাও প্রাচীনকাল থেকে ফুজিতে আরোহণ করে যোগ, ধ্যান এবং প্রার্থনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক মুক্তি খুঁজতেন। ফুজি পর্বতের চূড়ায় পৌঁছানোর অর্থ হলো জীবনের পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া এবং আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া। বর্তমান সময়ে হাইকিং ও ট্র্যাকিং এর জন্যও মাউন্ট ফুজি অনেক জনপ্রিয় একটি স্পট। প্রতি বছর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় ৩ লক্ষ পর্যটক মাউন্ট ফুজির চূড়ায় যান। আমার সেজমামাও মাউন্ট ফুজিতে দুইবার উঠেছেন। আমারো ইচ্ছে আছে পরে কখনো আসলে মাউন্ট ফুজিতে উঠব। সাকুরার সময় মাউন্ট ফুজির পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয় ফুজি শিবুজাকুরা ফেস্টিভ্যাল। এই সময়ে চেরি ও বিভিন্ন রঙের ফুল ফোটায় মাউন্ট ফুজির চারপাশে অসাধারণ ল্যান্ডস্কেপ তৈরি হয়।

জাপানে, শেষ দিন

আইটেনারি অনুযায়ী আজকে আমাদের হাকোনে লেকে একটা পুরনো কাঠের জাহাজে চড়ে লাঞ্চ করতে করতে মাউন্ট ফুজি দেখতে যাওয়ার কথা আর বিকেলে যাওয়ার কথা সেন্ট্রাল টোকিওতে। কিন্তু বাবার যা কন্ডিশন দেখছি আজকে উনাকে ফুল রেস্টে রাখাটাই বেটার। কাল ভোর ৬ টায় বের হতে হবে এয়ারপোর্টের উদ্দেশে। মাউন্ট ফুজি তো গতকাল অনেক কাছ থেকে দেখেছি, আর সেন্ট্রাল টোকিওতে বাবার সেনসোজি টেম্পল আর উয়েনো পার্ক ছাড়া অন্য কিছু আর তেমন ভালো লাগবে না। টেম্পল বাবা অনেকগুলো দেখেছেন আর সাকুরাও দেখেছে অনেক। তাই অনেক হিসেব নিকেশ করে মামা ভাগ্নে মিলে বৃহত্তর স্বার্থে আজকের সব ট্যুর প্ল্যান ক্যান্সেল করে দিলাম। আমার খুব ইচ্ছে ছিল জাপানিজ ট্রেডিশনাল ড্রেস পরিয়ে বাবার একটা ছবি তুলব। মা'র কিমানো (জাপানিজ ট্রেডিশনাল ড্রেস) পরা অনেক ছবি আছে। সেটা আর হলো না।

আজকে মামা মামি দুজনেরই ছুটি। মামি আমাকে নিয়ে লাঞ্চের পর বের হবেন। আমরা সুজিদো বীচে যাব। সুজিদো পার্ক পার হয়ে বীচে যেতে হয়। এই প্রথম একটা পার্ক দেখলাম জাপানে যেটাতে কোনো চেরি ফুলের গাছ চোখে পড়ল না। বীচে গিয়ে দেখলাম হাই স্কুলের ছেলেরা বীচে ফুটবল খেলেছে। পানি একদম পরিষ্কার। অনেক বড় বড় ঢেউ আসছে তাই অনেকেই সার্ফিং করতে এসেছে। আর এক দল লোক ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে। এখান থেকেও মাউন্ট ফুজি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, প্রশান্ত মহাসাগরের পারে মাউন্ট ফুজি।

ফেরার পথে ফুটপাতের পাশে দেখলাম অস্থায়ী সবজি ও ফলের বাজার। একদম ফ্রেশ ও দামে সুপারমার্কেটের চেয়ে অনেক কম। আমি আর মামি মিলে অনেক বাজার

করলাম। তারপর এই বাজারগুলো বাসায় রেখে আমি আর মামি আবার বের হলাম শপিং মলের দিকে আমার ফাইনাল-ফাইনাল (!) কেনাকাটা করার জন্য। বাসায় এসে লাগেজ প্যাকিং শেষে ডিনার করতে করতে একটু গল্পগুজব করলাম। বাবাকে এখন অনেকটা ফ্রেশ লাগছে। কাল সকালে এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্য মামা ট্যাক্সি বুক করে রেখেছেন। লাগেজ বেড়েছে দুটো আর বাবাকে নিয়ে ট্রেনে যাওয়াটা এই মুহূর্তে ওয়াইজ হবে না। ট্যাক্সি ভাড়া ২০/২২ হাজার ইয়েনের মতো আসতে পারে বলে মামা ধারণা দিয়েছিলেন তাই এটিএম থেকে ইয়েন তুলে এনেছিলাম আসার সময়। যদিও এখানে ট্যাক্সি ভাড়া কার্ডেও পেমেন্ট করা যায়। তারপরেও রিস্ক নিলাম না।

গুড নাইট জাপান! ও-ইয়া সুমি না সাই!

পরদিন ভোরে উঠে রেডি হয়ে নিলাম। অল্প ব্রেকফাস্ট ও চা কফি খেয়ে ৬ টায় বের হলাম বাসা থেকে। এই ট্যাক্সি ড্রাইভারও ভদ্রমহিলা। আমি হিসেব করে দেখলাম, জাপানে আমরা ট্যাক্সি চড়েছি ৬ বার, তার মধ্যে চারজনই ছিলেন ভদ্রমহিলা, এবং সবাই বয়স্ক কিন্তু ড্যাম স্মার্ট।

হানেদা এয়ারপোর্টে

সুজিদো থেকে হানেদা এয়ারপোর্টে আসতে আমাদের সময় লেগেছে এক ঘণ্টা দশ মিনিট। দূরত্ব ছিল ৪৪ কিলোমিটার। আর, ট্যাক্সি ভাড়া এসেছে ১৮,৯০০ ইয়েন, বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১৫,৫০০ টাকা। ১৪,০০০ টাকায় ঢাকা থেকে সেভেন-সিটার গাড়ি ভাড়া করে কক্সবাজারে রাউন্ড ট্রিপ দেওয়া যায় আর এখানে বাসা থেকে এয়ারপোর্টে আসতেই তার চাইতে বেশি খরচ হয়ে গেল। হানেদা পৃথিবীর সবচাইতে পরিচ্ছন্ন এয়ারপোর্ট। গত ৯ বছর ধরে তারা টানা এই বিশ্বসেরার স্বীকৃতিটি পেয়ে আসছে। এয়ারপোর্টে আমাদেরকে সি অফ করতে এলেন আমাদের পুরনো বন্ধু মাসাহিরো সান। জাপানিজরা যে কারো নামের শেষে সম্মানার্থে 'সান' শব্দ টা অ্যাড করে যার অর্থ মিস্টার/মিস/মিসেস/মিজ।

জাপানে থাকা অনেক বন্ধু আর স্বজনদের সাথে সময়ের অভাবে আমরা দেখাই করতে পারিনি। মাসাহিরো সানের সাথেও টাইমিং মিলছিল না কিছুতেই। কিন্তু, নাছোড়বান্দা উনি আমাকে বলেছিলেন আমাদের সাথে যে করেই হোক অবশ্যই দেখা করবেন। দরকার হলে এয়ারপোর্টে এসে সি অফ করবেন। শেষ পর্যন্ত তাই হলো। মাসাহিরো সান জাপানিজ একটা দাতাসংস্থায় কাজ করেন। অফিসের কাজে উনি কয়েকবার বাংলাদেশে এসেছিলেন। আমি তখন অনেক ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা ছাড়াও বাসায় দাওয়াত করে খাওয়ানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সরষে ইলিশ, আদার ফুলের ভর্তা, শুটকির ককটেল, খাইস্যা নাকি এখনো উনার মুখে লেগে

আছে। উনি আমাকে খুব পছন্দ করেন বলেই এই কষ্টটা করলেন। শুধু তাই না, আমার মেয়ের জন্য অনেক গিফটও নিয়ে এসেছেন।

এয়ারপোর্টে বাবার জন্য এবার একজন জাপানিজ ভদ্রলোক হুইলচেয়ার নিয়ে আসলেন। বোর্ডিং শেষ করে মাসাহিরো সানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ভেতরে চলে এলাম। হানেদা এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ৩ এ লাউঞ্জকি দিয়ে এক্সেস করা যায় এমন কোনো লাউঞ্জ খুজে পেলাম না। প্রায়রিটি পাস এক্সেপ্ট করে শুধু 'টিয়াট লাউঞ্জ'। সেখানে বসেই ব্রেকফাস্ট সারলাম। ১০ টার দিকে ঐ ভদ্রলোক আবার হুইল চেয়ার নিয়ে এলেন বাবাকে নিতে। এই ফ্লাইটে এয়ারক্রাফটটা বড় ছিল। এয়ারবাস এ৩৩০।

অদ্ভুত একটা ফিলিংস নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি, আমি হয়তো জাপানে আবার আসব। বাবার সম্ভবত আর আসা হবে না। বাবাকে মার স্মৃতি বিজড়িত কিয়োটো থেকে ঘুরিয়ে এনেছি, সাকুরা দেখেছেন, বুলেট ট্রেনে চড়েছেন। আবার কিছু কিছু অপূর্ণতাও থেকে গেছে। হাতে সময় ছিল না, বাবা বেশি জার্নিও নিতে পারছিলেন না। তার

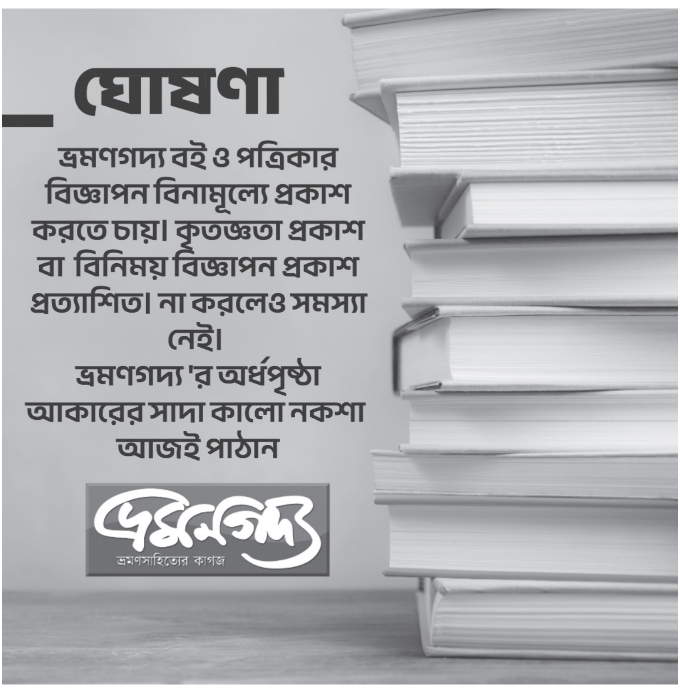

নেচার ওয়াক, শাইনিং সামবিম ও ধর্মযাত্রা

মঈনুস সুলতান

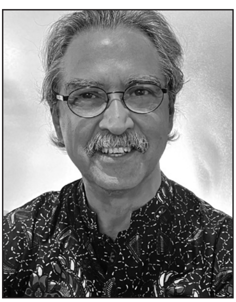

স্লিপিং ব্যাগের ওপর এক্সট্রা কম্বল চাপিয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। গোলযোগে ধড়মড় করে জেগে ওঠি। তাঁবুর বাইরে থেকে কেচোয়া ভাষায়– ঠিক কথাবার্তা নয়, কিছুটা হাঁকডাক এবং খানিকটা চ্যান্টিং ও উলু-ধ্বনির মতো আওয়াজ ভেসে আসে। পেরুর ইনকা ট্রেইলের এ ক্যাম্পসাইটটি ছিমছাম ও ইউজার ফ্রেন্ডলি। যথাসময়ে রাতের খাবার-দাবারের যেমন জোগাড়যন্ত্র হয়েছে, তেমনি তাঁবু খাটানো কিংবা ব্যথা-নিবারক হট ওয়াটার ব্যাগ প্রভৃতি পেতেও কোনো অসুবিধা হয়নি। মালমাত্তা বহনকারী কেচোয়া পোর্টারদের ছাউনি কাছেই, এছাড়া রাতভর চৌকি দেওয়ার লোকলস্কর থাকাতে নিরাপত্তা নিয়েও দুশ্চিন্তা করতে হয়নি। আন্দিজ পাহাড়ের বেশ খানিকটা হাই এলিভেশনে নিশিরাতে পরিবেশ ছিল সুনসান, ঘুমও জমে ছিল দারুণভাবে।

হল্লার আওয়াজে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে বিরক্ত হওয়ার পরিবর্তে বরং বিভ্রান্ত হই খানিকটা। কিন্তু ইচ্ছা হয় না, তাঁবুর বাইরে এসে টর্চ-ফর্চ জ্বেলে কী ঘটছে তার খাতিয়ান নেওয়ার। অসময়ের বৃষ্টি মতো হাঁকডাক কিংবা চ্যান্টিং এবং থেকে থেকে উলুধ্বনির মতো আওয়াজ মিইয়ে আসে এক সময়, তবে নিদ্রা ফিরে আসে না সহজে। গতকাল ইনকা ট্রেইলে আমাদের তথা চার বয়োবৃদ্ধ সিনিওর সিটিজেনের ট্র্যাকিং ছিল শুধু স্মরণীয়ই না, দারুণভাবে চ্যালেঞ্জিংও।

দিনের অনেকটা সময়, আমরা ট্র্যাকিং স্টিকে ভর দিয়ে, এক পা-দু-পা করে ভেঙেছি, প্রায় সাড়ে পাঁচ-শত বছর আগে পাথর কেটে তৈরি হাজার-হাজার সিঁড়ি। এক পর্যায়ে আমাদের অতিক্রম করতে হয়, 'ডেড ওয়োম্যানস্ পাস' নামে পর্যটকদের কাছে পরিচিত ১৩,৮২৮ ফুট উঁচু গিরিপথ। ক্রমাগত অক্সিজেন নেওয়ার স্ট্রেসের সাথে যুক্ত হয়েছিল, হাঁটু, পিঠ এবং কব্জিতে ব্যথার উপদ্রব। দিনের শেষে, ভালোয় ভালোয় হাঁড়গোড় না মচকে আমরা নেমে এসেছিলাম, বেশ নিচে, ১১,৮১১ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এ ক্যাম্পসাইটে।

ফের ঘুমানোর চেষ্টা করতে গিয়ে সচেতন হই যে, ট্র্যাকিং ক্লান্তি শরীরের সর্বত্র বেশ ভালোভাবে জানান দিচ্ছে। আমি মাসোল রিল্যাক্স করার পিল নেই, তারপর কম্বলে মুখ-মাথা মুড়িয়ে ভাবতে শুরু করি, আমার সহযাত্রী সুহৃদ-ত্রয়ের কথা।

এদের দু'জন গেল শতকের নয়ের দশকে কর্মরত ছিলেন, যুগপৎ কম্বোডিয়া ও লাওসে; যেখানে একই সময়ে আমিও কাজ করতাম। লাওসে আমার প্রতিবেশী উইলিয়াম ছিলেন, জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপির মস্ত চাঁই। পেশায় ডাক্তার কেভিন ছিলেন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক একটি সংস্থার প্রধান। এদের মধ্যে উইলিয়াম বিপত্নীক, তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে ট্র্যাজিক এক বিমান দুর্ঘটনায়।

কেভিন এখনো বিবাহিত আছেন, তবে তার স্ত্রী তুমুলভাবে আক্রান্ত হয়েছেন ডিপ্রেশনে; এবং বিচ্ছিন্নভাবে তিনি একাকী আরিজোনার একটি ট্রেইলারে বসবাস করছেন। এ যাত্রায় আমাদের একমাত্র নারী-সঙ্গীর নাম গ্রেইস, একসময় সে নমপেনের ইন্টারন্যাশনেল স্কুলে আর্ট-টিচার হিসেবে কাজ করত। একই সময়ে আমিও কম্বোডিয়ান ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের কর্মী হিসেবে বসবাস করছিলাম নমপেনে। আমার একাধিক কাজের একটি ছিল, বয়স্ক শিক্ষায় কোর্স সমাপন করা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বই রচনা করা। ইলাসট্রেশনে দক্ষ গ্রেইস আর্ট কন্সালটেন্ট হিসেবে ওই বইটির ছবি এঁকে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল। তখন পেশাদারি কাজ ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেছিল অন্তরঙ্গতা। স্বীকার করি, বর্তমানে বিধবা এ রমণীর প্রতি এক যুগে আমার প্রবল ক্র্যাশও ছিল। তাঁবুতে

শুয়ে মধ্যরাতে অনুভব করি, গ্রেইসের সঙ্গে ফের ইনকা ট্রেইলে একত্রে ট্র্যাক করার সুযোগ পেয়ে আমি শুধু খুশিই হইনি, উদ্দীপ্তও হয়েছি বিপুলভাবে।

ওষুধ-বিসুধের প্রভাবে শরীর ঘুমকাতর হলেও আমার মন খুঁটিয়ে নিকেশ করতে থাকে ট্রেইলের ঘটনাক্রম। ডেড ওয়োম্যানস্ পাসের সর্বোচ্চ পিক-পয়েন্ট থেকে, কায়ক্লেশে হাজার-দেড়েক ফিট নেমে এসে আমরা 'ব্রিদার' বা দম ফেলার বিরতি নিয়েছি। নাক-মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্ক খুলে নিয়ে, আন্দিজের দিগন্ত ছোঁয়া বিস্তারের এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছি। পথসঙ্গীদের মধ্যে খেচর ও তরুলতা-উদ্ভিদে বিগতভাবে আগ্রহী উইলিয়াম চোখে তুলে নিয়েছেন বাইনোকুলার। তার মুখ থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে আসে,'গাইজ, লুক অ্যাট দিস, হোয়াট অ্যা গর্জিয়াস লুকিং প্লান্ট ফ্যামিলি!' তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করি আমরা। দু'জন ট্র্যাকারকে বামন বানিয়ে, শানেমানে খোলামেলা প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে জায়েন্ট সাইজের জোড়া বৃক্ষ, তাদের মাঝামাঝি উঁকিঝুকি দিয়ে বড় হওয়ার চেষ্টা করছে তাদের শিশু-সন্তানটি।

গাইড এলিয়াসিন তিনটি বৃক্ষের সমাহারে তৈরি এ তরুবর পরিবার সম্পর্কে তথ্য দিতে গিয়ে জানায়, ব্রোমেলিয়া প্রজাতির এ বিরাট উদ্ভিদ বৃক্ষতাত্ত্বিকদের কাছে 'পুইয়া রেইমান্ডি' নামে পরিচিত। প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু বৃক্ষটি বাঁচে প্রায় এক শত বছরের মতো। পর্যটক-পুস্তকে এটিকে 'কুইন অব আন্দিজ' বলা হলেও, আদিবাসী কেচোয়া কৌমের মানুষজন এ তরুবর পরিবারটিকে বিবেচনা করে থাকে, আন্দিজ পর্বতমালার রয়েল ফ্যামিলি হিসেবে।

এলিয়াসিনের কথাবার্তায় কাট-ইন করে, একমুঠো কফি বিন চিবোতে চিবোতে কেভিন আওয়াজ দেন, 'দে লুক লাইক ট্রু রুলারস্ অব আন্দিজ।' বাইনোকুলারটি গ্রেইসের হাতে দিয়ে উইলিয়ামও বাতচিতে শামিল হন, 'হোয়াট অ্যা ট্রু ক্যারেশম্যাটিক প্লান্ট! গাইজ ডু ইউ নো, এতে ফুল ফুটে তামাম জীবনে মাত্র একবার, যখন কিনা গাছটি পৌঁছে ২৮ বছর বয়সে!'

কেভিনের হাত থেকে চকোলেটের প্রলেপে মোড়া কয়েকটি কফি-বিন চেয়ে নেই। উইলিয়াম আরেকটি তথ্য দিয়ে আমাদের চমকে দেন! তিনি ক্যাজুয়েলি জানান, 'আমিষের প্রয়োজন পড়লে, পুইয়া রেইমান্ডি গাছ ছোটখাট পাখি ভক্ষণ করে মিটিয়ে নেয় দৈহিক চাহিদা।' গাছগুলোর টাওয়ারিং হাইট থেকে চোখ ফিরিয়ে গ্রেইস, আমার হাতে কফি-বিন দেখতে পেয়ে, ভ্রূকটিতে তা সেবন করতে নিষেধ করে। বটুয়া থেকে একটি ওটমিল-কিসমিসের গ্রনোলা বার বের করে সে বলে,'হ্যাভ দিস ফার্স্ট বিফোর ইউ মান্চ অন কফি-বিন।'

নমপেন-বাসের দিনগুলিতে আমার শরীরে ধরা পড়েছিল হাইপোগ্লিসিমিয়ার ধাত। তখন থেকেই খালি-পেটে বেশিক্ষণ কোনো কাজবাজে মেতে থাকলে অসুবিধা হয়,

ওয়াট পনম এর ক্রম-উড্ডীন সিঁড়ি

আর কোনো কিছু না খেয়ে, ব্ল্যাক-কফি কিংবা হট-চকোলেট পান করলে অস্বস্তি ব্যাপকভাবে বাড়ে। একত্রে বয়স্ক-শিক্ষার পুস্তক রচনা বিষয়ক প্রকল্পে কাজ করার সময় গ্রেইস এ সমস্যাটি খেয়াল করে, এবং আমার চোখেমুখে হাইপোগ্লিসিমিয়ার আলামত ফুটে ওঠলে, সচরাচর সে তার পার্স থেকে রাইসক্রেকার বের করে নীরবে তা রেখে দিত সামনে।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সে যুগে, তার শুশ্রুষা-প্রবণ আচরণে কখনোসখনো আমার রোমাঞ্চ হতো। হাতে তুলে দেওয়া ঔটমিল-কিসমিসের গ্রেনোলা নীরবে চিবোতে চিবোতে সতেচন হই যে, আগেকার দিনের শিহরণ মিইয়ে আসলেও, ভালোলাগার আমেজটি আজ অব্দি পুরোমাত্রায় বহাল আছে। বিষয়টি স্মরণ করে আমি নীরবে গ্রেইসের দিকে তাকাই, কিন্তু সে দৃষ্টিপাত একনোলেজ না করে, নির্লিপ্ত ভঙিতে বাইনোকুলারটি হাতে নিয়ে, আন্দিজের বৃক্ষকুলের শিরোমণি রাজকীয় পরিবারটির দিকে নিশানা করে।

ফের ট্রেইলে কদম ফেলার সময় হয়ে আসে। উইলিয়মের শ্বাসকষ্টটা মৃদু হলেও তা ফিরে এসেছে আবার। তো অক্সিজেন মাস্ক পরতে এলিয়াসিন তাকে সাহায্য করে। তারপর গাইড ও শক্তপোক্ত একজন পোর্টারের নজরদারিতে তিনি হাঁটতে শুরু করেন। টিমের সবেধন নীলমণি ডাক্তারও তার পাশেপাশে চলছেন। গ্রেইস পা দুয়েক

সামনে বেড়ে, থেমে পড়ে, বিরাট সব বোল্ডারে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়া গর্তে রাখে সূর্যমুখী ফুলের বীজ। ঠিক বুঝতে পারি না, সে কেন ভাবছে– ইনকা ট্রেইলের পক্ষীকুল তার ধাতব্যের ওপর নির্ভরশীল?

হাঁটতে শুরু করি আমরা, কিন্তু বাঁকে এসে গ্রেইস ফিরে তাকায় পেছনে। একটি মাঝারি-সাইজের খেচর ছোবল মেরে তুলে নিচ্ছে বীজ, তা দেখতে পেয়ে, নিত্যদিন মেডিটেশন করা, ইয়োগাঋদ্ধ শরীরের অধিকারী নারীটির চোখেমুখে ফুটে ওঠে, ভগ্ন দেবদেউলে প্রতিমা-দর্শনের অভিব্যক্তি।

পথ চলতে হয় আমাদের। চুপচাপ হাঁটছি, গ্রেইস জানতে চায়, 'মনে আছে তোমার, সিলভার প্যাগোডায় একবার আমরা ধর্মকথা শুনতে গিয়েছিলাম, একজন অন্ধ শ্রমণ কথা বলছিলেন, আর যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হওয়া এক খেমার-পুরুষ, ধর্মকথার প্রতিটি বাক্য আমাদের জন্য ফিসফিসিয়ে ট্রান্সলেশন করে দিচ্ছিলেন?'

নমপেনের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন আইকোনিক সিলভার প্যাগোডায় আমি গ্রেইসের সঙ্গে গিয়েছি একাধিকবার, একজন বয়োবৃদ্ধ অন্ধ শ্রমণের কথাও মনে পড়ে, তবে কবে তিনি কী বলেছিলেন, আড়াই-যুগের ব্যবধানে অতশত কিছুই আর মনে নেই। আমার স্মৃতিশক্তির অক্ষমতায় অসন্তুষ্ট হয় না গ্রেইস, সে ধর্মকথায় আলোচিত গৌতম বুদ্ধের একটি বাণী মন্ত্র পড়ার ঢংয়ে বলে যায়। আমি খেয়াল করে শুনি, 'মনুষ্যজীবনের প্রকৃতি হচ্ছে, রোগশোক ও জরায় আক্রান্ত হয়ে ক্রমশ বয়োবৃদ্ধ হওয়া, এবং এক সময় ঢলে পড়া মৃত্যুর কোলে.., ইউ এন্ড আই ক্যান্ট রিয়েল অ্যাভোয়েড দিস।'

'ইউ নিড টু পে এটেনশন হিয়ার,' বলে চেঁচিয়ে এলিয়াসিন আমাদের হুশিয়ার করে দেয়। ট্রেইল এখানে শুধু এবড়ো-খেবড়ো না, সটান নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে, ইনকা যুগের বাঁধানো সিঁড়িগুলো ক্ষয়ে-ধসে রূপান্তরিত হয়েছে পাথরের ঢেলায়। দু'পাশের স্ট্রেইট-কাট ড্রপও ভীতি-জাগানিয়া। মুঠোয় শক্ত করে জোড়া ট্র্যাকিং স্টিক জাপটে ধরে, দারুণ সাবধানে এক-পা এক-পা করে আমরা এবার আগুয়ান হই।

হঠাৎ করে কেন জানি শ্লথ হয়ে আসে আমাদের চলার গতিবেগ। নিরিখ করে তাকাই নিচের দিকে। দেখি, প্রৌঢ় এক ফটোগ্রাফার ভারী-সারি ক্যামেরায় ফটাফট নিচ্ছেন আমাদের স্ন্যাপশট, প্রবল কনসেনট্রেশনে তার চশমাটি নেমে এসে ঝুলছে নাকের ডগায়। মহাশয় নির্ঘাৎ একটি পরচুলা পরে আছেন। একাধিক স্ন্যাপশটের এক পর্যায়ে, লুজ্ হয়ে ঝুলে পড়ে কৃত্রিম কেশের বাহার.., এক হাতে টাক ঢাকতে যান তিনি, নড়াচড়ায় বেল্টের অসাবধানে খুলে যাওয়া পকেট থেকে বেরিয়ে খট করে পাথরে পড়ে ক্যামেরার দু'টি লেন্স!

এলিয়াসিন এবার, 'বি কেয়ারফুল সিনিওরস, পে এটেনশন টু ইয়োর ইচ স্টেপ' বলে ফের সতর্ক করে আমাদের। তার হাঁকডাকে মৃদু ঘুমের আরামদায়ক চটকাটুকু ভেঙে যায়! হাই অলটিচুডে ঘুমঘোরে দুঃস্বপ্ন অস্বাভাবিক কিছু না। রাত তো অনেক হলো, এবার একটু ঘুমাতে হয় যে, ফ্লাশলাইট জ্বেলে, মেডিসিনের বটুয়া খুলি। নিদ্রাকর্ষক দু'টি মেলাটনিন বটিকা সেবন করে ফের চেষ্টা করি ঘুমের।

নিদ্রাকর্ষক ভেষজ বটিকার কল্যাণে তুমুল ঘুমে রাত কাবার হলেও কুলকিনারাহীন স্বপ্নের উপদ্রব থেকে রেহাই পাই না। আধো-জাগরণের ঘোরে দেখতে পাই, ইনকা ট্রেইল সংলগ্ন রোলিং-হিলগুলো ছেয়ে আছে সর্ষেরং ফুলের সোনালি আভায়। হাই-ডেজার্টের আলপাইন প্রতিবেশে লেপ্টে থাকা, মরচে বর্ণের শিলাপাথর ফুঁড়ে গজিয়েছে ল্যাভেন্ডারের আসমানি ফুলদল, চরছে গুচ্ছ গুচ্ছ লোমশ আলপাকা। খানিক দূরে– গড়িয়ে নামা প্রপাতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, স্বপ্নসঞ্জাত দৃশ্যপটের অসংখ্য ভগ্নাংশ। চেষ্টা করি, মাইক্রো ইমেজগুলোকে জোড়া দিয়ে একটি অখণ্ড চিত্র তৈরি করতে।

মনে হয়, শয্যাসঙ্গী ঘুমঘোরে সাবধানে খুলছে প্যান্টের জিপার, কিন্তু শুয়ে আছি তাঁবুতে সম্পূর্ণ একাকী, তো জেগে ওঠি ধড়মড়িয়ে। সৌররশ্মি ঝলসানো কুয়াশায় দাঁড়িয়ে এক ছায়ামূর্তি টেনে নামাচ্ছে, নিঃসঙ্গ তাঁবুর রেইনফ্লাই এর চেন। মাথাটি ভেতরে গলিয়ে গ্রেইস আওয়াজ দেয়, 'রাইজ এন্ড শাইন– রোলিং রক।' মটকা মেরে পড়ে থেকে আন্দাজ করার চেষ্টা করি, কী উদ্দেশ্য এ নারী কাকভোরে আমার টেন্টে অনুপ্রবেশ করছে। হাঁটু গেড়ে বসে, স্লিপিংব্যাগের পুরু ফোমে মোড়া পায়ের তালুতে সুড়সুড়ি দিতে দিতে সে সুর করে গায়,'ক্যান্ট ইউ হিয়ার মি নকিং/ অন ইয়োর উইন্ডো..।'

নিমেষে পেরুর অত্যন্ত ক্লাসি ক্যাম্পিংসাইট থেকে আমার দেহমন যেন ট্রান্সপোর্ট হয়ে যায়, প্রায় সাড়ে-তিন দশক আগের নমপেন শহরে। ষাটের দশকের ইংলিশ রক ব্যান্ড 'রোলিং রক' এর এ লিরিকটি, বিরানব্বই সালে নমপেন নগরীতে আমাকে মাতিয়ে ছিল দারুণভাবে। টিডিকে ক্যাসেটে রোলিং রকের আরো কিছু গানের সাথে এ সংগীতটি কপি করে গ্রেইসকে উপহার দিয়েছিলাম। তাৎক্ষণিকভাবে পজিটিভ সাড়া না পেলেও,অন্তরঙ্গ মুহূর্তের হাস্যকৌতুকে, তার মুখে আমার নামটি রোলিং রক থেকে গড়িয়ে পড়ে সংক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল শুধু রকে।

পায়ের তলায় সুড়সুড়িকে অবজ্ঞা করা মুশকিল হয়, তো চোখ খুলি। হাত বাড়িয়ে দিয়ে গ্রেইস ডিমান্ড করে, 'জাস্ট গিভ মি দ্যা প্যাকেট অব দি দার্জিলিং-টি, কেভিন ইজ ডায়িং ফর অ্যা কাপ অব ওয়ার্ম ফ্রিগরেন্ট টি।'

আমি আধশোয়া হয়ে ব্যাকপ্যাক থেকে বের করতে যাই চা এর ছোট্ট বাক্সটি। ঘাড় ও গলায় চিনকিরি দিয়ে চাগিয়ে ওঠে ব্যথা। দিনের শুরুয়াতে শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে

ট্রেইল কম্পাউন্ডের চেনা লামা অথেলো

কমপ্লেইন করাটা ট্র্যাকিংয়ে শাস্ত্র-বিরোধী। সুতরাং অনিচ্ছায় উঠে পড়ে গ্রেইসকে হ্যান্ডঅভার করি চা। সৌজন্যবশত সে বলে, 'ইউ ক্যান গো ব্যাক টু ইয়োর সুইট ড্রিম..রক।'

আড়মোড়া ভাঙি আমি, 'আই ডু হ্যাভ টু মুভ আরাউন্ড অ্যা বিট.. শরীরের পেশিগুলো কি রকম স্টিফ হয়ে আছে,' বলে উঠে দাঁড়াই।

ট্র্যাকিং স্যুট পরে বেরিয়ে আসি তাঁবুর বাইরে। বেশ দূরে স্টোভে জল গরম করছেন একজন পোর্টার। দুটি বোল্ডারে বসে কেভিন ও গ্রেইস। হাত নেড়ে বলি, 'গোয়িং ফর অ্যা স্মল ওয়ার্ম-আপ ওয়াক।'

পুরো সাইটটি ঘিরে আছে অর্ধচন্দ্রাকৃতির পাহাড়ে। অল্প-সল্প ঝোপঝাড়ে আচ্ছন্ন রিজ বা পাহাড়ের ঢেউ খেলানো শিরদাঁড়ায় ঠোক্কর খেয়ে ধেয়ে আসছে তেজি রোদ, কিন্তু বেশি দূরে আগুয়ান হতে পারছে না, আশপাশের শিশিরভেজা মাঠ যেন চুষ-কাগজের মতো শুষে নিচ্ছে সৌররশ্মি। তাঁবুগুলোতে তৎপরতা তেমন নেই। আর্লি

ট্র্যাকাররা অলরেডি এগিয়ে যাচ্ছেন ট্রেইল ধরে। তবে ইনজুরিতে স্লো হওয়া পর্যটক, বা আমাদের মতো জনা কয়েক সিনিওর– তাঁবুতে এখনো শুয়ে গড়াচ্ছেন, বা ফ্লিচের পশমি জ্যাকেট ও উইন্ডব্রেকারে সুরক্ষিত হয়ে ক্যাম্প-চেয়ারে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছেন। পুরো ক্যাম্পসাইটটি রাউন্ড দিতে সময় তেমন লাগে না।

ঘাড় ব্যথাটা আমাকে ভোগাচ্ছে কিঞ্চিত। শরীরের স্টিফনেস কাটানোর জন্য আমি দোসরা-দফা ঘুরুন্তি লাগাই। প্রৌঢ় এক মহিলা-পর্যটক তাঁবুর সামনে পোর্টেবল-স্টোভে কফিমেকারটি বসিয়ে কুরুশকাঁটায় বুনছেন কিছু। বোল্ডারের উপর অবহেলায় পড়ে আছে, আগাথা ক্রিস্টির ডিটেকটিভ নভেল 'ডেথ অন দি নাইল।'

কাছেই বেজায় ভুড়ো-পেট এক পুরুষ প্রবল তোড়ে ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে করতে– ভেসে ওঠা শুশুকের মতো ভুসুস ভুসুস করে ফেলছেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। তাঁর তাঁবুতে বিরাট হরফে সাঁটা একটি স্টিকার, তাতে লেখা, 'নেভার মাইন্ড, আই অ্যাম অ্যা সুপার ফ্যাট গাই, ডিটারমাইন্ড টু লুজ অ্যা ফিউ এক্সট্রা পাউন্ড ইন দি ইনকা ট্রেইল।' আমাকে দেখতে পেয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের জরুরি কাজটা মুলতবি রেখে, ভারি সুন্দর করে হেসে তিনি ওয়েভ করেন। আমি মাথা ঝুঁকিয়ে বাও করে আওয়াজ দেই, 'গুড লাক জলি গুড ওল্ড চ্যাপ।' জবাবে ফের হাসিতে উপচে উঠে তাঁর মেদবহুল গণ্ডদেশের খানাখন্দ।

এবার এসে পড়ি, ক্যাম্পচেয়ার ও টেবিল পাতা বড়সড় একটি তাঁবুর সামনে। বাহারে স্পোর্টস জ্যাম্পার গায়ে দাঁড়িয়ে এক বেজায় সুপুরুষ। এক-হাতে গল্ফ-ক্লাবটি পাকড়ে তিনি বোধ করি অনুশীলন করছেন খেলার সুয়িং। কাল্পনিক এক বলকে বামহাতে হাঁকড়িয়ে, শ্বেতাঙ্গ এ ভদ্রলোক আমার দিকে তাকান। চোখ কুঁচকে আমুদে গলায় বিদ্রূপও করেন,'গুডমর্নিং, লেট রাইজার।'

দাঁড়িয়ে পড়ি আমি। হাত মেলাতে তিনি এগিয়ে আসেন, তখনই খেয়াল করি, গ্রিক দেবতার মতো এ হ্যান্ডসাম এথলিটের ডান হাতটি অকেজো, ঝুলছে তা রোদে শুকাতে দেওয়া ফুলস্লিভ-শার্টের হাতাটির মতো।

শেইক-হ্যান্ড করে পরিচিত হই আমরা। ডাচ-পুরুষ হেঙ্ক আব্‌সপেল আদতে পেশাদার গল্ফ খেলুড়ে, হর-হামেশা কিঞ্চিত অনুশীলন না করলে তাঁর খারাপ হয় মনমেজাজ। আমাকে ইনভাইট করে বলেন, 'কাম-অন, হ্যাভ অ্যা সিট।' প্লাস্টিকের জগ থেকে পেয়ালায় গোলাপি পানীয় ঢালতে ঢালতে বলেন, 'মাই লাভলি গার্লফ্রেন্ড মেড দিস পিংক ফ্লেমিংগো ড্রিংক উইথ হোয়াইট চকোলেট, পিচ এন্ড স্ট্রবেরি পাউডার।'

চুমক দিতে দিতে আমাদের খোশগল্প জমে ওঠে। নওল-তারুণ্যে নেদারল্যান্ডস্ এর এয়ারফোর্সে জঙ্গিবিমান উড়াতেন হেঙ্ক। কিন্তু ডানহাতের নার্ভে কী একটা ত্রুটি ধরা

পড়লে বিমান বাহিনী থেকে তাঁকে আর্লি রিটায়ারমেন্ট দেওয়া হয় । পরবর্তী জীবনে তিনি বছর ছয়েক কাজ করেন, আবুধাবির এক শেখের ব্যক্তিগত বিমানের পাইলট হিসেবে। জানতে চান, 'ডু ইউ নো এনিথিং আবাউট ক্লাউড সিডিং প্রগ্রাম?'

বৃষ্টির সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য মধ্যপ্রাচ্যের একটি-দুটি দেশে, উড়োজাহাজ থেকে কিছু একটা মেঘের স্তরে স্তরে শুট করে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা আমি পত্রিকায় পড়েছি। বলি, 'আই অ্যম নট শিওর আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইদার দ্যা টেকনোলজি অর দ্যা প্রসেস।'

কৃত্রিম বৃষ্টি তৈরির প্রযুক্তিটির বিষয়-আশয় ব্যাখ্যা করেন না হেঙ্ক, তবে, আবুধাবিতে বছর-ছয়েক কাটানোর গল্পে মেতে ওঠেন। সৌদি আরব, আমিরাত ও কাতারে সরকারি উদ্যোগে ক্লাউড সিডিং প্রগ্রাম চালু হলেও আবুধাবিতে তখনো এ ধরনের কিছু ঘটেনি। তো বিত্তশালী এক শেখ বিমান কিনে, হেঙ্ককে পাইলট নিযুক্ত করে শুরু করেছিলেন ছোট্ট একটি প্রাইভেট কোম্পানি। আবুধাবির উষর মরুতে গড়ে ওঠেছে যে একটি দুটি ফলফলাদির অর্চার্ড ওখানকার আকাশে উড়ে গিয়ে হেঙ্ক শুট করতেন, 'সিলভার আয়োডাইড' নামে এক ধরনের ক্যামিকেল কম্পাউন্ড। হেঙ্কের কৃত্রিম বৃষ্টির সৃষ্টি-প্রক্রিয়া শুনে আমি, 'ইউ গাইজ মেইড সায়েন্স ফিকশন ইনটু রিয়ালিটি আপ ইন ডেজার্ট', বলে তারিফ করি।

মানুষ হিসেবে হেঙ্ক শুধু ফ্র্যাংক না সদালাপীও। জানতে পারি, ভেকেশনে সুইটজারল্যান্ডে স্কি করতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্টে তার পুরো ডানহাতটি অকেজো হয়ে পড়ে, ফলশ্রুতিতে মরুদেশে বিমান উড়ানোর চাকরিটি তিনি খোয়ান। হালফিল পেশাদারি ভাবে গল্ফ খেলেন। কখনো ক্রিমেটোরিয়াম বা মরা পোড়ানো চুল্লিতে গনগনে ফার্নেস সামলানোর কাজও তিনি করেন।

জানতে চান– মৃত্যুর পর আমার মরদেহ সৎকারের কী পরিকল্পনা? বলি, আমাদের ট্র্যাডিশনে কবরস্থ করাটাই রেওয়াজ। জবাবে ঠিক সন্তুষ্ট না হয়ে– পুড়ানোর উপকারিতা সম্পর্কে জোরালো একটি যুক্তি হাজির করেন। আমাকে নিরুত্তর দেখে উঠে পড়তে পড়তে বলেন, 'আমি তোমাকে একটি প্যাম্পফ্লেট দিচ্ছি, পড়ে দেখো– হয়তো তোমার মতো পাল্টাবে।'

চেন টেনে দরোজা খুলে হেঙ্ক প্রচারপত্র খুঁজতে ঢুকে পড়েন তাঁবুতে। চোখে পড়ে ভেতরের বিলাসবহুল আয়োজন। আন্দাজ করি, এ ধরনের প্রশস্ত তাঁবুতে বসবাসকে হালফিল শুধু 'ক্যাম্পিং' না বলে কেন উল্লেখ করা হচ্ছে 'গ্লেম্পিং' বা 'গ্ল্যামারার্স ক্যাম্পিং' অভিধায়।

মরদেহ পোড়ানোর উপকারিতা-বিষয়ক প্রচারপত্র খুঁজতে হেঙ্ক প্রচুর সময় নিচ্ছেন, একহাত-অলা গল্ফ খেলুড়ে এক সাহেবের প্ররোচনায় আমি মৃত্যু-পরবর্তী হাজার বছরের রীতি-রেওয়াজ বদলাব, সে সম্ভাবনা জিরো; সুতরাং এ বাবদে উদ্বিগ্ন না হয়ে বরং বিলাসবহুল তাঁবুর ডিটেইলস্‌গুলো খুঁটিয়ে দেখি। রংতুলিতে আঁকা বিচিত্র সব মোটিফের ভেতর, চিলির দুনিয়াজোড়া যশস্বী কবি পাবলো নেরুদার একটি কবিতার ইংরেজি তর্জমায় কয়েকটি পঙক্তি দেখতে পেয়ে বেজায় অবাক লাগে! ভাবি, টুকে নেওয়া যায় এটা নোটবুকে, 'হাউ লং ডাজ অ্যা ম্যান লিভ আফটার অল?/ ডাজ হি লিভ অ্যা থাউজেন্ড ডেইজ,/ অর অনলি ওয়ান– অ্যা উইক,/ অর সেভারেল সেঞ্চুরিজ?/ হাউ লং অ্যা ম্যান স্পেন্ড ডায়িং?..।'

লিখতে লিখতে কিঞ্চিৎ অজান্তে একটি ভাবনার প্রচ্ছন্ন কলি ফেটে ফুটে ওঠে কুঁড়ি, তবে কী আমার দিনযাপন, আমার অপ্রাপ্তি ও উপভোগ, ট্রেইল ধরে ক্রমাগত হেঁটে যাওয়া, নিত্যদিন যা ঘটছে– তাবৎ কিছু মৃত্যুকে নিশানা করে? কবিতা কিংবা মৃত্যু-বিষয়ক ভাবনাটি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বেরিয়ে আসেন হেঙ্ক।

উল্টোদিক থেকে ঝোপঝাড় ধামসিয়ে, ট্রেইল-ক্যামেরা হাতে ছুটে আসে, খানিক পৃথুলা দেহের এক নারী। সে নাটুকীয়ভঙিতে হেঙ্ককে জাপটে ধরে চুমো খেতে খেতে বলে, 'আই গট ইট হেঙ্ক, লুক অ্যাট দ্যা স্ক্রিন, আই ক্যাপচার দ্যা পিকচার অব অ্যা জাগুয়ার।'

আন্দাজ করি, আওয়ার গ্লাস শেইপের তরুণীটি হেঙ্কের শুধু বান্ধবীই না পথসঙ্গীও। বুঝতে পারি– আদিবাসীদের মতো দেখতে মেয়েটি, রাতে কোনো গাছ-বৃক্ষে পেতে রেখেছিল ট্রেইল-ক্যামেরা, যা ইনফ্রারেড টেকনোলজির মাধ্যমে ধারণ করেছে বুনো এক জাগুয়ারের ছবি।

ঘটনাটি আচানক কিছু না, ট্র্যাকাররা আকসার ট্রেইলে– রাতবিরাতে ক্যাম্পসাইটের কাছে আসা জন্তু-জানোয়ারের ছবি তুলেছে। হেঙ্ক ও কথিত নারীটি আলোকচিত্রে জাগুয়ারের ছবি ধারণ করতে পারার এক্সাইটমেন্টে মশগুল হয়ে আছেন, এ সুযোগে আমি তাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করি। আদিবাসীদের মতো দেখতে হলেও সে পেরুর কেচোয়া বা অন্য কোনো গোত্রের নারী নয়। মেয়েটিকে ভৌগোলিকভাবে কোথাও ঠিক প্লেস করতে পারি না বটে, তবে তানপুরায় প্রচ্ছন্ন সুরলহরীর মতো এ নিতম্বিনীর দেহে নিথর হয়ে থাকা যৌবনের বিষয়ে সচেতন ওঠি; আর প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করে ভাটির দিকে গড়িয়ে যাওয়া হেঙ্কের বয়সের কথা বিবেচনা করে ভাবি, ওয়াও, হি ইজ অ্যা পিওর লাকি ডাক।

হঠাৎ করে আমার উপস্থিতিতে সচেতন হয়ে মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ায়, বলে, 'হু ইজ দিস?' আমি জবাব দেওয়ার কোনো সুযোগ পাই না, সে প্রশ্নবোধকভাবে মন্তব্য করে,

‘তুমি নিশ্চয়ই লাতিন আমেরিকার কোন দেশের আদিবাসী?’ উত্তর দেই,‘ নট রিয়েলি মিস, আদিবাসী আমি নই, আমাকে বরং বলা চলে অভিবাসী।’

চটজলদি প্রতিক্রিয়া জানায় সে,‘আই ডোন্ট রিয়েলি কেয়ার হু ইউ আর, ইউ লুক ভেরি ফ্রেন্ডলি, কাম অন অভার এন্ড সি দ্যা জাগুয়ার।’

ট্রেইল-ক্যামেরার স্ক্রিনে আমি নিরিখ করে তাকাই, জাগুয়ার বা পুমা আমাদের বাঘের মতো হিংস্র ও মাংশাসী। আমি রিডিং গ্লাস নিয়ে বেরোইনি, তাই একটি জানোয়ারের চলাচলের মৃদু ছায়া দেখতে পাই, সাথে সাথে শুনি, সমবেত কণ্ঠে উলুধ্বনির মতো আওয়াজ, অর্থাৎ এ ট্রেইল ক্যামেরাটি শব্দ-ধারণেও সক্ষম। মাঝরাতে এ ধরনের আওয়াজ শুনে ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠেছিলাম। জানতে চাই, ‘হু মেইড অল দিজ ইন্টারেস্টিং সাউন্ডস্?’

জবাব দেন হেঙ্ক, ‘জাগুয়ার হচ্ছে কেচোয়া গোত্রের উপাস্য, ইনকা সংস্কৃতিতে হিংস্র কোনো জাগুয়ার লোকালয়ে এসে পড়লেও তাকে শিকারের কোনো সুযোগ নেই। তো কেচোয়া পোর্টাররা এক ধরনের বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে উলুধ্বনির মতো শব্দ করে সচরাচর জাগুয়ারদের তাড়ায়।’ বলি,‘আই মাস্ট সি দ্যা মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট।’

উঠে পড়তে পড়তে হেঙ্ক বলেন, ‘লুক, মাই সুইটহার্ট জাস্ট ক্যাপচার দ্য পিকচার অব অ্যা জাগুয়ার, উই মাস্ট সেলিব্রেট।’ তিনি শিশি-বোতল খুঁজতে তাঁবুতে ঢুকেন। এ সুযোগে ক্যামেরার স্ক্রিন স্ক্রল করা নারীটিকে ফের নিরিখ করার সুযোগ পাই। তার বাহুতে আর্মবেন্ডের মতো পরা জোড়া ব্রেসলেট থেকে আভা ছড়াচ্ছে, ব্রিলিয়েন্ট দুটি গ্রীন জেমস্টোন। আন্দাজে ঢিল ছুড়ি, ‘ইউ আর ওয়ারিং টু ফাইন কাওয়াকাওয়া জেমস্টোনস্ ইন ইয়োর ব্রেসলেটস্, ইউ মাস্ট বি ফ্রম নিউজিল্যান্ড মিস।’

গ্রীবা বাঁকিয়ে সে বলে, ‘ইউ আর ভেরি গুড– মাইট। ইয়েস, আই অ্যাম আনাহেরো আতারাংগি, মাওরি গার্ল.. ইউ নো.. অবকোর্স ফ্রম নিউজিল্যান্ড। আই হ্যাভ অ্যা কোয়েশ্চন ফর ইউ.. ক্যান ইউ আইডেনটিফাই দ্যা ফাইন গ্রীন রক অব মাই নেকনেস।’

এ পাথরটিও তীব্র সবুজ, তবে মধ্যিখানে– থেকে থেকে ঝিলিক পড়ছে শ্বেতকরবীর শুভ্র আভা। শনাক্ত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হই, বলি, ‘আই অ্যাম টোটালি লস্ট, হেল্প মি হিয়ার, আনাহারি..।’

মৃদু হেসে সে জানায়,‘দিস জেমস্টেন ইজ কল্ড কাহুরাংগি পুনামু.. ইট ইজ নট অনলি রেয়ার বাট ভেরি এক্সপেনসিভ অ্যাজওয়েল।’

ধর্মযাত্রার শান্তিমিছিলে শ্রমণ মহা গোসানন্দ

ছোট্ট একটি বোতল ও শটগ্লাস নিয়ে বেরিয়ে আসেন হেঙ্ক। আমাদের কথাবার্তায় শামিল হয়ে তিনি মন্তব্য করেন, 'ইট কস্ট অ্যা ফরচুন ফর মি টু বাই দিস কাহ্নরাংগি, জাস্ট টু ইমপ্রেস দিস সুপার-সেক্সি মাওরি গার্ল।'

কুলারের বরফ গলে যাওয়াতে রক্তের মতো তপ্ত হয়ে আছে শ্যাম্পেন, সুতরাং হেঙ্ক খুঁজেপেতে নিয়ে এসেছেন সিনেমন ফ্লেভারের এক বোতল শ্নাফ। শট নিয়ে উঠে পড়ে আনাহারি আমাকে ইনভাইট করে, 'আই অ্যাম ফিক্সিং সাম বেকন এন্ড এগস্, আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করে যাও।'

এদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ বাতচিত হলো, এবার ফিরতে হয় নিজেদের ক্যাম্পিংলটে, তাই বলি, 'নো, থ্যাংক-ইউ গাইজ, আই মাস্ট বি গেট গোয়িং।'

নির্লিপ্তভাবে হেঙ্ক বলেন, 'ওকে দেন, সি ইউ অ্যারাউন্ড।' আনাহারি এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রেখে বলে, 'উই মাস্ট বি সিয়িং ইউ অ্যাগেইন.. গুড ডে মাইট।'

মহার্ঘ পাথরগুলোর সবুজাভ দ্যুতি চোখে মেখে, দিব্যি খোশমেজাজে হাঁটছিলাম আমাদের ক্যাম্পিংলটের দিকে। পথে দাঁড়িয়ে গ্রেইস, তার চোখমুখে খেলছে নির্দিষ্ট

ফুলটি খুঁজে না পাওয়া প্রজাপতির চঞ্চলতা, কাঁধ থেকে ঝুলছে বাইনোকুলারও, ঘটনা কী?

'কামঅন রক, লেটস গো ফর অ্যা লিটিল নেচার ওয়াক,' গ্রেইসের কণ্ঠস্বরে অনুনয় মিশ্রিত অনুরোধের স্বরটি যতোটা না খুশি করে, তার চেয়ে ঢের বেশি সতর্ক করে তুলে আমাকে। 'হোয়াটস্ আপ গ্রেইস? তোমার তো এ সময় মেডিটেইট করার কথা, আর ইউ ইন্টারেস্টেড্ টু ডু অ্যা ওয়াকিং মেডিটেশন উইথ মি?'

অসংলগ্ন দু-তিনটি বাক্যে সে জানায়, উইলিয়ম অলরেডি এক পোর্টারকে গাইড ধরে বেরিয়ে পড়েছেন বার্ড ওয়াচিংয়ে। আজ আমাদের লেট-স্টার্ট, এগারোটার আগে কেউ ট্রেইলে নামছে না। সুতরাং নেচার-ওয়াকে আপত্তি কোথায়? তো গ্রেইস সময় নষ্ট না করে, আমার টেন্টে ঢুকে অলরেডি শুধু বাইনোকুলারটি পিক করেনি, পাখি শনাক্তকরণের ছবিওয়ালা প্যাম্ফলেটও তুলে নিয়েছে, নেচার-ওয়াকে আমার মতি না হলে, 'উই কুড ওয়াচ অ্যা ফিউ বার্ডস্, রক।'

এ অত্রাফে পাখির কোনো আক্রা পড়েনি, 'অবকোর্স উই মাইট লুক অ্যারাউন্ড এন্ড ফাইন্ড সাম ইন্টারেস্টিং বার্ডস্, কিন্তু এক পেয়ালা চা না হলে যে নয়।'

তপ্ত চা-য়ে টইটুম্বুর ট্র্যাভেলিং টাম্বলারটি সে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে, পার্স থেকে বের করে, ন্যাপকিনে মোড়া দু'খানা ড্রাই-কেইক। আমি চায়ে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করি, 'হাউ আবাউট কেভিন, হোয়াট ইজ হি আপ টু?' কোনো জবাব না দিয়ে সে চোখ তুলে তাকায়, তার গ্রীবা প্যাঁচিয়ে পরা স্কার্ফ থেকে ছড়াচ্ছে, রীতিমতো জুয়েল টোউনস্ বা এমারল্ড-গ্রীন, এমেথিস্ট-পার্পোল ও স্যাফায়ার-ব্লু'র মিশ্রিত আভা; বর্ণীল বিভ্রমে বিমুগ্ধ হতে আমার সময় লাগে না বিশেষ।

ততক্ষণে আমরা এসে পড়েছি আমাদের ক্যাম্পিংসাইটে। চুল্লির পাশে এয়ার-মেট্রেসে শুয়ে আমাদের সবচেয়ে বয়স্ক পোর্টার আতুচি আকিপুমা। স্যান্ডেল-পায়ে ট্র্যাক করার ফলশ্রুতিতে তাঁর পদতল ফেটে বেরুচ্ছে রক্ত। কেভিন উবু হয়ে বসে অ্যালকোহলে চুবানো তুলা দিয়ে পরিষ্কার করছেন, ডাক্তারি-ব্যাগটির পাশে পড়ে আছে স্টেথোসস্কোপ ও ব্যান্ডেজের সাজসরঞ্জাম।

ক্যাম্পিংগ্রাউন্ড থেকে বেরিয়ে আসার পথে দেখি, রকওয়ালের তলায় বসে দুই ফেরিওয়ালি বিক্রি করছেন, ফ্রুটিইডা বা স্ট্রোবেরি-ড্রিংকস্। পরিশ্রমী পোর্টারদের কথা ভেবে আমি পুরো বালতি-ভর্তি পানীয় খরিদ করি। একজন মহিলা-বিক্রেতা বোঁচকাটি খুলে ডজন-খানেক ডিম দেখান। গেল রাতে পোর্টারদের সঙ্গে আসা ট্যুর কোম্পানির কুক গ্রীল করেছিলেন, রেইবো ট্রাউট নামে ঝরনাজলে সাঁতরিয়ে বড় হওয়া মাছ। ইয়েলো-রাইসের সঙ্গে সুস্বাদু আমিষের ভোজটি বেশ জমেছিল, কিন্তু

গ্রেইস সম্পূর্ণ ভেজিটোরিয়ান, সে রাত কাটিয়েছে শুধু আভাকাডোর স্যালাদ খেয়ে। প্রোটিন ছাড়া পায়ে হেঁটে দীর্ঘ যাত্রা ঝুঁকিপূর্ণ, তাই আমি ডিমের পুরো বোঁচকাটি কিনে নেই। খুশি হয়ে বিক্রেতা দুই মহিলা জানান, গাইড এলিয়াসিন ও পোর্টার সর্দারের সঙ্গে তাদের চেনাজানা আছে, কোনো সমস্যা নেই, পানীয় ও আন্ডা দুইই তারা এখনই পৌঁছে দিচ্ছেন ক্যাম্পসাইটে।

রক-ওয়ালের ওপাশে নেমে আসতেই চোখে পড়ে, হাল্কা ঝোপঝাড়ে সমাচ্ছন্ন ক্লাউড ফরেস্টের রূপরেখা। কোনো পাখপাখালি দেখতে পাই না বটে, তবে কলকাকলিতে মন ভরে ওঠে। খেয়াল করি, খানিক দূরের নিঃসঙ্গ বৃক্ষে কষে বাঁধা একটি ট্রেইল-ক্যামেরা। ভাবি, এ ধরনের একটি যন্তর জোগাড় করতে পারলে ট্র্যাকিংয়ে উপভোগটা জমজমাট হতো।

হাঁটতে হাঁটতে গ্রেইস মন্তব্য করে, 'আমি তোমাকে ক্লিমটের একটি ছবির প্রিন্ট উপহার দিয়েছিলাম, ইউ প্রবেবলি ডোন্ট রিমেম্বার, রক?'

নমপেনের ঘটনাটি স্মরণ করতে আমার মিনিট কয়েক লাগে। গোন্ডিয়ানা হোটেলের লবিতে বসে আমি অপেক্ষা করছিলাম, আমাকে পিক করতে অফিসের গাড়িটি আসতে দেরি হচ্ছিল। টেলিফোনে গ্রেইস, হাতে সময় থাকলে সে আমাকে ইন্টানেশন্যাল স্কুলে যেতে বলে। আমি লাঞ্চে বেরুচ্ছি জানতে পেরে আব্দারের সুরে বলেছিল, 'পিক সাম ম্যাজিক পিৎসা অন ইয়োর ওয়ে..স্কুলে আজ ছুটি, এক সাথে লাঞ্চ সারা যাবে।'

কেনোবিসের মিশেল দেওয়া ম্যাজিক পিৎসা নিয়ে তার স্কুলে যাই। ভেবেছিলাম, বয়স্কশিক্ষার যে বইটি নিয়ে কাজ করছি– তার ইলাসট্রেশনগুলো সে দেখাবে। কিন্তু সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র গ্রেইস এগিয়ে দিয়েছিল, অস্ট্রিয়ার প্রতীকবাদী চিত্রকর গুস্তাব ক্লিম্‌ট (১৮৬২- ১৯১৮) এর 'কিস্‌' শিরোনামের একটি তৈলচিত্রের প্রতিলিপি। তখন অব্দি এ চিত্রকরের কোনো কাজ দূরে থাক, অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমি কিছু জানতাম না।

আর্ট-টিচার গ্রেইস নীরবে ম্যাগনেফায়িং গ্লাসটি বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, 'প্লিজ পে এটেনশন টু দিস পেইনটিং.. এন্ড টেল মি হোয়াট ইউ অবজার্ভ।'

লিপ-লকড্ দুটি নারী-পুরুষের পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে চুমোর দৃশ্যপট থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্লাটিনামের প্রলেপ দেওয়া আভা। আমার মুগ্ধতা আঁচ করতে পেরে সে মৃদুস্বরে বলেছিল, 'প্রাইমারি সাবজেক্ট অব পেইন্টার ক্লিম্‌ট ওয়াজ ফিমেইল বডি।' এও জেনেছিলাম যে, চিত্রকর তাঁর ফ্যাশন ডিজাইনার বান্ধবী এমিল ক্লজের শরীরকে মডেল করে এঁকেছিলেন এ চিত্রটি।

গতকাল আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাই-এলিভেশনের আলপাইন টাইপ উষর মাউন্টেনস্কেপ চিরে হেঁটেছি। আজ ফের নেমে এসেছি, ক্লাউড ফরেস্টের সবুজিম

পরিসরে। নিসর্গপটের এ পরিবর্তন আমাকে খানিক বিভ্রান্ত করে বটে, তবে এদিককার বৃক্ষলতার বিন্যাস সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠি বিগতভাবে।

পাশে কী এক ঘোরে– সান্নিধ্যের নীরব সম্মোহন ছড়িয়ে হাঁটছে গ্রেইস। দেখা পাই– ভারি বাচাল প্রকৃতির বেশ কতগুলো প্যারাকিট পাখির। আন্দিয়ান এ মুনিয়াগুলো ঝোপঝাড়ে লুকোচুরি খেলছে। দাঁড়িয়ে পড়ে ইশারায় গ্রেইস দূরের একটি বিরাট পাথর দেখায়; তাতে বসে তিনটি মথ– পাখনায় রূপালি বৃত্ত ঝলসিয়ে কেবল ডানা খুলছে আর বন্ধ করছে। জানতে চাই, এ দৃশ্য-সুষমা থেকে বেশি দূরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে কি?' রেসপন্স করে গ্রেইস, 'লেটস্ সিট হিয়ার অ্যা বিট।'

ট্রেইলের পাশে বোল্ডালে হেলান দিয়ে বসে পড়ে সে। কাছাকাছি আয়েশ করে বসে বলি, 'আই ডু রিমেমবার কোয়াট অ্যা বিট আবাউট ইউ গিভিং মি অ্যা প্রিন্ট অব ক্লিম্টস্ পেইন্টিং কল্ড কিস?'

কিছু না বলে সে তুলে নেয় বাইনোকুলারটি। আমার স্মৃতিতে চুম্বনরত নারী-পুরুষের যুগল চিত্রটি, তার তাবৎ রহস্য ও রূপসুষমা নিয়ে অনেক অনেক বছর পর ফিরে আসে। ক্লিম্টের এ দৃষ্টিনন্দন শিল্পকীর্তি যদিও আমাকে মুগ্ধ করেছিল দারুণভাবে, কিন্তু কাজটিকে আমি ভেবেছিলাম, নারী-পুরুষের দৈহিক অন্তরঙ্গতার অধিক রহস্যময় এক প্রতীক রূপে। আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিলাম, পিরামিডে মমি সংরক্ষণের পাথুরে সিন্দুকের ঢালায় অঙ্কিত চিত্রের মতো একই শেইপের কম্পোজিশনের দিকে, আর আমার মন ভরে ওঠেছিল মরমী এক সংবেদনে।

আমার মুগ্ধতা আঁচ করতে পেরে গ্রেইস বলেছিল, 'আই হ্যাভ অ্যা হৌল বুক ফুল অব ক্লিম্টস্ পেইন্টিং। বইটা তোমাকে দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার ডিসফাংশন্যাল হাজবেন্ড মার্ক ফের ঘাপলা পাকাল, যখন খুব স্ট্রেসে পড়ি তখন ক্লিম্টের চিত্রগুলো বারবার ঘাটতে ইচ্ছা হয় যে।'

কথা শেষ করতে পারেনি সেদিন গ্রেইস, প্রিন্সিপালের অফিস থেকে এক স্কুলকর্মী ছুটে এসে জানিয়েছিল, তার আর্জেন্ট ফোনকল এসেছে।

ইন্টারনেশন্যাল স্কুলের আর্টস্ এন্ড ক্রাফ্টসের কামরায় আমি একা বসেছিলাম। মিনিট কয়েক পর বেজায় আপসেট হয়ে ফিরে গ্রেইস। 'ইটস্ মাই হাজবেন্ড মার্ক.. মেকিং ট্রাবোল এগেইন,' বলে সে কান্না সামলানোর চেষ্টা করে। বাড়িওয়ালা তিন-মাসের বকেয়া বাসা-ভাড়া চেয়ে তাকে রিং করেছে। প্রতিমাসে মার্ক ভাড়া দেওয়ার কথা বলে তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে..। কিছু দিন আগে সে সেকেন্ডহ্যান্ড একটি পানটুন বোটও কিনেছে। দুয়ে দুয়ে চার মেলায় গ্রেইস, অর্থাৎ বাসা-ভাড়া বাকি রেখে সে শৌখিন বোটটি কিনেছে।

তার পারিবারিক সংকট সম্পর্কে বিস্তারিত শুনি আমি, কিন্তু মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি। দ্রুত সামলে নেয় গ্রেইস, বলে,'আই ডোন্ট ওয়ানা স্পয়েল ইয়োর আফটারনুন উইথ মাই পার্সোনাল ট্রাবোল.. লাইফ ইজ শর্ট, লেটস্ এনজয় দ্যা ম্যাজিক পিৎসা।'

মাইক্রোওয়েভে আমার প্রিয় পানীয় হরলিক্স করে দিয়েও সে আমাকে অবাক করেছিল! পিৎসার খামিরাতে কেনোবিসের মিশেল থাকায়, তপ্ত পানীয় চাখার আগেই আমাদের দেহমনে ছড়ায় নেশাতুর আমেজ। আমি ফের স্টাডি করি ক্লিম্‌টের চিত্রটি, তখনই সচেতন হই যে– নীরবে সে অবলোকন করছে আমাকে, আমাদের চোখাচোখি হয়, এর আগে কখনো গ্রেইসকে আই-মেকাপ নিতে দেখিনি, আমি 'নয়নিকা' শব্দটির একটি ব্যতিক্রমী অন্তমিলের কথা ভাবি।

অপরাহ্নে সিক্লো চড়ে আমরা রওয়ানা হই, নমপেন নগরীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্যাগোডা ওয়াট পন্‌ম এর দিকে। খেমার জাতিসত্তার পরিচিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এ বৌদ্ধমন্দিরটির অবস্থান টিলা-মতো কৃত্রিম এক পাহাড়ের ওপর। জোড়ায় জোড়ায় নাগ, সিংহ প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রের মূর্তিরাজি দিয়ে সাজানো, ক্রমাগত উর্ধে উঠে যাওয়া সিঁড়িতে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ। ম্যাজিক পিৎসার তাসিরে খানিক টিপসি হওয়া গ্রেইস এক ফেরিওয়ালির কাছ থেকে কিনেছিল পিঞ্জিরা-বন্দী দুটি পাখি। জোড়া খেচরকে অবমুক্ত করে আমরা বোধ করি, নমপেন-বাসের জাগতিক জিল্লতি ও ব্যক্তিগত জীবনের দারুদগ্ধ ক্লেশ থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলাম।

তুমুল মাইন্ডফুলনেস এর অনুশীলনে, এক-পা এক-পা করে উপরে দিকে উঠতে উঠতে গ্রেইস অনুরোধ করেছিল, পূজনীয় এ প্যাগোডার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতন হতে। ১৩৭২ সালে, এক খেমার রমণী নদীস্রোতে একটি কোকি বৃক্ষকে ভেসে যেতে দেখে, কী এক অন্তর্গত প্রেষণায় জেলেদের তা পাড়ে তুলতে অনুরোধ করেছিলেন। ওই ভাসমান বৃক্ষের কাণ্ড কুঁদে সুকৌশলে সংগোপন ছিল পাঁচটি মূর্তি। এ বিগ্রহগুলোর চারটি ছিল অমিতাভ গৌতমের এবং অন্যটি ছিল বিষ্ণুর। ওই দেবতাদের আরাধনায় শুধু গড়ে ওঠেনি ওয়াট পন্‌ম নামক প্যাগোডা, ওই মন্দিরকে কেন্দ্র করে সনাতন ধর্মের সংমিশ্রণে কম্বোডিয়ায় প্রচলিতও হয়েছিল তারাবাদা মার্গের বৌদ্ধ ধর্ম।

মন্দিরের বারান্দায় পূজারী পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন, শান্তির সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা, আন্তর্জাতিক পরিসরে সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রমণ মহা গোসানন্দ। যে সন্ন্যাসীকে কম্বোডিয়ার রাজা নরোদম সিহানুক সয়ং নতমস্তকে সম্বোধন করেন 'সমডেচ পারেই' বা 'মহামান্য দিব্যপুরুষ' হিসেবে, মাত্র মাস কয়েক আগে যাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রদানের জন্য নানা সূত্র থেকে মনোয়ন দেওয়া হয়েছে; তাঁকে চোখের সামনে দর্শন করে– দুরবিন ছাড়া খালি চোখে বৃহস্পতি গ্রহের চাঁদ দেখার মতো অনুভূতি হয়।

বৃক্ষে কষে বাঁধা ট্রেইল ক্যামেরা

আমাদের দেখতে পেয়ে হাত জোড় করে উঠে আসেন তিনি। থতমত খেয়ে আমি খেমার জবানে বলি, 'জম-রিপ-সোয়া' বা 'প্রণাম'। হাঁটু গেড়ে নতজানু হয়ে গ্রেইস– 'গানায় সামকোয়া ডিকুন', বলে আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীকে বৌদ্ধমন্দিরের প্রথামাফিক সম্বোধন করেছিল। শ্রমণ মহা গোসানন্দ তাঁর অশ্রুভারাক্রান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন,' লেট ইট ব্রেইক.. সহজাত ভাবে জলে পূর্ণ হলে দু-চোখ তাকে ঠেকাতে নেই.. মাই চাইল্ড।'

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গ্রেইস বলেছিল, 'আই অ্যাম ক্যারিং অ্যা বার্নিং হেল ইন মাই হার্ট.. মোস্ট রেসেপেক্টেড ওয়ান.. প্লিজ শো মি দ্যা পাথ।'

চোখ মুদে মুখমণ্ডলে গাঢ় মনযোগ ফুটিয়ে তুলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'উই অল ক্যারি হেভেন এন্ড হেল বোথ অল দ্যা টাইম ইন আওয়ার হার্ট।' মহা গোসানন্দ তাকে তাৎক্ষণিকভাবে তিরিশ মিনিটের মতো– ওয়াট পন্‌ম এর চাতালে ওয়াকিং মেডিটেশন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশনা ছিল, প্রতি-পদক্ষেপে গ্রেইস যেন দূষিত ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার কথা ভাবে এবং কল্পনা করে, তার প্রশ্বাসের

তৈরি হচ্ছে শ্বেত-শুভ্র অমল ধবল মেঘ। সিঁড়ি পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে শ্রমণ ফের বলেছিলেন,‘ দিস ওয়ে ইয়োর হার্ট উইল ট্রান্সফর্ম পয়জন ইনটু মেডিসিন।’

‘ইউ সিমস্ লস্ট ইন থট.. ডু ইউ নট সি এনিথিং?’ গ্রেইসের প্রশ্নে, নমপেনের স্মৃতি ভারাক্রান্ত স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে নিমেষে ফিরে আসি– ইনকা ট্রেইলের বাস্তবে। তাকাই সামনে–খাদ থেকে কয়েকটি লতা সর্পিলভাবে পাথর জড়িয়ে পর্বতারোহীর মতো নিষ্ঠায় চেষ্টা করছে উপরে উঠে আসার। কোথায় যেন ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে জল, বোল্ডারে বসে থাকা মথ তিনটির উপে গেছে দখিনা হাওয়ায়। কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছু দেখতে না পেয়ে প্রকাশ করি হতাশা, ‘নো, আই ডোন্ট সি অ্যা ড্যাম থিং বিসাইড দিস সোরিন মাউন্টেনস্কেপ।’

বিদ্রূপ ঝরে পড়ে গ্রেইসের কণ্ঠস্বরে, ‘দেয়ার আর অলওয়েজ ফ্লাওয়ার্স ফর দোজ হু ওয়ান্ট টু সি দেম।’

ডানায় বাতাস কাটার মিহি স্বরে চমক দিয়ে ওঠে মন, আমাদের চোখের সামনে উড়ে আসে, ‘শাইনিং সানবিম’ নামে বর্ণাঢ্য একটি হার্মিংবার্ড, তার ডানা থেকে ঝিলিক পাড়ে নীলাভ-সবুজে গোলাপির বিচ্ছুরণ। মেঘভাঙা সোনালি দ্যুতি এসে পড়ে তার ডানায়, কিন্তু সদাঞ্চল খেচরটি বোধ করি পতঙ্গের সন্ধানে উড়ে যায়– দিগন্তে আবছা হয়ে ফুটে ওঠা এক সারি পর্বতের দিকে।

ঘাড় ফেরাতে সমস্যা হচ্ছিল আমার, বিষয়টা আঁচ করতে পেরে গ্রেইস, ‘এক্সিপিরিয়েন্সিং এনি পেইন’, বলে কাঁধে হাত রাখে। প্রেসার পয়েন্টে চাপ পড়তেই ঢিলের আঘাতে ছিটকে যাওয়া ব্যাঙাচিদের মতো চতুরদিকে ছড়িয়ে যায়– জমাট-বাঁধা বেদনার অণু-পরমাণু। সংবাহনের আন্তরিক উষ্ণতা আমি অনুভব করি, কিন্তু খুব কাছাকাছি হতে মন থেকে সায় পাই না।

গ্রেইস মন্তব্য করে, ‘ইয়োর নেক এন্ড শোল্ডার অল আর ভেরি স্টিফ, লেটস্ গেট আপ এন্ড ওয়াক অ্যা বিট।’ সে রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘উই হ্যাভ আবাউট ফোর্টি মোর মিনিট.. নো রাশ।’

হাঁটতে হাঁটতে আমি গিরিখাদের ধাপে ধাপে– রোদের ঝলমলে উপস্থিতির তলায় ফুটে ওঠা ছায়ার নকশাগুলো স্টাডি করি। এক জায়গায়, পাথরের ডিপ্রেশনে শিশিরের জল জমে তৈরি হয়েছে রীতিমতো এক রক-পুল; তাতে দফায় দফায় উড়ে এসে পালা করে পানি খাচ্ছে, আন্দিয়ান প্রজাতির গঙ্গাফড়িং।

আমার গতি শ্লথ হতেই দাঁড়িয়ে পড়ে গ্রেইস। ছায়ানিবিড় পরিসরে অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন শিশিরবিন্দু তৈরি করেছে তারকামণ্ডলের আকৃতি। একটু নিরিখ করে তাকাতেই আবিষ্কার করি– কাছেপিঠে আরেকটি শিশিরের নকশা– যা আমাকে বলশয় থিয়েটারে

নৃত্যরতা বিখ্যাত এক ব্যালেরিনার রেখাচিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। বলি, 'লুক হাউ নেচার ইজ মেকিং আওয়ার ডে।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গ্রেইস রেসপন্স করে, 'ইয়েস, দিস ইজ অ্যা ক্লিয়ার ইন্ডিকেটার অব আপকামিং চেঞ্জ, বদলে যাবে খোল নলচেশুদ্ধ সব কিছু।'

ঠিক বুঝতে পারি না, তাই প্রশ্ন করি, 'কী বদলাবে গ্রেইস?' সে একটু হেলে– অংগুলি ইশারায় ঈশান কোণের দিকে তাকাতে বলে। দেখি– সবুজ ঘাসে পড়ে আছে জ্বালানিরিক্ত ধূমকেতুর কংকালের মতো সুদীর্ঘ একটি সাপের খোলস।

গ্রেইস ফের মন্তব্য করে, 'নাথিং ইজ গোয়িং টু বি দ্যা সেইম অ্যাজ ইট ইউজড্ টু বি।' দিনযাপনের কায়দাকানুন তো বদলাচ্ছে হরহামেশা, এবারও যে ঘরে ফিরে দেখতে পাবো, আঙিনায় প্রত্যাশিত ফুলগুলো ঝরে গিয়ে ঝোপঝাড় হয়ে উঠেছে নিষ্পত্র, এ নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তাই পেছনে ফেলে সর্পখোলস– আমরা ফের আগ বাড়ি।

গ্রেইসের ফের নীরবতা আমার মনলোকে ফিরিয়ে আনে, নমপেনে ওয়াট পন্‌মের দিব্য আভায় ভরপুর এক অপরাহ্ণের ছায়াচিত্র। মন্দিরের সিঁড়ির তলায়– শতবছর আগে আঙিনা-জুড়ে যেখানে ছিল সূর্যঘড়ির নকশা, এবং পরবর্তীতে যে স্পটে ফরাসি ঔপনিবেশিকদের অনুদানে তৈরি হয়েছিল বিরাট একটি গোলাকার ঘড়ি; ঠিক ওই জায়গায় এসে গ্রেইস চক্রাকারের ঘুরতে ঘুরতে শুরু করেছিল ওয়াকিং মেডিটেশনের অনুশীলন। তাকে নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতা দেওয়ার প্রয়াসে সরে এসেছিলাম স্পিরিট হাউসের কাছে; তখনও আমার দেহমনে আতরের গন্ধের মতো লেগেছিল দিব্য এক সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যের সম্মোহনী আবেশ।

১৯৯২ সালে, শ্রমণ মহা গোসানন্দের উদ্যাগে, কম্বোডিয়ায় আয়োজিত ধর্মযাত্রা বা যুদ্ধবিরোধী শান্তিমিছিলে শরীক হয়ে তাঁকে মাত্র এক ঝলক চাক্ষুষ করেছিলাম। আজ তারাবাদা মার্গের শ্রমণ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সাঙ্ঘারাজা' হিসেবে সন্মানিত সন্ন্যাসীকে কাছ থেকে দেখতে পেয়ে– কীভাবে এ স্মৃতিকে সংরক্ষণ করা যায়, তা নিয়ে ভাবি। আমার স্মৃতিতর্পণে ফিরে আসে, যুদ্ধে সমাজ-সংসার ছত্রখান হওয়া কম্বোডিয়ার প্রেক্ষাপট। ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষ দিকে, যুক্তরাষ্ট্রের 'কার্পেট বম্বিং' এর কারণে, কম্বোডিয়ায় নিহত হয়েছিল প্রায় দেড়লাখের মতো নিরীহ মানুষ। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ সাল অব্দি রাষ্ট্র-ক্ষমতায় ছিল, খেমাররুজ নামে অত্যন্ত উগ্রপন্থী কমিউনিস্ট সরকার। তাদের দুঃশাসনে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিল, ১৫ মতান্তরে ২০ লাখের মতো মানব সন্তান।

ওই সবের প্রতিবাদে শ্রমণ মহা গোসানন্দের নেতৃত্বে আয়োজিত হয়েছিল, ধর্মযাত্রা নামে যুদ্ধবিরোধী শান্তিমিছিলের। পাঁচ শত বৌদ্ধ-ভিক্ষু উপবাস ব্রত পালনের ভেতর দিয়ে, থাই-সীমান্ত থেকে তিরিশ দিন পায়ে হেঁটে এসে পৌঁছেছিলেন নমপেনে। তাঁদের সঙ্গে শামিল হয়েছিল, বাস্তহারা শরণার্থী ও যুদ্ধে বিকলাঙ্গ হওয়া শত শত মানুষ। মিছিলে শেষ প্রান্তে, ব্লোআপ করা একটি করোটির ছবি দিয়ে তৈরি পোস্টার হাতে হাঁটছিল গ্রেইস।

ততক্ষণে চলে এসেছি মন্দির-টিলার প্রান্তিকে। এখান থেকে– মেকং, বাসাক, তনলা-ছাপ ও একটি নাম না জানা শাখানদীর সন্মিলনে সৃষ্ট হয়েছে যে 'চাতোমুক' বা স্রোত-সংগম, তা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আমি চূর্ণিত জলের দিকে তাকিয়েছিলাম, উপদ্রুত গ্রেইস, সমস্যা-প্রবণ মার্ক ও তারাবাদা মার্গের মেডিটেশন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে যে অলীক এক ত্রিভুজ, তার কোনো বিন্দুতেই আমার উপস্থিতি খুঁজে না পেয়ে ব্যথিতও হয়েছিলাম বিপুলভাবে।

'হোয়াই ইউ আর নট পেয়িং এটেনশন টু এনিথিং টুডে,' বলে অনুযোগ করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়ে গ্রেইস। তার দিগন্তের দিকে নিশানা করা দৃষ্টিকে অনুসরণ করে তাকাই। গিরিখাদ ধরে মসলিনের সুচারু আলোয়ানের মতো ভেসে যায় যায় সাদাটে ধূসর মেঘ। মেঘাচ্ছন্ন আবরণ সরে যেতেই ঝলমলিয়ে ওঠে রোদ। দেখি– মরা এক ডালে বসে দুটি দীর্ঘ-চঞ্চু টুক্যান পাখি। আমার ভেতরে উৎসাহের বারুদ বিস্ফোরিত হচ্ছে না দেখে নিজেই অবাক হই!

ফের হাঁটি। গ্রেইস জানতে চায়, 'হোয়াই আর ইউ সো উইথড্রোন, হোয়াটস্ রং?'

মুখ দিয়ে নিজের অজান্তে বেরিয়ে যায়,'আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিগ সোরোজ আউট অব মাই হার্ট।' 'হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে' আমার অনীহায় একটু অপ্রস্তত হয়ে গ্রেইস মন্তব্য করে,'আন্ট সোরোজ পার্ট অব আস? বেদনা তো আমাদের সত্তার অংশবিশেষ, একে অস্বীকার না করে ফেইস করলে হয় না, রক।'

তার মন্তব্যে রেসপন্স করা থেকে আমি বিরত থাকি। ফেরার পথে দেখি– ট্রেইলে একাকী দাঁড়িয়ে আছে ক্যাম্পসাইটের চেনা লামা। গ্রেইস তাকে 'অথেলো' সম্বোধন করে ডাকে, 'কামঅন সুইট অথেলো, লেটস্ গো ব্যাক টু ক্যাম্পগ্রাউন্ড টুগেদার।'

লামাটি নির্লিপ্ত চোখে তাকায়। জানতে পারি, অথেলোর জোড়ের নাম ডেসডিমোনা, প্রত্ন-সাইটে খোঁড়াখুড়ি করতে এসে, শেক্সপিয়ারের পাঁড়-পাঠক এক ইংরেজ আর্কিওলজিস্ট নাকি এ লামা-দম্পতির নামকরণ করেছেন– অথেলো ও ডেসডিমোনা। এ তথ্যে আমি আমোদ পাই, কিন্তু কেন জানি ফিরে আসে না আর আগের মতো সহজিয়া রিদম।

চীনের নিষিদ্ধ নগরী

মাসরুর-উর-রহমান আবীর

কয়েকদিন ধরে চীনের অলিগলিতে ঘুরছি। কাজের ফাঁকে প্রতিদিন বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করি আধুনিক বেইজিংয়ের ফাঁকে-ফোকরে সযত্নে সংরক্ষিত প্রাচীন চীনকে ছুঁয়ে দিতে।

মনে অনেক সাধ কিংবদন্তিসম এক প্রাসাদ চত্বরে পদচারণার, কিন্তু কোনো উপায়ই খুঁজে পাচ্ছি না। নিষিদ্ধ নগরীর প্রবেশাধিকার আমার জন্য নিষিদ্ধই রয়ে যাচ্ছে।

চীনে পৌঁছার পর থেকেই নানান জায়গায় ঘুরছি। কোথাও নির্ঝঞ্ঝাটে প্রবেশ করা যায়, কোথাও ঢুকতে প্রবেশপথে টিকিট কেটে নিতে হয়, কোনো জায়গার জন্য টিকিট কাটতে হয় অনলাইনে, কিছু কিছু জায়গার জন্য টিকিট সংগ্রহ করতে হয় কয়েকদিন আগেই। এসব সব নিয়ম মেনেই বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি। কিন্তু ফরবিডেন সিটিতে ঢোকার কোনো উপায় পাচ্ছি না।

অবশেষে ফরবিডেন সিটির অভ্যন্তরে

চীনের প্রায় সব কাজকর্ম ওদের নিজস্ব অ্যাপ উইচ্যাট দিয়ে করতে হয়। সেই অ্যাপে ফরবিডেন সিটি ভ্রমণের জন্য আলাদা মিনি প্রোগ্রাম আছে। সেখানে রেজিস্ট্রেশন করে প্রতিদিন কয়েকবার করে চেক করেও টিকিট পাচ্ছি না। দিনে-রাতের যে সময়েই ঢুকি না কেন, টিকিট নেই টিকিট নেই। তবে কি ওই অত্যাধুনিক দেশেও জনপ্রিয় পর্যটন-স্থলের টিকিট নিয়ে কালোবাজারি হয়? অবশেষে বাধ্য হয়ে আমাদের সফরের স্থানীয় আয়োজকদের অনুরোধ করা হলো আমাদের ফরবিডেন সিটি দেখানোর ব্যবস্থা করতে। তারাই আয়োজন করলেন শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু এই নগরী নিষিদ্ধ কেন?

২

চীন দেশে আনুষ্ঠানিক রাজশাসনের সূচনা হয় ২০৭০ খিস্টপূর্বাব্দে। সেই থেকে একের পর এক রাজবংশ শাসন করতে থাকে বৃহৎ চীনের রাজ্যপাট।

মিং সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট ছিলেন হংইয়ু। তিনি ১৩৬৮ সালে এই মহান মিং সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তার বড়ো ছেলের নাম ঝু বাও আর তৃতীয় ছেলে ঝু দি। ঝু বাও তার বাবা সম্রাট থাকা অবস্থাতেই মারা যান, তাই পরবর্তী ক্রাউন প্রিন্স নির্ধারণে একটু ঝামেলা হয়ে যায়। তবে সম্রাট তার নাতি মানে ঝু বাওয়ের ছেলে ঝু ইয়ুনওয়েনকে বাছাই করেন এবং তিনি বড়ো হয়ে জিয়ান ওয়েন নামে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাট হন।

প্রথম সম্রাটের তৃতীয় ছেলে ঝু দি তখন বেইপিং নামের এলাকায় প্রিন্স অব ইয়ান নামে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি মনে করলেন যে ভাতিজা সম্রাট হওয়ার পর থেকে চাচাদের যোগ্য সম্মান দিচ্ছেন না, এবং তাদের ক্ষমতাও কমিয়েও দিচ্ছেন। বিদ্রোহ করলেন তিনি। অনুগত বাহিনী নিয়ে ছুটে গেলেন তখনকার রাজধানী নানজিং পর্যন্ত। পরাজিত করলেন সম্রাটকে, আর ১৪০২ সালে মিং সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট ইয়ংলে হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

ইয়ংলে রাজধানী নানজিং থেকে সরিয়ে নিয়ে আসেন তার পুরানো জায়গা বেইপিংয়ে। এই জায়গাটাকেই আমরা এখন বেইজিং হিসেবে চিনি।

ইয়ংলে চীনের উত্তর ও পূর্ব দিক জুড়ে হাজার হাজার মাইল লম্বা গ্র্যান্ড ক্যানেল নামের খাল খনন করে যোগাযোগ ও পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর আর ভারত মহাসাগরে জাহাজ পাঠিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারত আর মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে যোগাযোগ ও বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। এরকম বিভিন্ন কাজের জন্য মহাশক্তি হিসেবে চীনের উত্থান, আর তাকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার পিছনে সম্রাট ইয়ংলের অবদান অনেক।

তবে তাকে পৃথিবীর মানুষজন অন্য আরেকটা কারণে খুব ভালো করে চেনে। তিনিই তৈরি করেছিলেন রাজকীয় প্রাসাদ কমপ্লেক্স ফরবিডেন সিটি।

সম্রাট ইয়ংলে বেইজিংয়ে রাজধানী আনার পরিকল্পনা করার সময়ই ভাবলেন সেখানে থাকার জন্য উপযুক্ত আবাসস্থল দরকার। তাই তিনি বেইজিংয়ে বিশাল এক প্রাসাদ কমপ্লেক্স তৈরি শুরু করেন।

১৪০৬ সালে কাজ শুরু হয়। চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের জঙ্গল থেকে মূল্যবান নানমু গাছ কেটে এনে আস্ত সব গাছ দিয়ে পিলার বানানো হয়। বিশাল বিশাল

চীনা রাজাদের রাজকীয় আবাস

মার্বেল পাথরের খণ্ড দিয়ে ভিত্তি তৈরি হয়। আর কিছু কিছু অংশের জন্য সোনার ইট তৈরি করা হয় যা আনা হয় সুঝৌ থেকে। প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক ১৪ বছর ধরে কাজ করে তৈরি করেন গংচেং বা প্যালেস সিটি। এটা ছিল পুরোপুরি এক রাজকীয় বাসস্থান। রাজপরিবারের সাথে সম্পর্কহীন কোনো সাধারণ মানুষ কখনোই এখানে ঢুকতে পারতেন না, আর তাই এ প্রাসাদ কমপ্লেক্সের নাম হয়ে যায় ফরবিডেন সিটি। এটা এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে টিকে থাকা সবচেয়ে বড়ো রাজকীয় প্রাসাদ কমপ্লেক্স।

৩

সকালে সবাই মিলে একসাথে নাস্তা করতে বসলাম। রকমারি হরেক পদ থাকে আমাদের জন্য। তবে অন্যান্য খাবার শেষ করে নাস্তায় আজকাল প্রতিদিনই একটা বিশেষ খাবার খাচ্ছি। ইয়োগার্ট বা বিশেষ দইয়ের মাঝে নিয়ে নিই ব্যানানা চিপস আর অনেকখানি পাম্পকিন সিডস। মাঝে মাঝে যোগ করি স্পাইসি পিনাটস। এই পাতলা করে ভাজা কলা, কুমড়ার বিচি আর চীনাবাদাম যোগ হলেই খাবারটা কেমন যেন অমৃত হয়ে যায়।

এরপরে সবাই মিলে বাসে চড়ে রওনা দিলাম। গন্তব্য এই বেইজিং শহরের কেন্দ্রস্থলে তখনকার ফরবিডেন সিটি বা এখনকার প্যালেস মিউজিয়াম। আক্ষরিক অর্থেই কেন্দ্রস্থল, কারণ এই প্রাসাদকে কেন্দ্র করেই পুরো বেইজিং সাজানো। এই ফরবিডেন সিটির দেওয়ালের চারদিক ঘুরে যে রাস্তাটা, সেটার নাম ফার্স্ট রিং রোড। এর বাইরে কিছু দূরে আরেকটা যে রাস্তা গোল হয়ে ঘুরে এসেছে, সেটা সেকেন্ড রিং রোড। তার বাইরে থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ রিং রোড, সব আছে।

আমরা বাস থেকে নামি প্রাসাদের পূর্ব দিকের রাস্তার ধারে। এরপরে আর কোনো যানবাহন ঢুকবে না। বাকি পথ যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। প্রাসাদের দেওয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে দেখি যে, দেওয়ালের বাইরে চারদিকেই চওড়া পরিখা আছে। আমাদের গাইড বললেন যে পানিভর্তি এই পরিখা ৫২ মিটার চওড়া, কারণ এটুকু চওড়া হলেই নাকি তখন শত্রুর তিরের নাগালের বাইরে থাকা যেত। তখনকার তিরন্দাজ যোদ্ধারা এর চেয়ে বেশি দূরে তির ছুঁড়তে পারতেন না।

হাঁটতে হাঁটতে দক্ষিণ দিকের মূল প্রবেশপথে হাজির হই। সেদিকে সীমানার বাইরে আছে প্রধান গেট, আর তার বাইরেই নিষিদ্ধ নগরীর প্রাসাদপ্রাচীরের দক্ষিণে আছে সুবিখ্যাত তিয়ানআনমেন স্কয়ার। ফরবিডেন সিটির এই দক্ষিণ গেটের আরেক নাম মেরিডিয়ান গেট, কারণ এখান থেকে উত্তর দিকের সব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা একটা নির্দিষ্ট লাইন বরাবর আছে।

ভিতরে ঢোকার জন্য ঘণ্টাখানেক ধরে লাইনে দাঁড়াতে হলো। বুঝলাম যে এটা আসলেই চীনের দেশি আর বিদেশি সবরকম পর্যটকদের আগ্রহের কেন্দ্রে আছে।

সিংহ আকৃতির আইসক্রিম

অপেক্ষা করতে করতে চারদিকে অপেক্ষমাণ সাদা, কালো, হলুদ, বাদামি, নানারঙের মানুষ দেখি। চীনা স্কুলের বাচ্চাকাচ্চারাও এসেছে দল বেঁধে। নিশ্চয়ই নিজেদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের সাথে পরিচিত হতেই তাদের এই দলবেঁধে আগমন। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে পাসপোর্ট স্ক্যান করে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম।

প্রথমেই চোখ আটকে যায় সব প্রাসাদের প্রাসাদোপম ছাদের ঢালু কিনারায় পরপর সাজানো কয়েকটা প্রাণিমূর্তি দেখে। জানলাম যে, এই রহস্যময় প্রাণীগুলোর সংখ্যা সবসময় ৩, ৫, ৭, অথবা ৯টা হতো, আর ওই প্রাসাদের গুরুত্ব অনুযায়ী সংখ্যা বাড়তে থাকত। ধারাবাহিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকে ড্রাগন, ফিনিক্স, সিংহ, সি-হর্স, আরো অনেকে। কম গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদের কিনারায় ৩ বা ৫টা, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদে ৯টা। শুধুমাত্র হল অব সুপ্রিম হারমোনির ছাদের কিনারায় আছে ১০টা প্রাণিমূর্তি। সাম্রাজ্যের সকল রাজ্যাভিষেক আর রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠান যে হলে আয়োজিত হতো, সেটার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি হতেই পারে।

ভিতরে ৯৮০টা আলাদা দালান আছে। এটুকু তথ্যই ১৭৮ একর জায়গা জুড়ে ছড়ানো এই প্রাসাদ চত্বরের ব্যাপকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়। আর জনশ্রুতি বলে যে, ওখানে নাকি মোট ৯৯৯৯টা রুম আছে, যদিও একটা একটা করে রুম গুনে গুনে এই তথ্যকে কখনো প্রমাণ করা যায়নি।

পুরো এলাকাকে মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আউটার কোর্ট আর ইনার কোর্ট। আর এই দুই অংশের মাঝে আছে পুরু আর উঁচু এক লাল রঙের দেওয়াল। সম্রাট বিচরণ করতে পারতেন যত্রতত্র, কিন্তু বাইরের কর্মচারীরা ভিতরে ঢুকতে

পারত না আর ভিতরে থাকা পরিবারের সদস্যরা কখনো বাইরে যেতে পারতেন না, আর রাজপরিবারের সাথে সম্পর্কহীন মানুষজন এই প্রাসাদ কমপ্লেক্সের ভিতরেই উঁকি দিতে পারতেন না।

বাইরের অংশ বা আউটার কোর্টে সম্রাটের সাথে মানুষের সাক্ষাতের সুযোগ ছিল। আর এখানেই প্রথম সরকারি চাকরিতে নিয়োগের পরীক্ষা হতো বলে জানলাম। একেবারে লিখিত আর মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে নিজের গ্রাম, জেলা আর প্রদেশ পার হয়ে এই প্রাসাদে আসতে হতো পরীক্ষা দিতে। প্রতি প্রদেশ থেকে নির্বাচিত তিন জন পরীক্ষার্থী প্রাসাদে আসার পরে স্বয়ং সম্রাট তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা নিতেন। এভাবেই মেধার ভিত্তিতে সুযোগ পাওয়া যেত সম্রাটের অধীনে সরকারি চাকরি করার।

দালানগুলোর সামনের বিশাল খোলা চত্বর পুরোটাই সাদা রঙের মার্বেল পাথরে বাঁধানো। তাই গরমের মাঝেও শীতলতার ছোঁয়া টের পাওয়া যায়। কৃত্রিম এক নদীও বয়ে গেছে চত্বরের ধার ধরে। আমাদের গাইড অবশ্য আলাদাভাবে দেখালেন কোন অংশের মার্বেল পাথর পরবর্তীতে সংস্কার করা হয়েছে, আর কোনো অংশের কিছুটা এবড়োখেবড়ো মার্বেল পাথরের মেঝে অবিকল টিকে আছে ছয়শ বছর ধরে।

পায়ের নিচে কিঞ্চিৎ শীতলতা থাকলেও মাথার উপরের প্রদীপ্ত মার্তণ্ড অকৃপণ রোদ বিলাচ্ছে। তাই পথের পাশে আইসক্রিমের ছবি দেখে এগিয়ে যাই সামনে। দোকানটায় নানারকম স্যুভেনির কেনার ব্যবস্থা আছে। আর আছে বিভিন্ন আকৃতির আইসক্রিম। আমি পছন্দ করলাম কেশর ফোলানো এক সিংহকে। মিং আমলে প্রতিষ্ঠিত পাথরে তৈরি ইমপেরিয়াল গার্ডিয়ান লায়ন বা রাজকীয় রক্ষক সিংহ রক্ষা

রাজকীয় প্রাসাদ

ছাদের নকশায় কী চমৎকার প্রতিসাম্য!

করছে প্রাসাদ কমপ্লেক্সকে, আর আইসক্রিম সিংহ আমাকে রক্ষা করল রোদের খরতাপ থেকে।

ভিতরের অংশ বা ইনার কোর্টে আছে সম্রাটের প্রাসাদ, সম্রাজ্ঞীর প্রাসাদ, আর এ দুটোর মাঝে অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাংকোয়েট হল। সম্রাটের কংকুবাইন বা উপপত্নীরা থাকতেন দুই পাশের অন্যান্য দালানে।

সম্রাটের প্রাসাদে বড়োসড়ো এক সিংহাসন আর ব্যাংকোয়েট হলের বসার জায়গা দেখতে পেয়েছি ভিড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে। তবে কোনো প্রাসাদের কোনো রুমের ভিতরেই যাওয়ার সুযোগ নেই, এটা দেখে খুব বিরক্ত আর হতাশ হয়েছি। দালানগুলোর বাইরে হেঁটে হেঁটে অদ্ভুত নিখুঁত আর জমকালো সাজসজ্জা দেখেই তাই সন্তুষ্ট হতে হয়।

সেই ১৪২০ থেকে টানা পাঁচশ বছর পার করে ১৯২৪ পর্যন্ত এই প্রাসাদ চত্বরই ছিল মহাপরাক্রমশালী চীন সাম্রাজ্যের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এর মাঝে ১৬৪৪ সাল পর্যন্ত প্রথম সোয়া দুইশ বছর রাজত্ব করেছে মিং সাম্রাজ্য, আর এরপরের বাকিটা মাঞ্চুরিয়া থেকে আসা মাঞ্চু জাতির চিং সাম্রাজ্য। ফরবিডেন সিটির ভিতরে তাই প্রাচীন নামফলকগুলো পাশাপাশি দুই ভাষায় লেখা– চীনা আর মাঞ্চু ভাষায়।

১৯২৪ সালে চীনা রাজশাসনের অন্তিম মুহূর্ত নিয়ে ১৯৮৭ সালে মুক্তি পায় দ্য লাস্ট এমপেরর নামের এক মুভি। সেখানে পুয়ি নামের সর্বশেষ চিং সম্রাটের জীবনকাহিনি উঠে এসেছে। আর এই মুভিই এখন পর্যন্ত একমাত্র সিনেমা যেটা সত্যিকারের ফরবিডেন সিটির ভিতরে শুটিং করার অনুমতি পেয়েছিল। এই নিষিদ্ধ নগরীকে

উপজীব্য করে নির্মিত বাকি সব মুভিই তাই তৈরি হয়েছে অন্য কোথাও কৃত্রিমভাবে তৈরি সেটে বসে।

সবার পিছনের অংশে আছে ইমপেরিয়াল গার্ডেন। সেখানে নানারকম গাছপালা আর ঝরনা আছে। আর আছে কৃত্রিমভাবে তৈরি আঁকাবাঁকা খাল। যেসব গাছের বয়স তিনশ বছরের বেশি সেগুলোতে আলাদাভাবে চিহ্ন দেওয়া আছে। কিছু গাছ আছে যেগুলোর বয়স ছয়শ বছরের বেশি।

৪

আমি সুপ্রাচীন নিষিদ্ধ নগরীর পথ ধরে অবাক হয়ে হাঁটি। কী বিশাল জায়গা নিয়ে বসবাস করতেন মহাশক্তিধর মহাচীনের মহাপরাক্রমশালী মহারাজারা! কত কত দালানকোঠা, কী নিখুঁত তাদের কারুকাজ, কত অজস্র অলিগলি, কেমন জৌলুস নিয়ে ছড়িয়ে আছে হাজারখানেক বাড়িঘর! কিন্তু সেই সম্রাট আর তাদের পরিবারের কেউ আর এখানে অবশিষ্ট নেই। বরং চারিদিকে হট্টগোল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার মতো অসংখ্য পর্যটক আর পরিব্রাজক।

নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে সবাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অনন্তের পথে যাত্রা করে। মাত্র শতবছরও বেঁচে থাকে না তারা। আমজনতাও যেমন তার আগেই ধরাধাম ত্যাগ করে, তেমনি একই সময়েই মহাপ্রস্থান করেন ক্ষমতাধর সম্রাট আর মহারাজারাও।

আমি নিঃশব্দে হেঁটে বেড়াই অদৃশ্যের মতো। হঠাৎ হঠাৎ কেন যেন আমার চারদিকে অনুভব করি রাজকীয় দৃশ্যকল্প আর রাজপরিবারের গুরুগম্ভীর সশব্দ পদচারণা। মানুষ হারিয়ে যায়, কিন্তু রয়ে যায় তার কীর্তি। সুকীর্তি রয়ে যায়, কুকীর্তিও রয়ে যায়।

আমি নিষিদ্ধ নগরীর রাজপথ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাই।

বাল্টিক প্রিন্সেসে টাইটানিক যাত্রা

সেলিম সোলায়মান

বেশ বড়সড় এই ট্যাক্স ফ্রি শপের নানান শেলফে খুঁজতে খুঁজতে মোটামুটি সহজেই পেয়ে গেলাম কাঙ্ক্ষিত দ্রাক্ষারসের বোতলটি। হ্যাঁ দামে এবং বোতলের মাথায় লাগানো ক্যাপে দুটোতেই মিলেছে। এটাই নিতে হবে। নেবো তো অবশ্যই। কিন্তু দাম দিতে যাওয়ার আগে দেখি তো মাল কতোটুকু আছে এর ভেতর?

ভেবেই লেবেলটির উপর চোখ বোলালাম। নাহ খারাপ না পরিমাণ, ঝাড়া ৭৫০ মি লি। মানে দুজনের জন্য যথেষ্ট লাল দ্রাক্ষারস ধারণ করে আছেন উদরে, লম্বাগলার সরু ঢেঙ্গা সাইজের নিতান্তই সরল সাধারণ চেহারার সবুজ রঙের এই বোতল।

নাহ আমি কোনো মতেই ওমর খৈয়াম, হাফিজ জাতের মানুষ না। কালেভদ্রেই তাদের মক্তবে ভর্তি হই দুয়েকটা ক্লাস করার জন্য। হয়েছে যেমন আজ।

অতীতে যখনই মদিরা কিনেছি, তখনই বাজেট মিলানোর সাথে, বোতলের লেবেল পড়ে সেটি কোন সাকিনের কোন জাতের মদিরা আর তার তেজের পরিমাণই বা কতোটা তা দেখার সাথে দেখতাম বোতলের ডিজাইন। এই প্রথম ভাবিত ছিলাম শুধুই বোতলের ছিপি নিয়ে। কারণ সাথে আছে রিয়াদ। ওর পক্ষপাতিত্ব তো হলো হালকা তেজের লাল দ্রাক্ষারসে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বেশিরভাগ লাল দ্রাক্ষারসের বোতল খুলতে লাগে কর্কস্ক্রু নামের বিশেষ যন্ত্র পড়েছিলাম যেটির কথা প্রথম স্কুলের বিজ্ঞান বইয়ে। ঐ সময়ে ভেবেছিলাম এই অদ্ভুত যন্ত্রের আবার কি কাজ? হাতেকলমে সেই কর্কস্ক্রুর দীক্ষা পেয়েছিলাম বহু বহু বছর পর একদিন রেড ওয়াইনের বোতল খুলত গিয়ে। কিন্তু এখন আছি আমরা যে অবস্থায়, তাতে ঐ কর্ক স্ক্রু খোঁজার হাঙ্গামায় কিছুতেই যাওয়া যাবে না।

তাই এই দোকানে ঢোকার আগে কায়মনে কামনা করছিলাম এদের স্টকে যেন পাওয়া যায় হাতের মোচড়ে খোলা যায় এমন ক্যাপসমৃদ্ধ রেড ওয়াইনের বোতল। দ্রাক্ষারসের খানদানি ও পাঁড় ভক্তদের বিশ্বাস হলো গলার ভেতর পর্যন্ত কর্কের ছিপি গিলে থাকাটাই হলো খানদানি রেডওয়াইনের প্রকৃত ভূষণ। হাত মোচড়ে ক্যাপ খোলা যায়, এমন রেড ওয়াইন মোটেও খানদানি না। কিন্তু আমাদের মতো অখান্দানি ও কালেভদ্রে পানকারীদের তো তাতে কিছু যায় আসে না। তাই ধারণার চেয়ে দ্রুততম সময়ে এই মদিরারাজ্যে ওরকম একটা বোতল যার দামও আছে বাজেটের মধ্যে, তা পেয়ে যাওয়ায় বড়ই পুলকিত হয়ে তুলে নিয়েছিলাম দ্রুত। যাই দেখি এখন এর দাম মেটাতে।

দাম মেটানোর জন্য কাউন্টারের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য দাঁড়াতে হলো নানান সেলফের ফাঁকে শুয়ে থাকা অপরিসর একটা প্রায় সরল রেখা মতো জায়গার লাইনে। লাইনে আছেন জনা ছয় সাতজন। ভাবছি, তারাও সবাই পকেটে থাকা কুপনের জোরেই এসেছেন নাকি ট্যাক্স ফ্রি সস্তা মদিরার খোঁজে? নিজের এই 'আপ ভি কাঁঠাল খায়া' অবস্থায় হাসি পেল। মানে ঐ যে শুনেছিলাম গল্পটা, বলছি তা।

বহুকাল আগে আফগানের এক কাবুলিওয়ালা বঙ্গদেশে সুদদাদনের কারবার করতে এসেছিল। আসার পর, প্রথমবারের মতো এক গাঁয়ের হাটে সস্তা দরের ম ম সুগন্ধের গাছপাকা কাঁঠাল দেখতে পেয়ে মহা উৎসাহে সে কিনে ফেলেছিল তা। কিন্তু কেনার পর ঐটি ভক্ষণের সঠিক তরিকা জানা না থাকায়, অনেক ভাবনা চিন্তা করে, সে নিজ দেশের নাশপাতির মতো ওইটিকে কামড়ে খেতে গিয়ে কাঁঠালের পিরিতির আঠায় তার আফগানি দাড়িগোঁফের বারোটা বেজে যায়। অতঃপর হাটের নাপিতের অপার দয়ায় সে যুগপৎ কাঁঠালের আঠা ও দাড়িগোঁফ মুক্ত হয়ে বেঁচেছিল সে যাত্রা।

তারপর থেকে বঙ্গদেশের অসংখ্য দাড়িগোঁফহীন মানুষদের কাউকে সামনে পেলেই তাকেই নাকি সে প্রশ্ন করত 'আপ ভি কাঁঠাল খায়া?'

সে যাক ছয় সাতজনের পেছনে দাঁড়ালেও এগুচ্ছে লাইনটি বেশ দ্রুতই। এ তো আর সুপারশপ মানে হালের মুদিদোকান না যে ঝুড়ি বা ট্রলি ভর্তি সওদাপাতি করতে এসেছে এখানে সবাই। এ হলো মূলত সিগারেট আর নানান জাতের স্পিরিট ও দ্রাক্ষারসের শুল্কমুক্ত দোকান। সামনে যারা ছিলেন ও আছেন এখনো, সবার হাতেই সওদা বলতে ছিল বা আছে বড় জোর দুই তিন বোতল মদিরা ও দু'য়েক কার্টুন ধূম্রশলাকা। একটু হেলে কাউন্টারের দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল উন্নতবক্ষা দীর্ঘদেহী সম্ভবত এক স্ক্যান্ডিনেভিয়ান শ্বেতসুন্দরীর।

চোখের সামনে এরকম সুন্দরী থাকলে এরচেয়ে ঢের বেশি লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা যায় দীর্ঘ দীর্ঘ সময় চণ্ডিদাস হয়ে অনায়াসে, যখন নাই অন্যকোন তাড়া। কিন্তু আমি বিড়ালের কপালে শিকে আর ছিঁড়েছে কবে যে গাছের কাঁঠাল দেখে দেখে হলেও গোঁপে তা দেবো? বরাবরের মতো ফাটাই কপাল আমার! তাইতো এমুহূর্তে আমার চোখের দৃষ্টি সামনে আল্পস পর্বত হয়ে গা ছোঁয়াছুঁয়ি দূরত্বে আছেন যিনি, তিনি হলেন মধ্যবয়সও পার করে দেওয়া বিগতযৌবনা এক স্থুলাঙ্গি শ্বেতাঙ্গিনী। এখন পর্যন্ত এখানে কোনো ধরনের দুলুনির রেশমাত্রও টের না পেলেও, সামনের আল্পস পর্বত দেখছি নড়ছেন, নাকি বলবো দুলছেন থেকে থেকে ডানে বাঁয়ে। গুরু সৈয়দ সাহেব বর্ণিত আব্দুর রহমানের মর্তমান নরসিংদীর সাগরকলার তো মতো ডান হাতের পাঁচ আঙুলে খাবলে ধরে আছেন উনি পেটমোটা ভোমা সাইজের অষ্টাদশবর্ষীয় এক প্রিমিয়াম স্কচের বোতল! কত দাম ওটার কে জানে? বা হাত তার একই রকম খাবলে ধরে আছে দুই কার্টুন সিগারেট।

এতো বড় দেহ কাঠামোটি তার মনে হচ্ছে দুই হাতের ঐ সামান্য ওজন ধরে রাখতেই টালমাটাল হয়ে গেছে! নড়ছেন ক্ষণে ক্ষণে ডানে বাঁয়ে। ঐ পর্বত বাঁয়ে সরলেই চোখে পড়ে কাউন্টার তরুণীর স্তনযুগলের উত্তেজক সৌন্দর্য। ডানে সরলে নিরুপায় হয়ে গভীর মনোযোগে শুঁকতে হচ্ছে আল্পস পর্বত হতে উড়ে আসা ফরাসি পারফিউমের মনহরা সৌরভ।

সৌভাগ্য বলতে যা বোঝায়, তা যদি আসেও ভুলে, তবে হয় তা অবশ্যই অতীব ক্ষণস্থায়ী আমার জন্য। অত্যন্ত করিৎকর্মা সুন্দরী ঐ কাউন্টারকন্যার কর্মদক্ষতায় দ্রুত অপসৃয়মান লাইনে থেকে চোখের সামনের আল্পস পর্বত ডানে বাঁয়ে টাল খাওয়া বাদ দিয়ে দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে বিল মিটিয়ে সরে যেতেই এগিয়ে গেলাম মহানন্দে। কিন্তু নাহ, সুন্দরীর সামনে এসে বরাবরের মতো ভড়কে গেলাম। অতএব তার দিকে সরাসরি না তাকিয়ে নিতান্তই নিষ্কাম সাধুর ভড়ং ধরে দ্রুত নিজের ভাগের দশ ইউরো মানের দুটো কুপন সুন্দরীর হাতে ধরিয়ে দিতেই, ফেরত পেলাম দেড় ইউরোর

জাহাজে ওঠার প্রাক্কালে

কয়েন। অতঃপর দ্রাক্ষারসের বোতল বগলদাবা করে শুল্কমুক্ত ঐ দোকান থেকে বেরিয়ে, মিটার দশেক দূরের সুপারশপের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, বোতলটি দ্রুত জ্যাকেটে ভেতর চালান করে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম রিয়াদের।

ওহ ভাল কথা, ঐ যে বললাম বেরিয়েছি এইমাত্র ট্যাক্স ফ্রি শপ থেকে তার মানে এই নয় যে এ মুহূর্তে অবস্থান আমার কোনো আধুনিক আন্তর্জাতিক ঝলমলে বিমানবন্দরে। তদুপরি এই শুল্কমুক্ত দোকানটি স্থির নয় মোটেও বরং চলমান এটি। তবে এটির অবস্থান কিন্তু কোনো বিমানের ভেতরেও নয়। এই দোকানের অবস্থান হলো বাল্টিক প্রিন্সেস নামের এক বিশাল জাহাজে। হ্যাঁ এই প্রথমই আমি কোনো চলমান জাহাজের ভেতরের এরকম শুল্কমুক্ত দোকানের অভিজ্ঞতা পেলাম। আসলে আমি ও আমরা এ মুহূর্তে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের যে বাহুটি বাল্টিক সমুদ্র নাম নিয়ে ঢুকে গেছে ফিনল্যান্ড আর সুইডেনের মাঝে আছি সেখান। হেলসিংকি থেকে স্টকহোম যাচ্ছি, সিলজা লাইনের এই জাহাজে করে। গত ঘণ্টা দেড়েক ধরে ঠিক কতো গতিতে ছুটছে বাল্টিক প্রিন্সেস তা জানি না। তবে কোনো রকম দুলুনি বা নুন্যতম ঝাঁকি টের পাচ্ছি না বলেই মনে হচ্ছে কোন জাহাজের ডেকে নয়, আছি দাঁড়িয়ে ভিনদেশী, বিশেষত ইউরোপীয় কোনো শহরের শপিং স্ট্রীটে।

মোবাইলের পর্দা মোতাবেক বাজে এখন স্থানীয় সময় রাত ছয়টা একুশ। এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে, সুপ্রিয় রিয়াজ ভাই ও জেবা আপা আমাদের দুই পরিবারকে নামিয়ে দিয়েগিয়েছিলেন, হেলসিংকির অলিম্পিয়া বন্দরে, যেখানে অতিকায় এক রাজহাঁসের মতো দাঁড়িয়েছিল এই বাল্টিক প্রিন্সেস ক্রুজশিপ। ব্যাগ সুটকেস আর তুমুল উত্তেজিত দুই পরিবারের সদস্যদের সামলে জাহজে ওঠার জন্য চেক ইন কাউন্টারের দিকে এগুবার মুহূর্তে, রিয়াজ ভাই একপাশে ডেকে নিয়ে প্রয়োজনীয় আটটি টিকিটের সাথে দিয়েছিলেন কিছু কুপন। বলেছিলেন জাহাজে ওঠার পর থেকে স্টকহোমে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত আঠারো ঘণ্টার মতো যে সময় পাওয়া যাবে তারই মধ্যে এই কুপনগুলো দিয়ে কেনাকাটা করা যাবে জাহাজের ভেতর।

বড়ই বিব্রত বোধ করছিলাম তখন। কিন্তু বলতে পারিনি কিছু মুখ ফুটে। ঘটনা হচ্ছে গত তিনরাত চার দিন আগে ঢাকা থেকে সপরিবারে উড়ে হেলসিংকি নেমে, উঠেছিলাম রিয়াদ মানে আমার সহকর্মীর বোন দুলাভাইয়ের বাসায়। সেই থেকে ছিলাম যাকে বলে শালা আদর তো নয় বরং বলা উচিত জামাই না হয়েও জামাই আদরে। সুদূর ফিনল্যান্ডের বুকে এ পরিবারটির স্বাভাবিক ও আন্তরিক বাঙালি আতিথেয়তার ওম ওম উষ্ণতায় বুজতেই পারছিলাম না আছি কোনো তুমুল ঠাণ্ডার দেশে। ছিল না শুধু কোনো বাকস্বাধীনতা!

মোটামুটি নির্বাক অবস্থায় সেই তিনরাত চারদিন ধরে মানে এই জাহাজে আমাদের সোপর্দ করে দেওয়ার আগ পর্যন্ত, রিয়াজ ভাই যেমন হেলসিংকির যাবতীয় দর্শনীয় স্থান দেখিয়েছেন আমাদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তেমনি জেবা আপা তার ফিনিশ হেঁশেল থেকে আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তি তো নয় বরং রসনা বিলাসের জন্য প্রতিবেলায় জোগান দিয়েছেন উমদা মোগলাই খাবার মায় ভর্তা ভাজিসহ খাঁটি বাংলা খাবারও। এক বেলায় আবার নিয়ে খাইয়েছেন হেলসিংকির বিখ্যাত ভারতীয় রেস্টুরেন্ট সম্রাটে, যেটির মালিকানা তাদেরই। ঢাকা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা ছাড়া আমাদের তাই কোনোরকম খরচ তো ছিলই না, ছিল না অচেনা বিদেশে বিভূঁইয়ে সপরিবারে ঘোরার কোন চাপও। চুপচাপ একদিন নিয়েছি শুধুই খাঁটি বাঙালি আতিথেয়তার মোড়কে পরিবেশিত হেলসিংকি অভিজ্ঞতাই।

তবে বাকস্বাধীনতা যে আমার অচিরেই রহিত হতে যাচ্ছে, টের পেয়েছিলাম তা, হেলসিংকিবাসের দ্বিতীয় দিনের নাস্তার টেবিলে। সেই সূত্রটিও এই জাহাজে করে স্টকহোমে যাওয়ার সাথেই ছিল গাঁথা। মাস ছয়েক আগে রিয়াদসহ যখন দুই পরিবারের প্রায় দেড়সপ্তাহব্যাপি এই ইউরোপ ভ্রমণের পরিকল্পনাটি করি, সেসময় পরিকল্পিত নানান জায়গার হোটেল আর প্রয়োজনীয় আন্তইউরোপ বিমান টিকিটের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম আগভাগেই। ব্যতিক্রম ছিল দুটো, তার একটি হলো

হেলসিংকি স্টকহোম বাল্টিকযাত্রার টিকিট। কারণ এই টিকিট তো ঢাকায় বসে কিনতে পারছিলাম না, যেমন পারছিলাম না কিনতে, আমাদের আরেক পরিকল্পিত ভ্রমণ মিলান থেকে সুইস বর্ডার পর্যন্ত ট্রেনের টিকিট। হেলসিংকির প্রথম সকালের নাস্তার টেবিলে তাই কথা তুলেছিলাম কখন যাবো টিকিট কিনতে? উত্তরে রিয়াজ ভাই হেসে হাত নেড়ে থামিয়ে বলেছিলেন ঐ চিন্তা বাদ দিতে।

ওনার কথার সঠিক মাজেজা বুঝতে না পেরে মুখ খুলতে যাবো যখন, তখনই রিয়াদ পাশ থেকে ফিসফিস করে বলেছিল, অনেক আগেই রিয়াজ ভাই আমাদের জন্য মোট নয়টা টিকিট কিনে রেখেছেন, কারণ আগে কিনলে এই টিকিটের দাম অনেক কম পড়ে। হ্যাঁ আমাদের নয়জনেরই আসার কথা ছিল এই ভ্রমণে। কিন্তু বাঁধ সেধেছিল তাতে ঢাকাস্থ সুইডিশ দূতাবাস। শেষ মুহূর্তে তারা হেলেন মানে আমার বোনের ভিসা দেয়নি। তাতে পড়েছিলাম শাঁখের করাতে। একদিকে হেলেনকে একা বাসায় রেখে দীর্ঘ এই ভ্রমণে আসার কথা ভাবতে পারছিলাম না, আবার ঐ কারণে বাকি সবার আনন্দ উত্তেজনার আগুনে ছাই চাপা দিতে পারছিলাম না। অবশ্য শেষপর্যন্ত বিস্ফোরণোন্মুখ একটা গুমোট পারিবারিক আবহাওয়ায় হেলেনকে রেখেই চলে আসতে হয়েছিল।

টিকিটের ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়ে নাস্তা শেষে ঐ টিকিটের দাম মেটানোর উদ্যোগ নিতেই, রিয়াদ দ্রুত সতর্কবার্তা দিয়েছিল যে, মোটেও যেন এ নিয়ে মুখ না খুলি। তুমুল বিব্রত হয়ে রিয়াদকে তখন মিন মিন করে বলেছিলাম, আচ্ছা রিয়াজ ভাই যেন অন্তত হেলেনের টিকিটটা জাহাজ কোম্পানিকে ফেরত দিয়ে তা ক্যাশ করে নেন।

অতঃপর আজ দুপুরে হেলসিংকির বন্দরের অলিম্পিয়া টার্মিনালে আমাদের নামিয়ে দেবার পর রিয়াজ ভাই যখন আটটি টিকিট হস্তান্তর করার সাথে একমুঠো শপিং কুপন ধরিয়ে দিয়েছিলেন হাতে, ফের তুমুল বিব্রত হলেও আমার হৃত বাকস্বাধীনতা তখনও ফেরার সাহস করেনি বলে মুখ বন্ধই রেখেছিলাম। শুধু ভাবছিলাম মনে কেন উনি এই শপিংকুপনগুলো কিনতে গেলেন!

এদিকে ততক্ষণে সামনে দাঁড়ানো অতিকায় রাজহাঁস বাল্টিক প্রিন্সেস ঘিরে দুই পরিবারে চার বাচ্চার মধ্যে চলছে তখন তুমুল উত্তেজিত বাকবিতণ্ডা বিষয়, এটি কী টাইটানিকের চেয়ে বড় নাকি ছোট জাহাজ? এরই মধ্যে অভ্র মানে আমাদের ছোটপুত্র বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা দিয়েছে যে এটি টাইটানিকের চেয়ে বড় জাহাজ। যা নিয়ে সন্দেহ প্রচুর গোটা দলটিতে। কিন্তু আমি তো জানি বেশ কিছুকাল আগে কোনো এক অজানা কারণে টাইটানিক বিষয়ে তুমুল কৌতূহলী হয়ে উঠে এ নিয়ে প্রচুর ঘাটাঘাটি করেছিল অভ্র, অনলাইনে। অতএব সবার ছোট বলে ওর মতামত অস্বীকার করার কোনো কারণ নাই জানিয়ে সবাইকে নিয়ে আঠারো ঘণ্টার

এক টাইটানিক যাত্রা শেষে স্টকহোমে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে উঠে পড়েছিলাম এই জাহাজে।

প্রায় তিনহাজার যাত্রীর সাথে গাড়ি ও ট্রাক মিলিয়ে মোট পাঁচশ বাহন বহন করার ক্ষমতাসম্পন্ন বিশালকায় এই প্রিন্সেসকে এর মধ্যে যতোটা দেখেছি, তাতে এটিকে একটা ছোট খাট শহরই বলতে হয়। আমাদের কেবিন দুটোই পড়েছে আটতলায় পাশাপাশি। চার বিছানা আর এক এটাচড বাথরুম সমৃদ্ধ প্রতিটি কেবিনকে অনায়াসে কমপক্ষে তিন তারকা হোটেলের ছোট একটা ডাবল রুমের সংস্করণই বলতে হয়। ব্যাগ সুটকেস গুছিয়ে রুম থিতু হয়ে বসার পর সেই কুপনগুলোর কথা মনে পড়তেই, ওগুলো বের করে গুনে দেখি, আছে দশ ইউরো মানের মোট ষোলটা কুপন।

এর কোনো মানে হয়? কী দরকার ছিল এসবের, এ কথা ভাবতে ভাবতে পাশের কেবিনে গিয়ে রিয়াদক আমার উষ্মার কথা, ও আশ্বস্ত করে বলল যে এগুলো আসলে হেলেনের টিকিট ফেরত দেবার ফলে পাওয়া গেছে। বাড়তি কোনো ইউরো গুনতে হয়নি এ জন্য।

এ কথা শোনা মাত্রই দ্রুত হিসাব করে দেখলাম আমাদের আটজনের মধ্যে চমৎকার নিঃশেষে ভাগ করে দেওয়া যায় এই ১৬০ ইউরো। এবং করেছিলামও তাই। সাথে সাথে ঘোষণা দিয়েছিলাম এই জাহাজের শপিং মলে আজ রাতের মধ্যে যার যা ইচ্ছা কিনে শেষ করতে হবে প্রত্যেকের বিশ ইউরো। এ নিয়ে সাথে সাথেই দলের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা দেখা দিলেও, বলেছিলাম শপিং যাওয়া যাবে জাহাজ ছাড়ার পরই শুধু।

সে মোতাবেক এই মিনিট বিশ কি ত্রিশ আগে রিয়াদের নেতৃত্বে যখন সবাই ঢুকেছিল এই সুপার শপে, সুযোগ বুঝে পেছন থেকে সটকে পড়ে নিজে গিয়ে ঢুকেছিলাম ঐ শুল্কমুক্ত দোকানে।

'কি সেলিম ভাই, কখন আসলেন ওখান থেকে ?'

সুপারশপের দরজায় থেকে উঁকি দিয়ে এসময় রিয়াদ একথা বলতেই দ্রুত ওকে বললাম, রিয়াদ দুটো ওয়ানই গ্লাস কিনে চলেন যাই উপরে কোথাও। রেড ওয়াইন কিনেছি। অরা শপিং করুক

'না সেলিম ভাই। হজ্জ করার পর থেকে আমি ছেড়ে দিয়েছি খাওয়া।'

শুনে ভাবি হায় এ কি অবস্থা! আমি তো পড়ে গেলাম তাহলে আরেক টাইটানিক চ্যালেঞ্জে! আগামী কয়েক ঘণ্টায় একাই আমাকে লুকিয়ে সাবাড় করতে হবে গোটা একবোতল লাল পানি! বলে কী!

দিঘাপতিয়ার রাজকুমারী ইন্দুপ্রভা

সোহেল আমিন বাবু

বৃষ্টিস্নাত বিকেল। মলিনমেঘে ঢাকা সূর্য লুকিয়ে আছে মেঘের গালে। আমার দৃষ্টির ছায়াতলে কবি ও দিঘাপতিয়ার রাজকুমারী ইন্দুপ্রভা এসে ভিড় করে। তাকে এক নজর দেখতে ইচ্ছে করে খুব। ইন্দুপ্রভা কী কুসুমকুমারী চোখে আজও কোন প্রতীক্ষায় জাগে! হয়তো জাগে হয়তো জাগে না। উটকো ভাবনা ছেড়ে নাটোর মিশন হাসপাতালে জাপানি ডা. মাসাকি তমিওকাকে দিয়ে তাজকিয়ার কানের চিকিৎসা নেওয়ার পর গেলাম দিঘাপতিয়া। জাপানি ডা. মাসাকি তমিওকা অসাধারণ হয়েও যিনি সাধারণ মানুষের বন্ধু, তাঁর প্রেম ও শ্রমের ফসল নাটোর মিশন হাসপাতাল।

আজ শুধু নাটোরের দিঘাপতিয়ার রাজবাড়ির স্থানিক সৌন্দর্য, ইতিহাসের টুকিটাকি বিষয়গুলো তুলে ধরলাম। অন্যদিন মানবিক ডাক্তার ডা, মাসাকি এবং তার মিশন হাসপাতাল নিয়ে লেখার ইচ্ছে রইল।

দিঘাপতিয়া ছিল মূলত একটি অজ গ্রাম। রাজাদের বাসস্থানের কারণে কালপরিক্রমায় সেই গ্রামটিই হয়ে ওঠে বিখ্যাত। দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি বা উত্তরা গণভবন নাটোরে অবস্থিত। এককালের দিঘাপতিয়ার রাজাদের বাসস্থানই বর্তমানে উত্তরা গণভবন নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালে সরকার দিঘাপাতিয়া রাজবাড়িকে 'উত্তরা গণভবন' নামে নামকরণ করেন। ৯ ফেব্রুয়ারি এই রাজবাড়ির মূল প্রাসাদে মন্ত্রিসভার বৈঠক আহ্বান করা হয়। সেই থেকে রাজবাড়িটি 'উত্তরা গণভবন'-এর প্রকৃত মর্যাদা লাভ করে। সে সময় রাজবাড়িতে সরকার প্রধান একটি বৃক্ষরোপণ করেছিলেন। সেই বৃক্ষটি আকাশে মাথা তুলে এখনও দৃশ্যমান।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস: প্রায় তিনশত বছরের ঐতিহ্যবাহী দিঘাপতিয়া রাজবাড়িটি বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম। দিঘাপতিয়া রাজপ্রাসাদের মূল অংশ এবং সংলগ্ন কিছু ভবন নির্মাণ করেছিলেন দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দয়ারাম রায় (১৬৮০-১৭৬৭)।

রাজবংশের ষষ্ঠ রাজা প্রমদানাথ রায় ১৮৯৭ সালের ১০ জুন নাটোরের ডোমপাড়া মাঠে তিনদিনব্যাপী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের এক অধিবেশন আয়োজন করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি এ অধিবেশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

অধিবেশনের শেষ দিন ১২ জুন প্রায় ১৮ মিনিটের এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। পরে রাজা প্রমদানাথ রায় ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ১১ বছর সময় ধরে বিদেশি বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী ও চিত্রকর্ম শিল্পী আর দেশি মিস্ত্রিদের সহায়তায় সাড়ে ৪১ একর জমির উপর এই রাজবাড়িটি পুনঃনির্মাণ করেন।

সাড়ে ৪১ একর জায়গাজুড়ে বিস্তৃত প্রাসাদটি পরিখা ও উঁচু প্রাচীরঘেরা। প্রাসাদের পূর্বপাশে পিরামিড আকৃতির চারতলা প্রবেশদ্বার রয়েছে যা উপরের দিকে সরু। প্রবেশদ্বারের উপরের অংশে একটি ঘড়ি বসানো রয়েছে।

মধ্যযুগীয় বাংলাদেশের অন্যান্য সমস্ত প্রাসাদের মতোই নাটোরের রাজবাড়িতে রয়েছে দীর্ঘ প্রবেশপথ।

দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দয়ারাম রায়। তিনি নাটোরের রাজা-মহারাজ রামজীবনের একান্ত অনুগত একজন দেওয়ান ছিলেন। নাটোর রাজ্যের উত্থানে দয়ারাম রায় অসামান্য ভূমিকা রাখেন। এ কারণে মহারাজ রামজীবন খুশি হয়ে ১৭০৬ সালের দিকে দয়ারামকে উপহার হিসেবে বাসস্থানের জন্য দিঘাপতিয়ায় কিছু জমি দান করেন। পরে জমিদারও রাজা হওয়ার পর ১৭৩৪ সালে দয়ারাম রায় দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তরা গণভবন

এই রাজবাড়ির প্রবেশ পথের বিশাল ফটকটি আসলে একটি বিরাটাকৃতির পাথরের ঘড়ি। ঘড়িটি রাজা দয়ারাম সেই সময় ইংল্যান্ড থেকে আনিয়েছিলেন। ঘড়িটির পাশে রয়েছে একটি বড় ঘণ্টা। এক সময় এই ঘণ্টাধ্বনি বহুদূর থেকে শোনা যেত।

প্রাসাদের ভেতর বহু প্রাচীন ও দুর্লভ প্রজাতির গাছের সমাবেশ ও সমারোহ রয়েছে। ঢাকার জাতীয় স্মৃতিসৌধের শোভাবর্ধনকারী রোপণকৃত ফুল ব্রাউনিয়া ও ককেসিয়া এখান থেকেই নেওয়া হয়। চারিদিকে সবুজ নিসর্গ নয়নপাতে সুখ ছড়ায়।

এছাড়া অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে এখানে আছে রাজ-অশোক, সৌরভী, পারিজাত, হাপাবমালি, কর্পূর, হরীতকী, যষ্টিমধু, মাধবী, তারাঝরা, মাইকাস, নীলমণিলতা, হৈমন্তীসহ বিভিন্ন দুর্লভ প্রজাতির ফলজ ও ঔষধি বৃক্ষ। প্রাসাদের মধ্যে পরিখা বা লেকের পাড়ে এসব বৃক্ষের ছড়াছড়ি।

প্রাসাদের প্রবেশ পথের চারদিকে প্রাসাদঘেরা পরিখা যা পুরো রাজপ্রাসাদকে ঘিরে রেখেছে। ভেতরে বিশাল মাঠ ও গোলাপ বাগান, একপাশে গণপূর্ত অফিস। দ্বিতল হলুদ ভবনটি কুমার প্যালেস নামে পরিচিত। এই প্রাসাদে শেষ রাজকুমার (বড়

রাজকুমার) প্রভাত কুমার রায় বসবাস করতেন। প্রাসাদের নিচতলাটি টর্চারসেল হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

এই চত্বরে একটি একতলা তহশিল অফিস আছে। সে সময়কার চারটি কামান রয়েছে। কামানগুলোর স্থাপনকাল ছিল ১৭৯৯ সাল।

বিশাল রাজদরবারসংলগ্ন বাগানে জমিদার দয়ারামের একটি ভাস্কর্য তার স্মৃতির প্রতীক। প্রাসাদের মধ্যে একটি মিলনায়তন ভবনসহ রয়েছে আরো দুটি ভবন।

গাড়ি পার্ক করার গ্যারেজ আলাদা। যাবতীয় স্থাপনা মাঝখানে। প্রাসাদের ভেতর রয়েছে বিভিন্ন ব্যবহার্য জিনিসপত্র। ভবনের মধ্যে জাদুঘর, বহু দর্শনীয় স্মৃতিস্তম্ভ, ভাস্কর্য ও দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য দৃষ্টিকাড়ে।

ইতালীয় গার্ডেন উত্তরা গণভবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ। গার্ডেনটির আসবাবপত্র রাজা দয়ারাম ইতালি থেকে আনিয়েছিলেন। ছিপ হাতে কালো রঙের মার্বেল পাথরের মূর্তিটি দৃষ্টিনন্দন। গার্ডেনের বেঞ্চগুলো কোলকাতা থেকে আনানো হয়েছিল। পাহাড়িকন্যা নামক পাথরের মূর্তিটির এক হাত ভাঙা। হাতের কবজিটি স্বর্ণ দিয়ে বাঁধাই করা ছিল। এখানে রানির টি-হাউসটি অতুলনীয়।

উত্তরা গণভবন চত্বরে গোলপুকুর, পদ্মপুকুর, শ্যামসাগর, কাছারিপুকুর, কালীপুকুর, কেষ্টজির পুকুর নামে ছয়টি পুকুর রয়েছে। এছাড়া গণভবনের ভেতরের চারপাশে সুপ্রশস্ত পরিখা রয়েছে। প্রতিটি পুকুর পরিখায় শানবাঁধানো একাধিক ঘাট আছে। দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় পুকুরগুলো ভরাট হয়ে গেছে। ঘাট ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। প্রাচীন এই অবকাঠামোকে ঘিরে অজস্র আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, মেহগনি, পাম ও চন্দনাসহ দুর্লভ জাতের গাছ লাগানো ছিল। অযত্ন আর অবহেলায় ইতোমধ্যে অনেক গাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রাসাদের পিছন দিকে রয়েছে ফোয়ারাসহ একটি সুদৃশ্য বাগান। এই বাগান রানীর বাগান নামে পরিচিত। বাগানের এক কোণে রয়েছে প্রমাণ আকৃতির মার্বেল পাথরের তৈরি একটি নারীমূর্তি।

নামকরণ: ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর দিঘাপতিয়ার শেষ রাজা প্রতিভানাথ রায় ভারতে চলে যান। এ সময় থেকে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি পরিত্যক্ত। ১৯৫০ সালে জমিদারি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস হওয়ার পর দিঘাপতিয়ার রাজপ্রাসাদটির রক্ষণবেক্ষণে বেশ সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৬৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রাজবাড়িটি অধিগ্রহণ করে। রক্ষণবেক্ষণের সমস্যা সমাধানে দিঘাপতিয়ার মহারাজাদের এই বাসস্থানকে ১৯৬৭ সালের ২৪ জুলাই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান দিঘাপতিয়ার গভর্নরের বাসভবন হিসেবে উদ্বোধন করেন। পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি সরকার আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে এর নাম পরিবর্তন করে উত্তরা গণভবন ঘোষণা করেন।

উত্তরা গণভবন সংগ্রহশালা: সংগ্রহশালাটি ২০১৮ সালের ৯ মার্চ স্থাপিত হয়। উত্তরা গণভবনের পুরাতন ট্রেজারিভবনে স্থাপিত সংগ্রহশালায় বিভিন্ন রাজার আমলের অন্তত শতাধিক জিনিসপত্র স্থান পেয়েছে। এই সংগ্রহশালাকে রাজার আমলের শতাধিক দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর সমাহারে সাজানো হয়েছে। অতীতের সাথে বর্তমানের মেলবন্ধন তৈরি করেছে এই সংগ্রহশালা।

রাজবাড়িতে একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা রয়েছে। সংগ্রহশালার করিডরে রাজা প্রমদানাথ রায় ও সস্ত্রীক রাজা দয়ারাম রায়ের ছবি আর রাজবাড়ির সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। করিডরে মার্বেল পাথরের একটি রাজকীয় বাথটাব প্রদর্শন করা হয়েছে। ডানপাশের কক্ষে রাজার পালঙ্ক, ঘূর্ণায়মান চেয়ার, টেবিল, আরামচেয়ার আর ড্রেসিংটেবিল স্থাপন করে তৈরি করা হয়েছে রাজার শয়নকক্ষ।

বামপাশের দ্বিতীয় কক্ষে শোভা বাড়াচ্ছে রাজসিংহাসন, রাজার মুকুট আর রাজার গাউন। আরও আছে মার্বেল পাথরের থালা, বাটি, কাচের জার, পিতলের গোলাপ জলদানি, চিনামাটির ডিনার সেট।

এই কক্ষে লেখক গবেষকরা অনায়াসে লেখার উপাদান পেয়ে যাবেন রাজপরিবারের লাইব্রেরির বই আর শেষরাজা প্রতিভানাথ রায়ের ইন্সুরেন্সবিষয়ক কাগজপত্রের মধ্যে।

একটি কক্ষ রাজকুমারী ইন্দুপ্রভা চৌধুরানীর। সুলেখক ইন্দুপ্রভাকে রাখা হয়েছে তারই পিতলের ছবির ফ্রেমে। আছে তার ব্যক্তিগত ডায়েরি, আত্মজীবনী, পাণ্ডুলিপি ও তার কাছে লেখা স্বামী মহেন্দ্রনাথ চৌধুরীর রাশি রাশি চিঠি। মন হারাবেন এখানে এলে।

দর্শনার্থীদের জন্যে ইন্দুপ্রভার লেখা বঙ্গোপসাগর কবিতাটি ফ্রেমে বাঁধাই করে দেয়ালে টানানো হয়েছে। ৬৭ লাইনের এই কবিতায় মুগ্ধ কবি বর্ণনা করেছেন বঙ্গোপসাগরের অপরূপ সৌন্দর্য। ইন্দুপ্রভার অসাধারণ কাব্য প্রতিভা দেখে সত্যি মুগ্ধ হতে হয়।

করিডর ছাড়াও সংগ্রহশালার দশটি কক্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে দৃষ্টিনন্দন সব আসবাবপত্র। বিশেষ করে রকমারি সব টেবিল। এরমধ্যে ডিম্বাকৃতির টেবিল, গোলাকার টেবিল, দোতলা টেবিল, প্রসাধনীটেবিল, অষ্টভুজ টেবিল, চর্তুভুজ টেবিল, কর্নার টেবিল, গার্ডেন ফ্যান কাম টি-টেবিল ইত্যাদি।

দর্শনার্থী ও দর্শনের সময়: বর্তমানে এই রাজপ্রাসাদ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছে। এখানে প্রতিদিন গড়ে ২৫০-৩০০ জনের বেশি পর্যটক পরিদর্শনে আসেন। এদের মধ্যে বিদেশীরাও আছেন। দর্শনীর পরিমাণ ৪০ টাকা, ছাত্রদের জন্য ২০ টাকা। বিদেশীদের জন্য ১০০ টাকা। তবে সার্কভুক্ত দেশের দর্শনার্থীরা ৪০টাকা দিয়ে টিকেট কাটতে পারেন।

উত্তরা গণভবনের রানী পুকুরঘাট

উত্তরা গণভবন নাটোরের জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ সরকারের গণপূর্ত বিভাগ পরিচালনা করে আসছে।

দিঘাপতিয়া পর্যটনের জন্য চমৎকার একটি স্পট। এখানে বেড়ানোর জন্য গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি হলো বেলা ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। দুপুর ১টা থেকে ত্রিশ মিনিট মধ্যাহ্ন বিরতি। আর শীতকালীন সময়সূচি হলো সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা। দুপুর ১টা থেকে ৩০ মিনিট মধ্যাহ্ন বিরতি। উত্তরা গণভবন শুক্র-শনিবার ছাড়া সরকারি ছুটির দিনগুলোতেও বন্ধ থাকে।

বন্ধুরা দিঘাপতিয়ায় কী দেখতে পাবেন সে সব কথা জানালাম এতোক্ষণ। ঘড়ির কাঁটা ছয়টা ছুঁই ছুঁই করছে। সারাদিন বৃষ্টি হলেও ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত বৃষ্টি ছিল না। নিরাপত্তা কর্মী বললেন, এবার যেতে হবে। ফিরে আসতে হবে স্মরণ ছিল না। অন্য কোনো অবসরে আরো জানতে হবে রাজকুমারী কবি ইন্দুপ্রভাকে। সময়ের ঘড়িটা ক্লান্ত পর্যটকের মতো হাঁপায়। কালের যাত্রায় রাজণ্যদের স্বপ্ন হারানোর গল্প বুকে করে আবশেষে ফিরতেই হলো। স্মৃতি হয়ে পেছনে পড়ে রইল দিঘাপতিয়ার রানীর রোজ গার্ডেন আর রাজকুমারী ইন্দুপ্রভার সরল কবিতারা।

আগরতলা-কলকাতা ॥ এক যাত্রায় দুই শহর

হাসিবুর রহমান সৌরভ

বাংলাদেশ থেকে আগরতলা, ত্রিপুরার রাজধানী ভ্রমণ একটি অনন্য অভিজ্ঞতা। সীমান্তের খুব কাছে অবস্থিত এই শহরটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ঐতিহ্যের জন্য পরিচিত। আর অন্যদিকে কলকাতা: যেখানে ইতিহাস, সংস্কৃতি আর আধুনিকতার মিশ্রণ।

ভ্রমণের শুরু: আখাউড়া সীমান্ত পেরিয়ে আগরতলা

আমাদের যাত্রা শুরু হলো সকালবেলায়। নরসিংদী থেকে প্রাইভেটকারে চেপে আখাউড়া স্থলবন্দরের দিকে রওনা দিলাম আমরা ৩জন। আখাউড়া সীমান্তটি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এবং ত্রিপুরার আগরতলার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। প্রায় তিন ঘণ্টার যাত্রা শেষে সীমান্তে পৌঁছালাম। পাসপোর্ট এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ত্রিপুরায় প্রবেশ করলাম। সীমান্তের দুই পাশেই মানুষের মুখে একরকম উষ্ণতা অনুভূত হয়।

সীমান্ত পেরিয়ে আগরতলা শহরে পৌঁছাতে মাত্র ৩০ মিনিট সময় লাগে। শহরে ঢোকার সাথে সাথেই চোখে পড়ল বড় বড় সবুজ গাছ আর পরিচ্ছন্ন রাস্তা। পরিবেশের এই সৌন্দর্য আর শৃঙ্খলিত জীবনের ছাপ মুগ্ধ করল। আগরতলা হোটেলে চেকইন করলাম, এবার ভ্রমণের স্বাদ শুরু। আমাদের হোটেল ছিল একদম আগরতলার কেন্দ্রীয় মসজিদের সাথে।

আগরতলায় আমাদের প্রথম গন্তব্য 'নীড়মহল'

আমরা আমাদের দুপুরের খাবার শেষ করে রওনা দিলাম নীড়মহলের উদ্দেশে। আমরা বাসে করে প্রায় ৫০ কিলোমিটার জার্নি করে বিকেল বেলা নীড়মহলে পৌঁছাই। সেখান থেকে আমরা স্পীড বোট দিয়ে পৌঁছাই এই ভাসমান রাজপ্রাসাদে।

'নীড়মহল' ত্রিপুরার এক অনন্য রত্ন, যাকে ভারতের একমাত্র জলমহল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাজ্যের রাজধানী আগরতলা থেকে প্রায় ৫৩ কিলোমিটার দূরে রুদ্র সাগর হ্রদের বুকে অবস্থিত এই রাজকীয় স্থাপনাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও স্থাপত্যশৈলীর এক অসাধারণ মিশ্রণ। ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ১৯৩০ সালে এই মহলের নির্মাণ শুরু করেন, যা ১৯৩৮ সালে শেষ হয়। এটি ছিল রাজপরিবারের গ্রীষ্মকালীন অবকাশযাপন কেন্দ্র।

সন্ধ্যায় মহলের চারপাশে বিস্তৃত রুদ্র সাগর হ্রদে নৌকাভ্রমণ করে আমরা মহলের অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করলাম। সেই সাথে সন্ধ্যার আলোকসজ্জায় জ্বলজ্বল করা মহলটির চমৎকার সৌন্দর্য উপভোগ করে ফিরে এলাম আগরতলা শহরে।

রাতের আগরতলা শহর: এক আলোকোজ্জ্বল অভিজ্ঞতা

আগরতলা শহর রাতের বেলায় এক অন্যরকম আবহ সৃষ্টি করে, যেখানে আধুনিক শহরের ছোঁয়া ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মিশ্রণে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি হয়। আমরা রাতের আগরতলা চমৎকারভাবে উপভোগ করছিলাম সেইসাথে আমাদের সামান্য শপিং করে নিলাম। আর এভাবেই শেষ হলো আমাদের ভ্রমণের প্রথমদিন।

দ্বিতীয় দিন 'আগরতলা থেকে বিমানে কলকাতা'

সকাল সকাল আমরা উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ ঘুরে রওনা দিলাম আগরতলা মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের উদ্দেশে। আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দর ত্রিপুরার প্রধান বিমানবন্দর এবং এটি ছোট হলেও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল। আমরা আমাদের বোর্ডিংপাস নিয়ে বিমানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। আমি অনেকটা এক্সাইটেড ছিলাম, কারণ এটা আমার প্রথম বিমানে চড়ার অভিজ্ঞতা ছিল।

ট্যাক্সি থেকে যায় চেনা

ঠিক সময়মতো আমাদের ফ্লাইট আমাদের সামনে চলে আসলো এবং আমরা সবাই বিমানে উঠে গেলাম।

বিমানে চড়ার পর জানালার পাশে আমার আসন দেখে মনে হলো, যাত্রা আরও বিশেষ হবে। বিমান উড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আগরতলার ছোট ছোট গ্রাম, সবুজ বন, আর পাহাড়ের দৃশ্য একে একে চোখের সামনে ছোট হতে লাগল। বিমান যখন মেঘের উপর উঠে গেল, মনে হলো যেন আমি মেঘের এক জগতে প্রবেশ করেছি। সূর্যের আলোয় মেঘে পড়ে সোনালি আভা তৈরি করেছিল। মাত্র ১ ঘণ্টার এই যাত্রায় মেঘের খেলা, নীল আকাশ, আর নিচের দৃশ্য দেখে সময় যেন উড়ে গেল।

কলকাতা পৌঁছানো: এক প্রাণবন্ত শহরের আমন্ত্রণ

বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে এক অন্যরকম পরিবেশ পেলাম। কলকাতার ব্যস্ততা, হলুদ ট্যাক্সি, আর মানুষের কোলাহল যেন আমাকে নতুন করে প্রাণবন্ত করে তুলল। শহরের গন্তব্যে যাওয়ার পথে রাস্তার আলোর মেলা আর মানুষের কর্মব্যস্ততা দেখে কলকাতার গভীরতা অনুভব করলাম। আমরা কলকাতার মার্কুইস স্ট্রিটের একটা

হোটেলে চেকইন করলাম। তারপর আমরা ফ্রেশ হয়ে চলে গেলাম কলকাতার বিখ্যাত গরুর মাংস দিয়ে দুপুরের খাবার খেতে।

নিউ মার্কেট ভ্রমণের গল্প

দুপুরের খাবার শেষে আমরা বেরিয়ে পড়লাম কলকাতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র নিউ মার্কেট-এর উদ্দেশে। জায়গাটা শহরের ইতিহাস আর আধুনিকতার এক মিশ্রণ। পৌঁছেই মনে হলো, যেন এক অন্যরকম ব্যস্ততাপূর্ণ দুনিয়ায় এসে পড়েছি।

দোকানের লাইন আর কেনাকাটার উত্তেজনা চারপাশে ছোট-বড় দোকানের ভিড়। গয়না, পোশাক, কসমেটিকস, চামড়ার জিনিস সবকিছুই যেন হাতছানি দিচ্ছে। আমরা প্রথমেই গলির ভেতরের একটা ছোট দোকানে ঢুকে পড়লাম। দোকানের মালিকের হাসিমুখ আর দরদামের মজাটা অসাধারণ ছিল। বাসার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কসমেটিকস কেনার পরে মনে হলো, এবার একটু জামাকাপড়ের দিকে মন দেওয়া যাক।

দরদামের মজা

দরদাম তো কলকাতার নিউ মার্কেটের বড় আকর্ষণ! 'দাদা, এটা ৩০০ কমিয়ে দিন না!' কথাটা বারবার বলতে বলতে নিজেদেরও হাসি পাচ্ছিল। তবে দোকানদারের সঙ্গে এমন দরদামের অভিজ্ঞতা সত্যিই মনে রাখার মতো।

স্ট্রিট ফুডের স্বাদ

শপিংয়ে হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে পাশের রাস্তার একটা দোকানে থামলাম। আহা, এমন স্ট্রিট ফুডের স্বাদ অন্য কোথাও নেই! আমরা মশলাদার, মচমচে, আর একেবারে জিভে জল আনা দারুণসব স্ট্রিট ফুড খেলাম।

সন্ধ্যার আলোয় নিউ মার্কেট

সন্ধ্যা নামতেই নিউ মার্কেট যেন আরও বেশি রঙিন হয়ে উঠল। চারদিকে আলো, মানুষের কোলাহল আর ভিড় দেখে একবার মনে হলো, কলকাতার আসল রূপটা এখানেই। কিছুক্ষণের জন্য সময় যেন থেমে গিয়েছিল।

নিউ মার্কেট থেকে ফেরার পথে মনে হলো, দিনটা যেন মুহূর্তেই কেটে গেল। ব্যাগভর্তি শপিং আর মনভর্তি স্মৃতি নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলাম। নিউ মার্কেট আমাদের প্রথম দিনের কলকাতা ভ্রমণকে একেবারে বিশেষ করে তুলেছে।

দ্বিতীয় দিনে হাওড়া ব্রিজ ভ্রমণ

আজ আমাদের কলকাতা ভ্রমণের দ্বিতীয় দিন এবং আমরা রওনা দিয়েছিলাম কলকাতার অন্যতম ঐতিহাসিক এবং আইকনিক স্থানে, হাওড়া ব্রিজ।

প্রথম দেখা হাওড়া ব্রিজ

যতটা ভাবলাম, হাওড়া ব্রিজ ততটাই অবিশ্বাস্যভাবে সুন্দর। ব্রিজের বিশালতা, হুগলি নদীর উপর এর স্থিরতা এবং শহরের পুরানো আর আধুনিক রূপের সংমিশ্রণ দেখে আমরা একদম মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। সকালের আলোয়, নদীর শান্ত জল এবং চারপাশের ব্যস্ত কলকাতা একটি চমৎকার দৃশ্য তৈরি হয়েছিল।

নদীর তীরে হাঁটাহাঁটি

হাওড়া ব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে আমরা কিছুক্ষণ নদীর তীরে হাঁটলাম। অনেক স্থানীয় মানুষ নিজেদের কাজকর্মে ব্যস্ত, আর আমরা সময়টা উপভোগ করতে থাকলাম। নদীর স্বচ্ছ জল, দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ, এই দৃশ্য গুলি আমাদের মনে গভীর ছাপ রেখে গেল। ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে বা নদীর তীরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক ছবি তোলা হলো। হাওড়া ব্রিজ ঘুরে আমরা রওনা দিলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য মান্নাদে'র বিখ্যাত কফি হাউসের উদ্দেশে।

মান্নাদে'র বিখ্যাত 'কফি হাউসে'

হলুদ ট্যাক্সিতে করে আমরা চলে গেলাম কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে, যেখানে একসময় ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, এবং চিন্তকরা মিলিত হতেন। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, 'কফি হাউসে কিছুক্ষণ' গানটির সুরে নিজেকে মগ্ন করে এখানকার পুরানো পরিবেশে কিছু সময় কাটানো।

কফি হাউসে প্রথম পদার্পণ

কফি হাউসে ঢুকতেই এক অদ্ভুত শান্তি ও ঐতিহ্যের গন্ধ অনুভব করতে পারলাম। দেয়াল জুড়ে পুরানো ছবির ফ্রেম, বইয়ের শেলফ, এবং সিঁড়ির পাশে সিটে বসে থাকা লোকজন, সবকিছু যেন অতীতের কোনো স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। গানের সেই লাইনগুলো যেন বাস্তবে পরিণত হয়েছিল, 'কফি হাউসে কিছুক্ষণ বসে থাকি'।

গানের অনুভূতি

হাস্য-আলোচনার মাঝেও মান্না দে'র সেই জনপ্রিয় গানটি মনে পড়ছিল, 'কফি হাউসে কিছুক্ষণ, বসে থাকি তোমার সাথে...'। পুরো পরিবেশ যেন সেই গানটির সঙ্গে মিলে গিয়ে এক চিরন্তন অনুভূতি তৈরি করছিল। এখানে বসে মনে হচ্ছিল, সময় থেমে গিয়েছে, এবং আমরা গত দিনের কলকাতার শুদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, এবং সৃষ্টিশীলতার অঙ্গনে রয়েছি।

শেষ কিছু স্মৃতি

আমরা কফি হাউসের থেকে বেরিয়ে আসি, কিন্তু ওই শান্তি, ঐতিহ্য, আর ভালোবাসার আবহাওয়া আমাদের সঙ্গে থেকে গিয়েছে। কলকাতা সফরের অংশ হিসেবে কফি হাউসে কাটানো কিছু মুহূর্ত সত্যিই বিশেষ ছিল। এবার আমাদের পরবর্তী গন্তব্য কলকাতার বিখ্যাত 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

রিজার্ভ ট্যাক্সিতে করে আমরা চলে গেলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। শহরের একদম কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই স্থাপনা, এক ঐতিহাসিক রত্ন, যা ব্রিটিশ রাজত্বের স্মৃতি এবং কলকাতার সাহিত্যের গৌরবকে অম্লান রাখে। আমরা ১০০ রুপি দিয়ে যার যার টিকিট কেটে নিলাম।

ত্রিপুরা সরকার হজ ভবন

সুপারশপে আমি

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে প্রবেশ

এখানে পৌঁছানোর পর প্রথমে চোখে পড়ল, সাদা মার্বেল থেকে তৈরি বিশাল ভবনটির এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। সেইসাথে এর আর্কিটেকচারাল ডিজাইন এবং চারপাশের বিস্তৃত বাগান আমাদের চোখে পড়ল। প্রথমবারের মতো এখানে এসে, এক ধরনের ইতিহাসের মাঝ দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম। মনে হচ্ছিল, এই জায়গা এক সময়ে ব্রিটিশ রাজত্বের ঐতিহ্য বহন করত এবং আজকের দিনে এটি কলকাতার সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভেতরের সৌন্দর্য

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিতরে প্রবেশ করলে, ইতিহাসের প্রতি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। মিউজিয়ামটি নানা যুগের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং কাল্পনিক শিল্পকর্মের সংগ্রহে

পূর্ণ। ব্রিটিশ রাজতন্ত্র, কলকাতার প্রাচীন দিনগুলি এবং শহরের সংস্কৃতির স্মৃতি যেন প্রতিটি দেয়ালে বেজে ওঠে। সেখানকার নানা সংগ্রহ, শিল্পকর্ম এবং প্রাচীন মূর্তিগুলি আমাদের মনে এক ধরনের অদৃশ্য সংযোগ সৃষ্টি করেছিল।

বাগানে ঘুরে বেড়ানো

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাইরের বিশাল বাগানটিও আমাদের প্রশান্তি দিয়েছে। এখানে হাঁটতে হাঁটতে, শহরের কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। পাতা ঝরা গাছ, একপাশে হ্রদ, আর শান্ত বাতাস এখানকার পরিবেশ একেবারে স্বপ্নীল ছিল। কিছুক্ষণ বসে থাকলে, মনে হতো, আমরা যেন সময়ের এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে পৌঁছে গিয়েছি। তারপর আমরা রওনা দিলাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সাইন্স সিটির উদ্দেশে।

সাইন্স সিটি ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

এটি শহরের অন্যতম জনপ্রিয় এবং শিক্ষামূলক স্থান, যেখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, এবং প্রকৃতির বিভিন্ন দিক একসাথে উপস্থাপিত হয়েছে। ভ্রমণের প্রথম থেকেই আমাদের মধ্যে এক আগ্রহের অনুভূতি ছিল। সাইন্স সিটির বিশাল দালানকোঠা, আধুনিক আর্কিটেকচার এবং প্রবেশপথের সাজসজ্জা দেখেই আমাদের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়ে গেল। প্রতিটি কোণে বিজ্ঞানের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে প্রবেশ করার পর এক ধরনের নতুন দুনিয়ার মুখোমুখি হওয়ার অনুভূতি হচ্ছিল।

এরপর আমরা গেলাম বৈজ্ঞানিক গ্যালারিতে, যেখানে রোবটিক্স, পদার্থবিদ্যা, এবং জীববিদ্যার বিভিন্ন মডেল প্রদর্শিত হচ্ছে। সাইন্স সিটির আরেকটি আকর্ষণীয় অংশ ছিল জলজগৎ প্রদর্শনী, যেখানে বিভিন্ন জলজ প্রাণী ও তাদের বাসস্থানের মডেল দেখানো হয়। এটি আমাদের প্রকৃতির প্রতি আরও সচেতন করে তুলেছিল। সাইন্স সিটি থেকে ফিরে আসার সময়, আমরা অনেক নতুন তথ্য আর অভিজ্ঞতা সঙ্গে নিয়ে ফিরলাম। ঘুরাঘুরি শেষে সন্ধ্যা নাগাদ আমরা আমাদের হোটলে ফিরে আসলাম। তারপর ফ্রেশ হয়ে চলে গেলাম রাতের কলকাতা শহরের অভিজ্ঞতা নিতে।

রাতের কলকাতা

রাতের কলকাতা শহর যেন এক জীবন্ত কবিতা, আলোকসজ্জায় মায়াবী, আর তার কোলাহল, শব্দ, আর নীরবতার মিশ্রণে এক স্বপ্নময় অনুভূতি। আমাদের আজকের ভ্রমণের শেষে ছিল এই জাদুকরী শহরের রাত্রিকালীন সৌন্দর্য উপভোগ করা। আমরা এই চমৎকার সৌন্দর্য উপভোগ করে রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ করে চলে আসলাম আমাদের হোটেলে।

বাড়ির উদ্দেশে রওনা

কলকাতায় আমাদের কয়েকদিনের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সত্যিই স্মরণীয় ছিল। এই শহরের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি জায়গা, আর প্রতিটি মানুষের সঙ্গে কাটানো সময় আমাদের মনে চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। তবে আজ সেই সময় এসে গেছে, যখন আমাদের আবার নিজের শহরের দিকে ফিরে যেতে হবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হচ্ছিল, যেন এই ভ্রমণ আরও কিছুদিন চালিয়ে যাই। কিন্তু সময়ের নিয়ম মেনে আমরা নিজেদের ব্যাগ গোছাতে শুরু করলাম। হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কলকাতার শেষ সকালটিকে একবার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করলাম, যেন সেই দৃশ্যটি চিরকালের জন্য মনে গেঁথে যায়।

বিদায়ের মুহূর্ত

হোটেল থেকে বেরিয়ে যখন গাড়িতে উঠছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল, এই শহরের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। কলকাতার রাস্তাগুলো, মানুষজন আর খাবার সবই যেন আমাদের কাছের হয়ে উঠেছিল। বিদায় নেওয়া সহজ ছিল না।

হাওড়া স্টেশন শেষ বার দেখা

আমরা যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছালাম, তখন শহরের ঐতিহাসিক ব্রিজ আর চারপাশের ব্যস্ততাকে একবার শেষবারের মতো উপভোগ করলাম। স্টেশনের ভিড়, ট্রেনের বাঁশি, আর যাত্রীদের কোলাহল সবই যেন কলকাতার জীবন্ত চিত্র তুলে ধরছিল।

ট্রেন চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে জানালা দিয়ে আমরা কলকাতাকে বিদায় জানালাম। শহরটি ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছিল, কিন্তু তার স্মৃতি, তার গন্ধ, আর তার বিশেষ মুহূর্তগুলো আমাদের মনের এক কোণে স্থায়ী হয়ে রয়ে গেল।ট্রেনে করে আমরা চলে আসলাম বনগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে। তারপর সেখান থেকে সি,এন,জি করে চলে আসলাম পেট্রোপোল সীমান্তে।

কলকাতা ভ্রমণের পর আমরা বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করলাম। সীমান্ত পার হওয়া মানেই দেশের মাটিতে পা ফেলা, আর সেই অনুভূতি আমাদের মনকে ভরে দিল। এবার আমাদের গন্তব্য নরসিংদী, আর এবার প্রথমবারের মতো আমরা পদ্মা সেতু দিয়ে যাত্রা করব।

সীমান্ত পার হওয়ার অভিজ্ঞতা

সকালে আমরা বেনাপোল ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া শেষ করলাম। ইমিগ্রেশন পয়েন্টে ভিড় ছিল, তবে পুরো প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট মসৃণ ছিল। বাংলাদেশের দিকে পা রেখে মনে হচ্ছিল, ঘরের কাছাকাছি চলে এসেছি।

বেনাপোল থেকে আমরা রওনা দিলাম ঢাকার উদ্দেশে। রাস্তার দু'পাশে শীতের সবুজ মাঠ, গ্রামীণ বাড়ি, আর গাছের সারি দেখে মন ভরে যাচ্ছিল। পথে হালকা নাস্তা করে আমরা যাত্রা অব্যাহত রাখলাম।

'পদ্মা সেতু' এক নতুন অভিজ্ঞতা

আমাদের যাত্রার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ ছিল পদ্মা সেতু পার হওয়া। সেতুতে উঠার সময় সবার মধ্যেই উত্তেজনা কাজ করছিল। বিশাল পদ্মা নদীর উপর দিয়ে ছুটে চলা, আর সেতুর বিশাল কাঠামো দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। জানালা দিয়ে নদীর দৃশ্য আর দূরের গ্রামগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, আমরা ইতিহাসের একটি অংশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে

পদ্মা সেতু পেরিয়ে আমরা ঢাকার দিকে যাত্রা করলাম ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে। নতুন এই রাস্তা বেশ মসৃণ, আর দ্রুত গতিতে চলার জন্য আদর্শ। পথে কোনো যানজট না থাকায় যাত্রা আরামদায়ক ছিল।

বাড়িতে পৌঁছানো

ঢাকা শহরের কিছু অংশ অতিক্রম করার পর আমরা নরসিংদীর দিকে রওনা হলাম। রাতের দিকে নরসিংদীর পরিচিত জায়গাগুলো দেখতে পেয়ে মন আনন্দে ভরে গেল। দীর্ঘ ভ্রমণের পর বাড়ি পৌঁছে যে অনুভূতি হলো, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

শেষ অনুভূতি

কলকাতা শুধু একটি শহর নয়; এটি একটি অভিজ্ঞতা, একটি আবেগ। আমাদের ভ্রমণ ছিল হাসি, আনন্দ, ইতিহাস আর শিক্ষার মিশেলে এক অনন্য সময়। আমরা জানি, ভবিষ্যতে আবারও এই শহরে ফিরে আসব, নতুন কিছু দেখতে, নতুন কিছু অনুভব করতে।

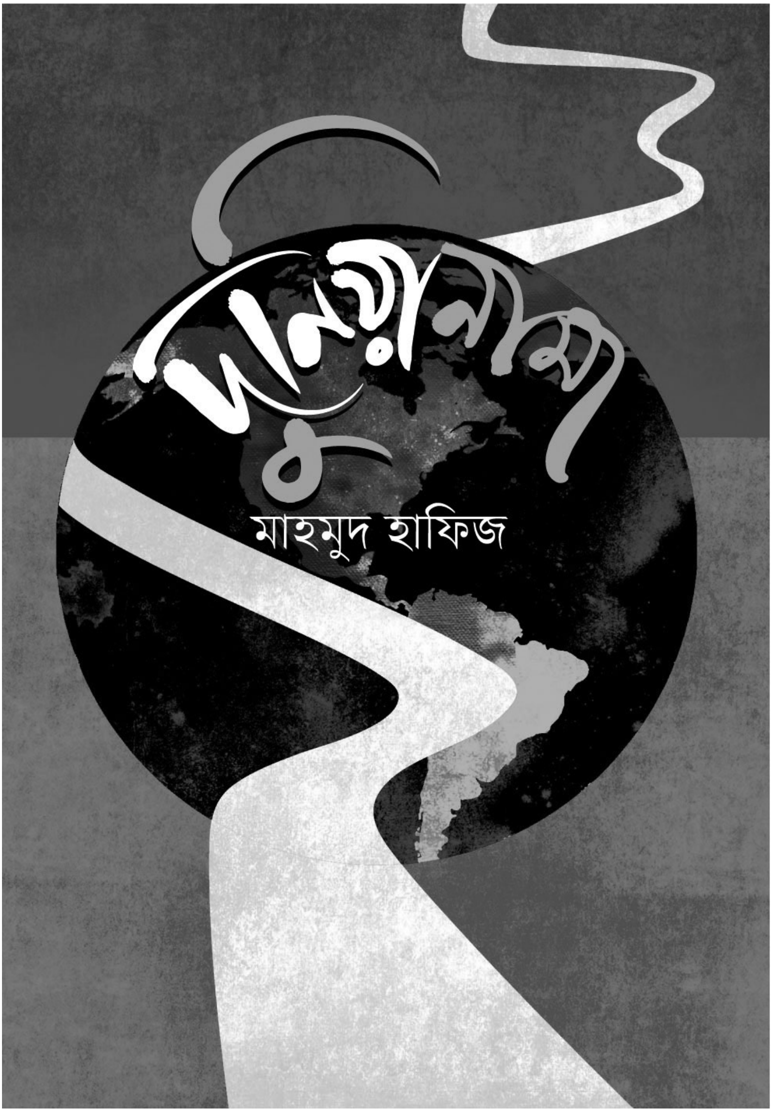
মাহমুদ হাফিজ